কালনা মহকুমার
প্রত্নতত্ত্ব ও ধর্মীয় সংস্কৃতির ইতিবৃত্ত

বিবেকানন্দ দাশ

ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা * * ১৯৯৯

উৎসর্গ

চিরশুভাকাঙ্ক্ষী
পরম পূজনীয়
শ্রীমদ্‌ মধুসূদন চৌধুরী-র
শ্রীচরণপদ্মে

আত্মপক্ষ

মানুষ নিজেকে সংস্কার করতে চায়। সেই সংস্কার ব্যক্তিগত বা সমাজগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ, কল্যাণ বা মানসিক উৎকর্ষতার জন্য। আর সেই সংস্কারের প্রক্রিয়াগুলিই সংস্কৃতি। তাই প্রতিটি দেশ বা দেশের অন্তর্গত প্রতিটি অঞ্চলেরই স্ব স্ব সংস্কৃতি রয়েছে। সেদিক থেকে অম্বিকা কালনারও বিশেষ এক সংস্কৃতি রয়েছে, যা রাঢ় সংস্কৃতিরই অন্তর্গত। সেই সংস্কৃতিরই এক অঙ্গ ধর্মীয় সংস্কৃতি। আর সেই সংস্কৃতিরই সূত্রে রয়েছে প্রত্নতত্ত্ব। বর্তমানে সংস্কৃতির প্রক্রিয়াগুলি বহুমুখী। কিন্তু অতীতে প্রাক্রয়াগুলি ছিল একমাত্র ধর্মমুখী।

মানসিক উৎকর্ষতাকে বাদ দিলে অতীতের মানুষ সংস্কার চেয়েছে ব্যক্তিগত বা সমাজগত সুখ-স্বাচ্ছন্দের জন্য, আধি-ব্যাধি বিপদ-বিপত্তি থেকে মুক্তির জন্য। এ সবের জন্য মানুষ দৈবী শক্তির কাছে করুণা ভিক্ষা করেছে। ঋগ্বেদ সংহিতাতেও করুণা ভিক্ষা আছে। আবার দেবতাদের কাছে যে ঔষধ আছে, এ ধারণা রয়েছে অথর্ববেদে। এই বেদের ১ম কাণ্ড : ১ম অনুবাকে বলা হয়েছে—'জলাধিষ্ঠাত্রী দেবতার মধ্যে অমৃত ও ভেষজ (ঔষধ) আছে,' অর্থাৎ জলদেবতার অনুগ্রহে আমরা ব্যাধিশূন্য ও অমর হতে পারি। ঐ কাণ্ড এবং ঐ অনুবাকেরই পঞ্চম সূক্তে বলা হয়েছে—'বরণীয় ধনের নিয়ন্ত্রী হে জলদেবীগণ, আমি তোমাদের কাছে ব্যাধি নিবারক শান্তিপ্রদ ঔষধ (অমৃত) প্রার্থনা করছি।' সুতরাং ঔষধ প্রার্থনার জন্য বা সঙ্কটমুক্তির জন্য দেবদেবীর সমীপে উপনীত হওয়া যুগযুগান্তরের ব্যাপার। সেক্ষেত্রে কালপারম্পর্যে যুক্তিহীন গাঢ় বিশ্বাস দানা বেঁধে উঠেছে। সেই বিশ্বাস সমাজের গভীরতম তলদেশ পর্যন্ত শিকড় বিস্তার করেছে। তাই যুক্তির কুঠার সেখানেই ব্যর্থ হচ্ছে যেখানে প্রাকৃতিক বিপত্তির ক্ষেত্রে মানুষ অসহায়, যেখানে মানুষের চাওয়ার প্রশ্ন আছে, কিন্তু পাওয়াটা মানুষের করায়ত্ত নয়। তাই আজও মানুষ ছুটে যায় দৈবী শক্তির কাছে। অন্যদিকে, মানসিক উৎকর্ষতা তথা আধ্যাত্মিক প্রাপ্তির আশায়

ছুটে যায়। করে ধর্ম-চর্চা। তাই ধর্ম-চর্চার ইতিহাসকে বাদ দিয়ে সংস্কৃতির ইতিহাসকে পূর্ণাঙ্গরূপে উদ্ধার করা যায় না। আমরা জানি, অলৌকিকতা এবং নানা গল্পকথা নানা সূত্রে নানাদিক থেকে ধর্ম-চর্চার ক্ষেত্রকে আশ্রয় করে। সেক্ষেত্রে বিচার বিশ্লেষণ ছাড়া সংস্কৃতির সত্য ইতিহাসের উদ্ধার সম্ভব নয়। তাই বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমেই প্রকৃত সত্যে পৌছবার চেষ্টা করেছি। তবে কতটা সার্থক হতে পেরেছি তার মূল্যায়নের দায়িত্ব অর্পণ কবছি সুধী পাঠক-বর্গের উপর।

আমরা জানি, বর্তমানে যা বর্ধমান জেলার অম্বিকা কালনা, তা মধ্যযুগীয় সাহিত্যে আম্বুয়া বা আঁবুয়া নামে পরিচিত। সেই আম্বুয়া বা আঁবুয়াকে বর্ধমানের রাজারা তীর্থনগরীতে রূপান্তরিত করেন।

যেহেতু সংস্কৃতির মধ্যেই রয়েছে সংস্কার, সেহেতু সংস্কৃতির ধর্মই হলো গতিময়তা, পরিবর্তনশীলতা। আর এ সত্য কালনা মহকুমার ধর্মীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সংলগ্ন গঙ্গার খাতের মতো কালনা মহকুমার সংস্কৃতি সহজাত প্রেরণায় এপাশ ওপাশ করেছে, বাঁক নিয়েছে। সেই বাঁক নেওয়া, এপাশ ওপাশ করা কালনা মহকুমার ধর্মীয় সংস্কৃতির ইতিবৃত্ত রচনার ক্ষেত্রে গ্রন্থটিকে দু'টি খণ্ডে বিভক্ত করেছি—নগরখণ্ড ও গ্রামখণ্ডে।

বর্ধমান জেলার কালনা মহকুমায় বহুসংখ্যক গ্রাম রয়েছে। অধিকাংশ গ্রামেই কিছু না কিছু প্রত্নতত্ত্ব রয়েছে, আর প্রতি গ্রামেই রয়েছে ধর্মীয় সংস্কৃতির স্রোত। কিন্তু প্রতি গ্রামের উপর ক্ষেত্রসমীক্ষা করা সম্ভব নয় বলেই প্রতিনিধি স্থানীয় কিছু গ্রামকে আলোচনার বৃত্তের মধ্যে রেখেছি। আর ঐ সব গ্রামের প্রত্নতত্ত্ব ও ধর্মীয় সংস্কৃতির ইতিবৃত্ত নিয়েই গ্রামখণ্ড। আর নগরখণ্ডের ক্ষেত্রে শহর কালনার ধর্মীয় সংস্কৃতির পূর্বাপর ধারা, এবং প্রত্নতত্ত্বকে কয়েকটি পর্যায়ে বিন্যস্ত করে আলোচনাকে পল্লবিত করেছি। তবে প্রত্নতত্ত্বের ক্ষেত্রে সর্বক্ষেত্রেই যে মন্দিরাদির মাপজোখ নিখুঁত হয়েছে, তা বলা যায় না। কারণ, মাপজোখের ক্ষেত্রে টেকনিক্যাল প্রতিবন্ধকতা থাকেই। যেমন উচ্চতা নির্ণয়ে অনেকক্ষেত্রে অনুমানের উপর নির্ভর করতেই হয়। তাছাড়া, কালনার প্রত্নতত্ত্বের উপর এখনও কোন বিজ্ঞানসম্মত গ্রন্থ রচিত হয় নি, যাকে অনুসরণ করা যায়। এদিকের অভাব সত্ত্বেও কালনার প্রত্নতত্ত্বের একটি বিজ্ঞানসম্মত রূপরেখা সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছি।

মন্দির-গবেষক শ্রদ্ধেয় তারাপদদা (তারাপদ সাঁতরা) পত্রের মাধ্যমে আমাকে বারবার কালনার মন্দিরাদির উপর কাজ করতে বিশেষভাবে উৎসাহ দেন। অন্যদিকে, আমার বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় বিজিতকুমার দত্ত মহাশয় একটি পত্রে আমাকে লিখেছিলেন, "এখন কালনা মহকুমার সাংস্কৃতিক ইতিহাস নিয়ে একটি মাঝারি বই লিখলে খুশি হব।"—এই দুই বরেণ্য শ্রদ্ধাস্পদের অনুপ্রেরণায় ও আশীর্বাদে সৃষ্টি করেছি 'কালনা মহকুমার প্রত্নতত্ত্ব ও ধর্মীয় সংস্কৃতির ইতিবৃত্ত'। এই সৃষ্টি ঐ দুই শ্রদ্ধাস্পদের অনুপ্রেরণা ও আশীর্বাদ ছাড়া সম্ভব হতো না। এজন্য এঁদের শ্রীচরণকমলে প্রণাম জানাই।

আমার সাহিত্য-জীবনের উপব যাঁর আশীর্বাদ প্রতিনিয়ত রয়েছে, তিনি হলেন পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ মধুসূদন চৌধুরী। তাঁর পাদপদ্মেও প্রণাম জানাই। আব যাঁর সহায়তা ও অনুপ্রেরণা ছাড়া একাজ সম্পূর্ণ করা সম্ভব ছিল না, তিনি আমার সহধর্মিণী শ্রীমতী ইলা দাশ। তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে ছোট করতে চাই না। কিন্তু ধন্যবাদ জানাই আমাব সহকর্মীদের, যাঁরা আমায় উৎসাহ ও প্রেবণা জুগিয়ে এসেছেন।

এই কাজে যাঁরা রয়েছেন প্রেরণার উৎস মূলে, তাঁরা হলেন আমার পিতৃব্য শ্রীসনৎ কুমার দাশ, এবং অগ্রজ ডঃ তপেন্দ্র নারায়ণ দাশ। তাঁদের চরণ সতত ধ্যান করি। কৃতজ্ঞতা জানাই আমার দুই আত্মীয় কাজল কুমার মণ্ডল ও ভীষ্মদেব দেকে।

আমি প্রণম্য পূর্বসূরীগণের তথ্যের উপর নির্ভর করে বিশ্লেষণের মাধ্যমে কালনা মহকুমার ধর্মীয় সংস্কৃতির ইতিবৃত্তকে উন্মোচন করতে প্রয়াসী হয়েছি। এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ জট খুলতে পেরেছি, এমন দাবি ধৃষ্টতামাত্র। তবে আবেগের পথকে বর্জন করে, জনশ্রুতি সমূহকে গ্রহণ ও বিশ্লেষণ করে, প্রণম্য বিদগ্ধ পণ্ডিত-বর্গের মতকে যুক্তিধর্মের মাধ্যমে শ্রদ্ধার সঙ্গে খণ্ডন করে ইতিহাসের বিশেষ বিশেষ অধ্যায়কে সত্যের দিকে মুখ ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছি। এ কাজ পূর্বসূরীদের কাজের উপর নির্ভর করেই করা, অর্থাৎ তাঁদের প্রদীপের আলো থেকেই আমার প্রদীপ জ্বেলেছি। তাই পূর্বসূরীদের ঋণ আমি নত মস্তকে স্বীকার করছি।

ইতিহাস চেতনা যুক্তিধর্মের অনুসারী, আর ভক্ত-মানস মূলতঃ আবেগধর্মী।

যুক্তিধর্মের মাধ্যমে ইতিহাসের সত্য উন্মোচন করতে যদি কোন ভক্ত-হৃদয়ে আঘাত করে ফেলি, তবে তা প্রকৃত সত্য উন্মোচনের স্বার্থে। সেক্ষেত্রে সমস্ত ভক্তজনের কাছে এবং যদি কোন তথ্যগত ভুলত্রুটি থেকে থাকে, তার জন্য সমস্ত পাঠকবর্গের কাছে ক্ষমা প্রর্থনা করে এইখানেই অস্থপক্ষ সমর্থনের সীমারেখা টানলাম।

বিবেকানন্দ দাশ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

'কালনা মহকুমার প্রত্নতত্ত্ব ও ধর্মীয় সংস্কৃতির ইতিবৃত্ত' রচনার ক্ষেত্রে ক্ষেত্র-সমীক্ষা কালে যাঁরা ছিলেন আমার ভ্রমণ-সঙ্গী, এবং তথ্য সংগ্রহের কাজে যাঁরা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যাঁরা সহায়তা করেছিলেন, তাঁদের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করে তাঁদেব প্রতি জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।

জাকির হোসেন মোল্লা, কুলে, স্বপন কুমার চন্দ, পুরুনিয়া; বনানী দাশ, কালনা, অনিল কুমার আচার্য, কালনা, নিমাই চন্দ্র কর, কালনা, সন্তোষ কুমার দে, কালনা; ফণিভূষণ বিশ্বাস, তামাঘাটা; মিলন কুমার চক্রবর্তী, মন্তেশ্বর; অঞ্জলিপ্রভা পাল, কালনা; শক্তিপদ গোস্বামী, ভবানীপুর; ৺রামবিলাস সিং, কালনা; সনাতন অধিকারী, কালনা (সিদ্ধেশ্বরী বাড়ি); কালু সেখ, শাসপুব, গোবিন্দলাল গোস্বামী, কালনা (মহাপ্রভুবাড়ি); রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, কালনা (শ্যামসুন্দর বাড়ি); মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, কালনা (লালজী মন্দির); কানাই রায়, কালনা (কৃষ্ণচন্দ্র মন্দির); শ্রীমতী রানী দেবী, কালনা; সদানন্দ মুখোপাধ্যায়, কালনা, পার্বতীনাথ চট্টোপাধ্যায়, কালনা, অম্বিকা ভট্টাচার্য, কালনা; আনন্দগোপাল গোস্বামী, কালনা; শিবপ্রসাদ ব্যানার্জী, কালনা, আসাতুল খাঁ, সমুদ্রগড়, বদরুল আলম খাঁ, সমুদ্রগড়; জগৎ দুর্লভ ভট্টাচার্য, নারিকেলডাঙ্গা, পাঁচুগোপাল সাঁতরা, নারিকেলডাঙ্গা, কমলকৃষ্ণ ব্যানার্জী, সমুদ্রগড়, পাঁচু ঘোষ ও অদ্বৈত ঘোষ, সর্বমঙ্গলা, বিশ্বনাথ গোস্বামী ও অজিত কুমার গোস্বামী, গোপালদাসপুর, নন্দগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রশান্তকুমার কুণ্ডু, বৈদ্যপুর; রামনারায়ণ পণ্ডিত ও শ্রীমত্যা লক্ষ্মী পণ্ডিত, উদয়পুর, খগেন্দ্র গোপাল সিংহরায়, মেদগাছি, শঙ্কর নাথ, রানীবন্দ; ধর্মরাজ মালিক, মানিকহার; সামসুল খান, সমুদ্রগড়, মোল্লা আবুল হাসেম, রাইগ্রাম; অমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, মন্তেশ্বর; নন্দগোপাল বসু ও মানব ব্রহ্মচারী, কাইগ্রাম; বাবর আলি, রাইগ্রাম; দেবকুমার ঘোষ, নেপাকুলি; নন্দনন্দন ব্রহ্মচারী, জাহান্নগর; নির্মল ব্যানার্জী, কালনা, লক্ষ্মণ দত্ত, কালনা; মোহনচন্দ্র ধাড়া, কালনা; বাসুদেব দাস, কালনা; মোহাম্মদ হোসেন, রাইগ্রাম; বিনয়কৃষ্ণ গোস্বামী, কালনা (শ্যামসুন্দর বাড়ি); ৺প্রভাস চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কালনা; রাকেশকুমার দে ও রীয়া দে, রামেশ্বরপুর; সঙ্গীতা দেবনাথ, কালনা।

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী

নগর খণ্ড

গ্রাম খণ্ড

নগর খণ্ড

শাক্ত-সংস্কৃতি

ঃ অম্বিকা সিদ্ধেশ্বরী ঃ

অম্বিকা কালনার নগরদেবী অম্বিকা সিদ্ধেশ্বরী। এই দেবীকে অনেকেই মনে করেন যে ইনি জৈনদেবী। আর তাঁরই নামানুসারে শহর অম্বিকার নামকরণ। সুতরাং এটিকে জৈন সংস্কৃতি, বা যেহেতু মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা রাজা চিত্রসেন, সেহেতু এটিকে রাজবৃত্তের সংস্কৃতিরূপে বিন্যস্ত করা যেত। কিন্তু তা করিনি বিতর্ক আছে বলেই। এখন সেই বিতর্কের ক্ষেত্রে 'অম্বিকা কালনার নামকরণ' প্রসঙ্গটির আলোচনা অপরিহার্য। শ্রীযজ্ঞেশ্বর চৌধুরী বলেছেন যে রেনেলের মানচিত্রে অম্বুয়া ও কালনা স্বতন্ত্র স্থান হিসাবে চিহ্নিত আছে। ১৮৬৯-এর ১২-১৩ মার্চ কালনাকে পৌর আইনের (Act III of 1864) আওতায় আনার সময় সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে দু'টি আলাদা অঞ্চলের নাম উল্লিখিত হয়: 'অম্বিকা ও নিজ কালনা।' পরবর্তীকালে স্থানদ্বয় একীভূত হয়ে 'অম্বিকা-কালনা' নামে পরিচিতি লাভ করে।[১]

এখন 'অম্বিকা-কালনা' থেকে 'কালনা' বাদ দিলে থাকে 'অম্বিকা'। এই 'অম্বিকা' মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের এক বিশেষ পর্ব পর্যন্ত আম্বুয়া, অম্বুয়া বা আঁবুয়া নামে অভিহিত। এক্ষেত্রে ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন যে আম্র+ক (যেখানে খুব ভালো আম হয়) থেকে আম্বুয়া বা আঁবুয়া এসেছে।[২] আবার কেউ কেউ মনে করেন যে অম্বিকার উপাসক ছিলেন অম্বুরীশ বা অম্বরীশ। এই অম্বরীশের নামানুসারে অম্বিকা-কালনার নামকরণ হয়েছে।[৩] এক্ষেত্রে প্রথমেই বলা যায়, অম্বুরীশ বা অম্বরীশ থেকে আম্বুয়া বা আঁবুয়া আসে না। আবার অম্বু ঋষির অম্বু থেকে 'আম্বুয়া' এসেছে এমন মনে করাটাও কষ্টকল্পিত বলেই মনে হয়।

শ্রীযজ্ঞেশ্বর চৌধুরী বলেছেন যে কুব্জিকাতন্ত্রে সিদ্ধপীঠ প্রসঙ্গে বলা আছে 'বদরিচ মহাপীঠ অম্বিকা বর্ধমানকম্'। ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকারের মতে, অম্বিকা নামক সিদ্ধপীঠের অবস্থান একালের অম্বিকা—কালনায়।[৪] কিন্তু উদ্ধৃত শ্লোকাংশটি থেকে অম্বিকার অবস্থান যে বর্ধমানে তা বলা যায় না। তাছাড়া

নিগূঢ়ানন্দ কুব্জিকাতন্ত্রে উল্লেখিত যে ৪২টি সিদ্ধপীঠের উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে ২১নং সিদ্ধপীঠটি অম্বিকা, এবং ২২নং সিদ্ধপীঠটি হলো বর্দ্ধমান বা অর্দ্ধনালক।[৫] সুতরাং অম্বিকা নামক সিদ্ধপীঠটির অবস্থান যে অম্বিকা-কালনায় ছিল, তা বলা যায় না।

ডঃ বিমান বিহারী মজুমদারের সিদ্ধান্তকে অনুসরণ করে ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যে ১৫৪৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্যভাগবত রচিত হয়েছিল।[৬] আবার শ্রীহরিদাস দাসের মতে বৃন্দাবন দাস ১৪৫৭ শকে (১৫৩৫ খ্রীঃ) শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত রচনা করেন।[৭] তাঁর কাব্যে স্থানটি 'আম্বুয়া' রূপে উল্লেখিত।

ষোড়শ শতকের শেষের দিকে কৃষ্ণদাস কবিরাজ স্থানটিকে 'আম্বুয়া' নামে চিহ্নিত করেছেন। ঐ সময়েই মুকুন্দরাম তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের 'ধনপতির নৌকারোহণ' অংশে স্থানটিকে 'পুরী আম্বুয়ামুলুক' রূপে, এবং 'শ্রীমন্তের ত্রিবেণী-গমন' অংশে 'সহর আম্বুয়ামুলুক' রূপে উল্লেখ করেছেন।[৮]

ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যে ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে জয়ানন্দ চৈতন্যমঙ্গল রচনা করে থাকবেন।[৯] তাঁর গ্রন্থে স্থানটি 'আম্বুয়া' রূপে উল্লেখিত। আবার ডঃ সুকুমার সেন গৌণ সাক্ষ্যের উপরই নির্ভর করে বিপ্রদাসকে পঞ্চদশ শতকের শেষ দশকের কবি বলতে চেয়েছেন, এবং মুখ্য সাক্ষ্য অনুসরণ করে তাঁকে অষ্টাদশ শতকের লোক বলতে চেয়েছেন।[১০] ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিপ্রদাসকে সপ্তদশ শতকেও নিয়ে যেতে প্রস্তুত।[১১] সেক্ষেত্রে বিপ্রদাস স্থানটির নাম বলছেন 'আঁবুয়া'। আবার ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দের পরে রচিত কৃষ্ণরামের শীতলামঙ্গলেও স্থানটির নাম 'আঁবুয়া' বলা হয়েছে।

'আঁবুয়া' শব্দটিকে আমরা 'আম্বুয়া'র রূপান্তর বলতে পারি। এবং সেক্ষেত্রে 'আম্রবন' আছে এমন স্থান অর্থে 'আমবোনা'র কথা স্মরণ করতে পারি।

'আম্র' এবং 'বন'—এদুটি শব্দই তৎসম। সুতরাং আমবোনা (আমবুনা) >আম্বুয়া, বর্ণলোপে অম্বুয়া>আঁবুয়া—ধ্বনিতত্ত্বের এই রূপান্তর অযৌক্তিক নয়। আর তা প্রমাণিত হয় ফন্ ডেক ব্রোকৃকত (১৬৬০খ্রীঃ) বাঙলার ভূমি ও নকশায় 'Ambona' (আম্বোনা)-র উল্লেখ থেকে।[১২] সুতরাং 'আম্রবন' আছে অর্থেই স্থানটির নাম 'আমবোনা' (আমবুনা) হয়েছিল, এবং তা থেকে আম্বুয়া, অম্বুয়া বা আঁবুয়া হয়েছিল। সেক্ষেত্রে 'আম্বুয়া বা আঁবুয়া'র রূপান্তর

'অম্বিকা' হতে পারে না, বা অম্বিকার রূপান্তর আম্বুয়া বা আঁবুয়া হতে পারে না। অবশ্য এক্ষেত্রে প্রশ্ন থাকে, তবে কেন স্থান নামটি 'অম্বিকানগর' রূপে উল্লেখিত হয়েছে ?

আমরা জানি, নরহরি চক্রবর্তীর ভক্তিরত্নাকরে 'অম্বিকা'র উল্লেখ আছে। এ গ্রন্থটির রচনাকাল সম্বন্ধে মুরারীলাল রায় ১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দকে সনাক্ত করেছেন। ডঃ সুকুমার সেন মনে করেন যে গ্রন্থটি অষ্টাদশ শতকের প্রথম পাদে রচিত হয়েছিল।[১৩]

বংশীবিলাস তথা মুরলীবিলাস গ্রন্থে অম্বিকার উল্লেখ আছে। কিন্তু ডঃ সুকুমার সেন গ্রন্থটিকে প্রামাণ্য বলে মনে করেন নি।[১৪] প্রেমবিলাসেও অম্বিকার উল্লেখ আছে। তা'তে যে রচনাকাল দেওয়া আছে, তা হলো— 'পক্ষ-দ্বি-তিথি' অর্থাৎ ১৫২২ শকাব্দ (১৬০০—১৬০১ খ্রীঃ)। কিন্তু ডঃ সুকুমার সেন এর সময়কাল সম্বন্ধেও সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।[১৫] ঈশান নাগরের অদ্বৈত প্রকাশের রচনাকাল 'চৌদ্দশত নবতি শকাব্দ' চিহ্নিত হলেও গ্রন্থটিকে অনেকেই জাল বলেছেন। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থটিকে দুই এক শতাব্দীর পূর্ববর্তী বলতেও দ্বিধা করেন নি।[১৬] এই 'অদ্বৈত প্রকাশের' মতো কৃষ্ণদাসের 'কণ্বমুনির পারণা' বা 'নারদ সংবাদ'-এ অম্বিকা নগরের উল্লেখ আছে। এর রচনাকাল ১৭১২ খ্রীঃ। অন্যদিকে, প্রাণবল্লভের 'জাহ্নবী মঙ্গলে'ও অম্বিকা নগরের উল্লেখ আছে। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে গ্রন্থটির রচনাকাল অষ্টাদশ শতকের গোড়া।[১৭] আর এসব সাক্ষ্য প্রমাণে বলা যায়, অষ্টাদশ শতকের পূর্বেই স্থানটি 'অম্বিকা' নামেও অভিহিত হচ্ছে। এখন 'অম্বিকা' নামটি যদি 'আমবোনা' থেকে না এসে থাকে, তবে বলা যায়, দেবী অম্বিকার নামেই স্থান নামটি অম্বিকানগর হয়েছে। আর তা যদি হয়, তবে প্রশ্ন থাকে—দেবী সিদ্ধেশ্বরী কখনও কি অম্বিকা নামে অভিহিত হতেন ?

রূপরাম চক্রবর্তী তো তাঁর ধর্মমঙ্গলে (রচনাকাল ১৬৪৯ খ্রীঃ) দেবীকে অম্বিকা না বলে 'কালিকা' নামে অভিহিত করেছেন। বলেছেন—'অম্বুয়ার ঘাটে বন্দো। কালিকা ঈশ্বরী ॥' আবার দেবীর মন্দিরের প্রতিষ্ঠা ফলকে দেবীকে 'সিদ্ধেশ্বরী' নামে অভিহিত করা হয়েছে, অম্বিকা নামে নয়।

এক্ষেত্রে আমরা দুটি তথ্য উপস্থাপন করতে পারি। প্রথমতঃ, যে পুকুরের পাড়ে বটগাছের তলায় পাথরের কুলোর উপর জমাটবদ্ধ ঘট পাওয়া যায়, সেই

পুকুরটি অম্বিকাপুকুর নামে অভিহিত। সুতরাং দেবীর নাম অম্বিকা ছিল বলেই পুকুরটি অম্বিকাপুকুর নামে অভিাহত হয়েছিল, একথা নিশ্চিত করে বলা যায়। দ্বিতীয়তঃ, সিদ্ধেশ্বরী বাড়িতে রাজা ত্রিলোকচন্দ্রের মাতা যে শিব-মন্দিরটি ১৬৮৫ শকাব্দে (১৭৬৩—৬৪খ্রীঃ) প্রতিষ্ঠা করেছেন, তার প্রতিষ্ঠা-লিপিতে বলা হয়েছে 'গঙ্গাম্বিকে শ্রীশিবদেবস্য সৌধং'। অর্থাৎ তিনি গঙ্গা ও অম্বিকার উদ্দেশ্যে শিবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সুতরাং এই তথ্য থেকে বলা যায়, দেবীর নাম অম্বিকা ছিল, এবং দেবী অম্বিকার নামানুসারে স্থানটির নাম অম্বিকানগর হয়েছিল। সুতরাং এ থেকে এটাই স্পষ্ট যে স্থাননামের ক্ষেত্রে একই স্থান একটি বিশেষ সময় থেকে দুদিক থেকে দুই অর্থকে গ্রহণ করেছিল, এবং দুই অর্থকে গ্রহণ করার পর একটি বিশেষ সময় পর্যন্ত দুই অর্থবোধক দুই নাম সমান্তরাল ভাবে যে চলে আসছিল, তার প্রমাণ দিয়েছেন ষোড়শ শতকের শেষভাগে রচিত চণ্ডীমঙ্গলের কবি মুকুন্দরাম। তিনি একদিকে স্থানটিকে 'ধনপতির নৌকারোহণ' অংশে 'পুরী আম্বুয়ামুলুক' রূপে, এবং 'শ্রীমন্তের ত্রিবেণীগমন' অংশে 'সহর আম্বুয়ামুলুক' রূপে উল্লেখ করেছেন।[১৮] অন্যদিকে 'ভাগীরথীর তটবর্ণন' অংশে তিনি আবার স্থানটিকে 'অম্বিকা সহর' বলে উল্লেখ করেছেন।[১৯] এখন প্রশ্ন, 'সহর অম্বিকা'র নামকরণ যদি দেবী অম্বিকার নামে হয়, তবে অম্বিকা কি জৈনদেবী ?

আমরা জানি, জৈনদেবী অম্বিকার নামানুসারেই বাঁকুড়ার অম্বিকানগরের নামকরণ হয়েছে। সেখানে যে বিগ্রহ রয়েছে তার আবরণ উন্মোচনযোগ্য নয়। একথা প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের শ্রীমতী দেবলা মিত্র ১৯৫৮ সালে এসিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে প্রতিমাটিকে নেমিনাথের শাসন-দেবী অম্বিকা বলে সনাক্ত করেছেন। তাছাড়া, তিনি মূর্তির মধ্যে ঋষভনাথ, পার্শ্বনাথ, শান্তিনাথ প্রভৃতি জৈন তীর্থংকরদের মূর্তি দেখেছিলেন।[২০]

শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যে গর্ভগৃহে শিবলিঙ্গের পাথরের এক ঋষভনাথের মূর্তি থেকে অনুমান করা চলে যে এই প্রাচীন জৈন মন্দিরটি কালক্রমে হিন্দু মন্দিরে পরিণত হয়েছে।[২১]

কিন্তু অম্বিকা কালনায় একমাত্র নাম ছাড়া এমন কোন নিদর্শন পাচ্ছি না যাতে সিদ্ধেশ্বরীকে জৈনদেবী বলে সনাক্ত করা যায়।

বিনয় ঘোষ বলেছেন যে জৈনদেবী অম্বিকা খুব সহজেই দুর্গার ধ্যানমূর্তির

মধ্যে লীন হয়ে গিয়েছিল।[২২] এখন দেখতে হবে মতটি কতদূর গ্রহণযোগ্য। এক্ষেত্রে আমরা শতপথ এবং তৈত্তরীয় ব্রাহ্মণের সাক্ষ্য গ্রহণ করতে পারি। শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যে ব্রাহ্মণে (শতপথ ২.৬.২.৯) রুদ্রের বোন অম্বিকা শরৎকালের সঙ্গে সংযুক্তা (তৈত্তরীয় ১.৬.১০)। এই অম্বিকাই কালক্রমে শিবের স্ত্রীরূপে দেখা দিয়ে শরৎকালে পূজিতা হতে থাকলেন।[২৩]

ভিণ্টারনিৎসের মতে মন্ত্রযুগ হচ্ছে ঋগ্বেদ—সংহিতার সংকলন সমাপ্তিও বৌদ্ধধর্মের অন্তর্বর্তীকালের মধ্যে।[২৪] আর তাই যদি হয় তবে বৌদ্ধ বা জৈন-ধর্মের উত্থানের পূর্বেই দেবী অম্বিকার অস্তিত্ব ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মধ্যেই যে রয়েছে তা বলা যায়, এবং সেক্ষেত্রে বলা যায় যে ব্রাহ্মণ্যাশ্রয়ী দেবীই জৈনধর্মের ক্ষেত্রে গৃহীত হয়েছিল।

আবার ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ক্ষেত্রে দুর্গা, চণ্ডী, কালী যখন শিবের শক্তিরূপে গৃহীত হলেন, তখন অম্বিকাও যে সাঙ্গীকৃত হলেন তার প্রমাণ রয়েছে 'বাংলার লৌকিক দেবতা' গ্রন্থে উদ্ধৃত বিশালাক্ষীর ধ্যান মন্ত্রটিতে।[২৫] তাছাড়া, রূপরাম চক্রবর্তী তাঁর ধর্মমঙ্গলের দিক্‌বন্দনায় অম্বিকা কালনার প্রতিমাকে 'কালিকা' নামেই অভিহিত করেছেন। তাই সিদ্ধেশ্বরী যে জৈনদেবী অম্বিকা তা নিশ্চিত করে বলা যায় না।

এখন সিদ্ধেশ্বরী বাড়ির সেবাইত শ্রীসনাতন অধিকারীর সাক্ষাৎকারটি উদ্ধৃত করা যায়। তিনি বর্তমান লেখকের সাথে ১১.৫.১৯৯৩-এর সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন: অম্বরীশ ঋষি বর্তমান মন্দিরের অনতিদূরে পশ্চিমদিকে অম্বিকা-পুকুর নামে কথিত পুকুরের এককোণে বটগাছের তলায় পাথরের কুলোর উপর জমাটবদ্ধ একটি ঘট পান। জায়গাটি ছিল গভীর জঙ্গলে পরিপূর্ণ। তিনি ঐ ঘটকে বর্তমান মন্দিরের স্থানে বটগাছের তলে প্রতিষ্ঠা করে সাধনায় সিদ্ধ হন। তখন মূর্তি ছিল না। ৪/৫ পুরুষ শিষ্য পরম্পরায় সেবাকার্য চলে। শেষ সাধক ঈশ্বরীশ। তিনি দেবীর স্বপ্নাদেশে মূর্তি তৈরী করান। নিমগাছের একটি কাষ্ঠখণ্ডেই তৈরী। ছোট বহরকুলির গাঙ্গুলীদের পুকুরপাড়ে যে তিনটি নিমগাছ ছিল, তার মাঝেরটি নিয়ে এসে কলকাতার নিমতলার দারুশিল্পীর দ্বারা মূর্তি নির্মান করানো হয়, এবং পঞ্চমুণ্ডির আসনের উপর বসানো হয়। এর পিছনে ছিল গঙ্গা ও শ্মশান। এখানে নরবলির প্রথা ছিল। শোনা কথা—ডাকাতরা মুণ্ড কেটে নিয়ে ঠাকুরথানে ঝুলিয়ে রেখে যেত। তার

স্মারকরূপে যেখানে নরবলি দেওয়া হোতো, এখনও তার বিকল্পে ভাব বলি দেওয়া হয়। মূর্তিটি জীর্ণ হলে অম্বিকা-পুকুরে বিসর্জন দেওয়া হয়। বর্তমান মূর্তিটি এবং মন্দিরটি দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রথম মন্দিরটিকে বটবৃক্ষ গ্রাস করে। রাজা চিত্রসেন প্রতিমা দর্শন করতে এলে মন্দিরগাত্র থেকে পাথরের চাঁই খসে পড়ে। রাজা মন্দিরটিকে সংস্কার করেন। ঈশ্বরীশের কোন শিষ্য ছিল না। স্বপ্নাদেশে তিনি সাতগেছিয়ার চাটুজ্জে বাড়ির একটি ছেলেকে আনেন। সেই ছেলেই ঠাকুর সেবার অধিকার পান। তাই পদবী হয় অধিকারী। এবং তখন থেকেই সেবাকার্য হয় বংশানুক্রমিক।

এখন সাক্ষাৎকারটি বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। সাক্ষাৎকারে বলা হচ্ছে যে অম্বুরীশ কোন মূর্তি পাচ্ছেন না। পাচ্ছেন পাথরের কুলোর উপর একীভূত পাথরের একটি ঘট।

বাংলাদেশে তথা ভারতবর্ষে ঘটের প্রতীকে জৈনদেবীর উপাসনার ইতিহাস নেই। অবশ্য এক্ষেত্রে প্রশ্ন থাকে, এর সাথে কি কোন মূর্তি ছিল, যা অনাবিষ্কৃত? এক্ষেত্রে বলা যায়, যদি মূর্তি থাকতো তবে মৃৎঘটই থাকতো— পাথরের ঘট থাকতো না। তাছাডা, প্রবাল রায় বলেছেন যে আমাদের দেশে 'কালীমূর্তি' (বিশেষ করে শবারূঢ়া) কল্পনার ইতিহাসও খুব একটা প্রাচীন নয়।[২৬] তাছাড়া, পূর্বে বাঙ্গলায়ীএই সংস্কার দৃঢ় ছিল যে, দশ মহাবিদ্যার রূপ প্রকট করে পূজা করতে নেই। কালী দশ মহাবিদ্যার আদ্য বিদ্যা, কালী মূর্তি গড়ে পূর্বে কেহ পূজা করত না। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ স্বয়ং কালীমূর্তি গড়ে স্বয়ং পূজা করতেন। আগমবাগীশের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে বাঙ্গলার সাধক সমাজ অনেকদিন চলেন নাই। লোকে 'আগমবাগীশী কাণ্ড' বলে তাঁর পদ্ধতিকে উপেক্ষা করত। বিশেষতঃ স্বয়ং মূর্তি গড়ে স্বয়ং পূজা করা তো সহজ কথা নহে, তাই বাঙালী উহার অনুসরণ করেন নাই।[২৬(ক)]

আমরা জানি, বৃহৎ বঙ্গে ঘটের প্রতীকে পূজিতা হতেন কালী, মনসা, চণ্ডী। আর ঐ পাথরের ঘটটি যে কালীর প্রতীকে পূজিতা হতেন, তার প্রমাণ দিয়েছেন রূপরাম। তিনি বলেছেন 'আম্বুয়ার ঘাটে বন্দো কালিকা ঈশ্বরী'॥

এখন প্রশ্ন, অম্বুরীশের সময়কাল কখন? এক্ষেত্রে আমরা প্রাণবল্লভের 'জাহ্নবীমঙ্গল' এর সাক্ষ্য গ্রহণ করতে পারি। সেই কাব্যে বলা হয়েছে—

অবনীর মধ্যে ধন্য অম্বিকানগর।
অম্বুরীশ আছে মুনি আছে বহুতর ॥

এখানে 'অম্বুরীশ আছে মুনি'র 'আছে' এই ক্রিয়াপদটিকে যদি সাধারণ বর্তমানের অর্থে ধরা যায়, তবে বলা যায়, প্রাণবল্লভের কাব্য রচনাকালে (আঠারো শতকের সূচনাকাল) অম্বুরীশ বর্তমান ছিলেন। আর তখন বর্ধমান রাজ কীর্তিচন্দ্রের রাজত্বকাল (১৭০২-১৭৪০ খ্রীঃ)। কিন্তু তা যদি হয় তবে ঘটটির আবিষ্কারের সাথে অম্বুরীশকে যুক্ত করা যায় না। কারণ রূপরামের কাব্য রচনাকাল ১৫৭১ শকাব্দ (১৬৪৯ খ্রীঃ)। সেই সময় থেকে কীর্তিচন্দ্রের রাজত্বের সূচনাপর্বের ব্যবধান মাত্র ৫৩ বৎসর। এর মধ্যে মন্দির ধ্বংস হয়ে গেল, সেই ধ্বংস থেকে অম্বুরীশ ঘট আবিষ্কার করছেন, এমন কল্পনা করা যায় না।

রূপরাম চক্রবর্তী বলেছেন—

তোমার মহিমা মাতা কি বলিতে পারি।
অম্বুয়ার ঘাটে বন্দো কালিকা ঈশ্বরী ॥

এই উক্তি থেকে এটিই স্পষ্ট যে রূপরামের কাব্য রচনাকালে (১৬৪৯ খ্রীঃ) অম্বুয়ার কালীর মহিমা ব্যাপ্ত হয়েছে। এই মহিমা ব্যাপ্ত হতে যদি ধরা যায় ন্যূনতম ৫০ বৎসর লেগেছে, তবে অম্বুরীশের ঘটপ্রাপ্তির সম্ভাব্যকাল দাঁড়ায় ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দ। এই অব্দ থেকে কীর্তিচন্দ্রের রাজত্বকালের ব্যবধান ১০২ বৎসর। তা যদি হয় তবে অম্বুরীশের মৃত্যু হচ্ছে ১০২ বৎসরে, এবং তিনি একান্ত শিশুকালেই ঘটটি আবিষ্কার করছেন, এমন কল্পনা করা যায় না। সুতরাং ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে যদি অম্বুরীশের ঘটপ্রাপ্তির সম্ভাব্যকাল ধরা যায়, তবে তাঁর সময়কাল 'জাহ্নবী মঙ্গলে'র রচনাকালে তা ধরা যায় না। আবার তাঁর সময়কালকে যদি 'জাহ্নবী মঙ্গলে'র রচনাকাল ধরা যায়, তবে তাঁকে ঘট আবিষ্কারের সাথে যুক্ত করা যায় না। অবশ্য 'আছে' ক্রিয়াপদটিকে যদি ঐতিহাসিক বর্তমানের অর্থে ধরা যায় তবে বলা যায়, অম্বুরীশ মুনি জাহ্নবী-মঙ্গলের রচনাকালের পূর্বেই বর্তমান ছিলেন, এবং তিনিই ঘটটি আবিষ্কার করতে পারেন। এখন প্রশ্ন: দেবীরূপে ঘটটির প্রতিষ্ঠাকাল কখন, এবং মন্দিরের ধ্বংসকালই বা কখন ?

নিগূঢ়ানন্দ বলেছেন যে মনে হয় বৌদ্ধধর্মের বিলুপ্তির পর ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ থেকে পূর্বভারতে শৈব ও শাক্তধর্মের দ্রুত বিস্তার ঘটে।[২৭] আর

তা যদি হয় তবে আমরা দেবী প্রতিষ্ঠার ঊর্ধ্বতম কালসীমা চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ বা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ধরতে পারি।

অম্বিকা কালনার সংলগ্ন শাসপুরের প্রাচীনতম শিলালিপি থেকে জানা যায় যে ৮৯৫ হিজরায় (১৪৮৯ খ্রীঃ) উলুগ আলি জাফর খান মসজিদটি তৈরী করেন।[২৮] খান সাহেব মৌলবী ওয়ালির মতে তা তৈরী হয় হিন্দুদেবালয়ের ধ্বংসাবশেষ দিয়ে।[২৯] এ থেকে কেউ কেউ উলুগ আলি জাফর খান কর্তৃক, বা এর অব্যবহিত পূর্বে কোন মুসলমান সেনানায়ক কর্তৃক মন্দির ধ্বংসের কথা ভাবতে পারেন। কিন্তু তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে ঘটটি যে পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল তা নিশ্চিত, এবং তার আবিষ্কার ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি কোন সময় হতে পারে।

সেক্ষেত্রে বলা যায়, পাথরের ঘটটি গভীর জঙ্গলের মধ্যে পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। কালক্রমে ডাকাতদের দ্বারা পূজিতা হতেন। আর তা প্রমাণিত হয় ডাকাতগণ কর্তৃক নরবলি দেওয়ার বিকল্পে ডাববলি দেওয়া থেকে। কালক্রমে দেবী অম্বুরীশের দ্বারা আবিষ্কৃত ও পূজিতা হতে থাকেন, এবং সুপ্রসিদ্ধা হয়ে উঠতে থাকেন। পরবর্তী সময়ে দারুমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হলে ঘটটির অস্তিত্ব গৌণ হয়ে পড়ে। আর এমন দৃষ্টান্ত বাংলার অনেক দেবালয়েই দেখা যায়। যেমন ব্যাণ্ডেলের নিকটবর্তী কোড়লার কালী বাড়িতে দৃষ্টান্ত রয়েছে।

সাক্ষাৎকারে বলা হয়েছে যে বর্ধমান রাজ চিত্রসেন মন্দিরটি সংস্কার করেন। কিন্তু তিনি যদি সংস্কার মাত্রই করতেন তবে মন্দিরগাত্রে তাঁর নামাঙ্কিত প্রতিষ্ঠালিপি থাকত না।

বিনয় ঘোষ প্রতিষ্ঠালিপির যে পাঠ নিয়েছিলেন তা হলো—"শুভম শকাব্দা ১৬৬১।২।২৬।৬ শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী দেবী শ্রীযুক্ত মহারাজা চিত্রসেন রায়সা। মিস্ত্রী শ্রীরামচন্দ্র—"।[৩০]

অন্যদিকে বর্তমান লেখককে একটি পত্রে মন্দির-গবেষক তারাপদ সাঁতরা লিখেছেন "লিপিটিতে এত চূণের প্রলেপ যে তা পাঠোদ্ধার অসম্ভব। ইতিপূর্বে ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি'তে লিপিটির পাঠোদ্ধার প্রসঙ্গে '১৬৬১।২।২৬।৬' বলা হয়েছিল। সেভাবেই সকলে এই লিপিটির পাঠ অনুসরণ করে আসছিলেন এবং ২।২৬।৬-এর অর্থটি পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেন নি।

আমি নিরীক্ষণ করে দেখলাম ঐটিতে কোন সংখ্যাবাচক ২।২৬।৬ নেই। সেজন্যে আমার পাঠোদ্ধার মত লিপিটির পূর্ণ বয়ান হ'ল :

"৮শুভমস্তু শকাব্দা ১৬৬১ দি
য়তাম শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী দে
বীং শ্রীযুত মহারাজ চিত্র
সেন রায়স্য মিস্ত্রি শ্রীরামচন্দ্র।"

সুতরাং এ থেকে এটাই স্পষ্ট যে রাজা চিত্রসেন ১৬৬১ শকাব্দে (১৭৩৯ খ্রীঃ) মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন।

বর্তমান দারু মূর্তিটি শবারূঢ়া। চতুর্ভুজা। দক্ষিণ দুই হস্তে বরাভয়। বামে উর্ধ্বহস্তে খর্পর, নিম্নহস্তে নরমুণ্ড। শিবের উপর বামপদ এগিয়ে। তাই তিনি নাকি বামাকালী। উচ্চতা প্রায় ৫ ১/২ ফুট। ইনি দারু নির্মিত হলেও শিবের মূর্তিটি কিন্তু দারু নির্মিত নয়।

গর্ভগৃহের বায়ুকোণে রক্ষিত আছে পাথরের কুলোর উপর জমাটবদ্ধ সেই ঘটটি। কুলো সমেত এটির উচ্চতা প্রায় ২-২ ১/২ ফুট। এই কুলোর সাথে একীভূত পাথরের ঘটটি বাংলা প্রত্নতত্ত্বের একটি বিরল নিদর্শন। মন্দিরবাড়ির প্রবেশ দ্বারের উর্ধ্বে রয়েছে একটি বৃহদাকার দণ্ডায়মান সিংহ, যা প্রাচীন রীতিরই ঐতিহ্যবাহী।

মন্দিরটি উচ্চভিত্তি বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরটিতে উঠবার নয়টি ঢেউখেলানো সিঁড়ি রয়েছে। অবশ্য এই ঢেউখেলানো সিঁড়ি পরবর্তী কালের সংযোজন।

এই জোড় বাংলা রীতির মন্দিরটির আয়তন ২৭'×১০', এবং ভিত্তিবেদীর উপর এর উচ্চতা প্রায় ১৫ ফুট। এর বাঁকুড়ার জোড় বাংলা মন্দিরের মতো সংযোগকারী চূড়া নেই।

মন্দিরের পূর্বদিকে সারিবদ্ধভাবে রয়েছে পশ্চিমমুখী ৪টি শিব মন্দির। একটি সম্পূর্ণ ভগ্ন। এদের মধ্যে একটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৬৬৮ শকাব্দে (১৭৪৬—৪৭ খ্রীঃ)। এটি প্রতিষ্ঠা করেন তিলকচন্দ্রের অমাত্য রামদেব নাগ। এক্ষেত্রে বিনয় ঘোষ বলেছেন যে রামদেব নাগ মূলাযোড় গ্রাম পত্তনি নিয়ে ভারতচন্দ্রের উপর যে অত্যাচার করেছিলেন তার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ শিবমন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন।[৩১] কিন্তু ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন যে ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতচন্দ্র মূলাযোড়

গ্রামে বসবাস করার উদ্দেশ্যে বাটী নির্মাণ করেন।[৩২] আর তা যদি হয় তবে রামচন্দ্র নাগের মূলাঘোড় গ্রামটির পত্তনি নেওয়া ১৭৪৬-৪৭ খ্রীষ্টাব্দের পরের ঘটনা। তাই তাঁর মন্দির প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রায়শ্চিত্তের প্রশ্ন আসে না।

মন্দিরটির প্রতিষ্ঠা লিপিতে লেখা আছে :

শুভমস্তু শকাব্দা : ১৬৬৮।১।৩।৬

শ্রীরামদেব নাগস্য।

রাজা ত্রিলোকচন্দ্রের মাতা লক্ষ্মীকুমারী দেবীর নামে যে আটচালাবিশিষ্ট শিবমন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয় তার প্রতিষ্ঠাকাল ১৬৮৫ শকাব্দ (১৭৬৩-৬৪ খ্রীঃ)। এর প্রতিষ্ঠা লিপিটির পাঠ হচ্ছে :

শকাব্দা : ১৬৮৫

বাণাহিতকৌর্ষধিনাথ শাকে গঙ্গাম্বিকে শ্রীশিবদেবস্যসৌধং।

ত্রিলোকচন্দ্র মহিপাল মাতা কাবেব কৈলাস-পুরংচকার॥

অর্থাৎ রাজা ত্রিলোকচন্দ্রের মাতা ১৬৮৫ শকাব্দে গঙ্গা এবং অম্বিকার উদ্দেশ্যে শিবেব মন্দিরটি দান করেন।

আর একটি মন্দির ত্রিলোকচন্দ্রের পত্নী বিষণকুমারী যে প্রতিষ্ঠা করেন, তা জানা যায় 'বর্ধমান-রাজবংশানুচরিত' গ্রন্থ থেকে। এর প্রতিষ্ঠালিপি নেই।

সিদ্ধেশ্বরী দেবীর প্রতি বছর অঙ্গরাগ হয়। অঙ্গরাগ শুরু হয় বার্ষিকী পূজার অর্থাৎ কার্তিকী অমাবস্যার ১০ দিন আগে। তখন মন্দির বন্ধ থাকে। ঘটে পূজা হয়। ভূতচতুর্দ্দশীতে অর্থাৎ দেওয়ালীর পূর্বদিন দেবীর দিগম্বরী বেশ জনসমক্ষে দেখানো হয় সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত। তারপর বস্ত্র পরিয়ে দেবীর পূজা। বাৎসরিক পূজায় ২টি কালো ছাগ, ২টি ভেড়া, কুমড়ো, আখ ও ডাব বলি দেওয়া হয়। পূজা হয় তন্ত্রমতে বামা কালীর ধ্যানে।

তরুণ ভট্টাচার্য ভূতচতুর্দ্দশীতে দেবী সিদ্ধেশ্বরীকে 'দিগম্বরী' রূপে দেখানোর ক্ষেত্রে জৈন দিগম্বরীদের লৌকিক আচারের ছায়া খুঁজে পেয়েছেন।[৩৩] কিন্তু এই খুঁজে পাওয়ার ক্ষেত্রে কোন যুক্তি আছে বলে মনে হয় না।

দেবীর অধিষ্ঠান একদা ছিল মূলতঃ শ্মশানভূমিতে, পশুবলি যাঁর পূজার অঙ্গ, নরবলির স্মারকরূপে যেখানে ডাব বলি দেওয়া হয়, নৈবেদ্যে যেখানে মৎস্য দেওয়া হয়, যেখানে কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশী তিথি শক্তি সাধনার প্রকৃষ্ট সময়, সেখানে

সিদ্ধেশ্বরী যে তন্ত্রাশ্রয়ী দেবী তাতে সন্দেহ থাকে না। তন্ত্রমতে তিনি কখন কোমলকান্তরূপে, আবার কখনও বা ভয়ঙ্করী মূর্তিতে পূজিতা হন। এখানে যেহেতু তাঁর অধিষ্ঠান ছিল শ্মশানভূমিতে, এবং নরবলি ছিল তাঁর পূজার অঙ্গ, সেহেতু তাঁর ভয়ঙ্করী মূর্তিই প্রত্যাশিত। তাছাড়া, যেহেতু তিনি 'কালিকা', সেহেতু স্বরূপে তিনি তো দিগম্বরীই। আমরা জানি, দেবতার বিশেষ বিশেষ বেশ দেখানো উৎসবের একটি রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যেমন পুরীতে জগন্নাথের নানা বেশ, বাঘনাপাড়ার কানাই বলাই-এর নানা বেশ, অগ্রদ্বীপের গোপীনাথের নানা বেশ দেখানো হয় জনসমক্ষে। সুতরাং এক্ষেত্রেও আমরা সিদ্ধেশ্বরীর স্বরূপ দিগম্বরী বেশকে দেখানো একটি রীতি বলে ধরে নিতে পারি। তাই সিদ্ধেশ্বরীর দিগম্বরী বেশের মধ্যে জৈন দিগম্বরদের আচার অনুষ্ঠানের ছায়া খোঁজার চেষ্টাকে যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয় না।

যাই হোক, অথর্ব বেদের ১ম কাণ্ড: ১ম অনুবাকের পঞ্চম সূক্তে বলা হয়েছে—'বরণীয় ধনের নিয়ন্ত্রী হে জলদেবীগণ, আমি তোমাদের কাছে ব্যাধি নিবারক শান্তিপ্রদ ঔষধ (অমৃত) প্রার্থনা করছি।'[৩৪] এ থেকে বলা যায়, জলদেবীদের কাছে ঔষধ চাওয়ার ইতিহাস এক যুগের নয়। যেখানে বর্তমান যুগের মতো ডাক্তার প্রত্যাশিত ছিল না, যেখানে আর্থিক দিক থেকে অসহায় মানুষেরা ভিষজ বৈদ্যের কাছে যেতে পারত না, যেখানে অনির্ণিত দুরারোগ্য জটিল ব্যাধিতে মানুষ ছিল অসহায়, সেখানে মানুষ দৈবী শক্তির কাছে ছুটে গেছে। আজও এর ব্যতিক্রম নয়। আজও যেখানে আর্থিক দিক থেকে অসহায় মানুষেরা চিকিৎসার সুযোগ নিতে পারে না, অনির্ণিত বা দুরারোগ্য ব্যাধিতে বিভ্রান্ত, যেখানে প্রাকৃতিক বিপত্তির ক্ষেত্রে মানুষ অসহায়, যেখানে চাওয়ার ক্ষেত্রে ক্ষেত্রবিশেষে পাওয়ার প্রশ্নটা মানুষের করায়ত্ত নয়, সেখানে প্রত্যাশা পূরণ হোক বা না হোক, তবু প্রত্যাশা পূরণের আকাঙ্ক্ষায় অন্যান্য দেবস্থানের মতো মানুষেরা সিদ্ধেশ্বরী বাড়িতে ছুটে যায়। এই সিদ্ধেশ্বরী বাড়ির উৎসব অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। এরই মধ্য দিয়ে ধর্মীয় সংস্কৃতির ধারা প্রবহমান থাকে।

তথ্যপঞ্জী

১। কৌশিকী, জানুয়ারী ১৯৯৫, পৃঃ ১৭৩

২। বাংলার স্থান নাম, ডঃ সুকুমার সেন, আনন্দ, ২য় সং ১৩৮৯, পৃঃ ৯, ১০, ৬৭

৩। অম্বুকণ্ঠ, আশ্বিন ১৩৯৬, পৃঃ ১১২

৪। কৌশিকী, জানুয়ারী ১৯৯৫, পৃঃ ১৭৭

৫। মহাতীর্থ একাম্রপীঠের সন্ধানে, নিগূঢ়ানন্দ, শরৎ পাবলিশিং হাউস, ৩য় সং ১৩৯১, পৃঃ ৭১-৭২

৬। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (২য় খণ্ড : চৈতন্য যুগ), ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক, ৩য় সং ১৯৮৩, পৃঃ ৩৫০

৭। শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধান, সঙ্ক : শ্রীহরিদাস দাস, ২য় সং ৫০১ শ্রীচৈতন্যাব্দ, নবদ্বীপ, পৃঃ ১৩৭৬

৮। কবিকঙ্কন চণ্ডী, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, বসুমতী, পৃঃ ১৫৬, ১৮১

৯। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (২য় খণ্ড : চৈতন্য যুগ), ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক, ৩য় সং ১৯৮৩, পৃঃ ৩৯৮

১০। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড : পূর্বার্ধ), ডঃ সুকুমার সেন, ইস্টার্ন পাবলিশার্স, ৪র্থ সং ১৯৬৩, পৃঃ ২৪১

১১। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (২য় খণ্ড : চৈতন্য যুগ), ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক, ৩য় সং ১৯৮৩, পৃঃ ১১০

১২। বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব / ১ম খণ্ড), নীহাররঞ্জন রায়, পঃ বঃ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, ১ম সাক্ষরতা সং ১৯৮০, পৃঃ ৯৯

১৩। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড । অপরার্ধ), শ্রীসুকুমার সেন, ইস্টার্ন পাবলিশার্স, ২য় সং ১৯৬৫, পৃঃ ৩৯১

১৪। তদেব, পৃঃ ৩১ (পাদটীকা)

১৫। তদেব, পৃঃ ৩০ (পাদটীকা)

১৬। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (৩য় খণ্ড । ১ম পর্ব : ১৭ শতক), ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক, ২য় সং ১৯৮০, পৃঃ ৬৬০-৬১

১৭। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, এ. মুখার্জী, ষষ্ঠ সং ১৯৭৫, পৃঃ ৯৫০-৫১

১৮। কবিকঙ্কন চণ্ডী, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, বসুমতী, পৃঃ ১৫৬, ১৮১
১৯। তদেব, পৃঃ ২৩১
২০। Some Jaina Antiquities from Bankura, West Bengal, Debala Mitra—J. A. S. Letters, vol xxiv, No. 2
২১। বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি, অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্তবিভাগ, পঃ বঃ সরকার, ১ম প্রকাশ ১৯৭১, পৃঃ ৩১
২২। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (১ম), বিনয় ঘোষ, প্রকাশ ভবন, ৩য় মুদ্রণ ১৩৯৫, পৃঃ ১৩১
২৩। তিন হাজার বছরের লোকায়ত জীবন, শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এ. মুখার্জী, ১ম সং ১৩৮৭, পৃঃ ৭৮
২৪। তদেব, পৃঃ ২০৩
২৫। বাংলার লৌকিক দেবতা, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, দে'জ, ১ম প্রকাশ ১৯৬৬, পৃঃ ৪৯
২৬। কৌশিকী, শারদীয় ১৩৯৩, পৃঃ ২৭
২৬ (ক)। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, ডঃ অলোক কুমার চক্রবর্তী, প্রগ্রেসিভ বুক ফোরাম, ১ম প্রকাশ ১৯৮৯, পৃঃ ১৫৩
২৭। মহাতীর্থ একান্নপীঠের সন্ধানে, নিগূঢ়ানন্দ, শরৎ পাবলিশিং, ৩য় সং ১৩৯১, পৃঃ—ভূমিকা অংশ
২৮। কৌশিকী, জানুয়ারী ১৯৯৫, পৃঃ ১৭৭
২৯। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (১ম), বিনয় ঘোষ, প্রকাশ ভবন, ৩য় মুদ্রণ, ১৩৯৫, পৃঃ ১৩২
৩০। তদেব, পৃঃ ১৩৮
৩১। তদেব, পৃঃ ১৩৮
৩২। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, এ. মুখার্জী, ৬ষ্ঠ সং ১৯৭৫, পৃঃ ৭৯৩
৩৩। কালনার ইতিহাস, তরুণ ভট্টাচার্য, মাতৃকা প্রকাশনী, কালনা, প্রথম সং ১৯৯৬, পৃঃ ১২৫
৩৪। অথর্ব বেদ, অনু ও সম্পাঃ—শ্রীবিজন বিহারী গোস্বামী, হরফ প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ ১৩৮৫, পৃঃ ৬

ঐস্লামিক-সংস্কৃতি

কালনার সন্নিহিত শাসপুর অঞ্চলে কয়েকটি মসজিদের ধ্বংসাবশেষ পরিদর্শন করে খান সাহেব মৌলবী আবদুল ওয়ালী লেখেন : "It appears that it was a celebrated place during the Muhammedan rule, and earlier, during the Hindu period. Being situated on the river, it was no doubt considered to be a healthy and suitable place for strategical purposes. Nothing of the period of the Hindus can now be traced, except that some of the later Archaeological remains reveal the fact that the Muhammedans built out of the materials of the older and Hindu ruins. The inscription noticed [below] show that Kalna was the seat of military Governors, who were generally, if not invariably of the Afgan or Turkoman race. I visited the ruins on the 8th March 1916. The ruins of a large fort constructed to command the river are still visible."[১] এখানে এই ক্ষেত্র সমীক্ষার প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে আম্বুয়াকে আফগান-তুর্কী শাসকগণ একটি সামরিক ঘাঁটিরূপে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, এবং একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। আর যখন থেকেই প্রথম মসজিদ নির্মিত হচ্ছে, তখন থেকেই অম্বিকা কালনার সংস্কৃতির ইতিহাসের সাথে যুক্ত হচ্ছে ঐস্লামিক সংস্কৃতির ধারা। শ্রীযজ্ঞেশ্বর চৌধুরী ৫টি পুরাতন মসজিদের উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহের রাজত্বকালে উলুগ আলি জাফর খান কালনায় একটি মসজিদ তৈরী করেন (৮৯৫ হিজরী / ১৪৮৯ খ্রীঃ), দ্বিতীয় নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহের রাজত্বকালে এখানে একটি মসজিদ তৈরী হয়, হোসেন শাহের রাজত্বকালে এখানে একটি মসজিদ তৈরী করে দেন হাযরত খানের পৌত্র তাইফুর খানের পুত্র মজলিস ফতওয়ার (৯১৮ হিজরী / ১৫১২-১৩ খ্রীঃ), আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহের আমলেও তাঁর উজির ও সেনাপতি

মালিক উলুগ মসনদ খান কালনায় নির্মিত দশগম্বুজবিশিষ্ট জামি মসজিদ তৈরী করেন (৯৩৯ হিজরী / ২৭ মার্চ ১৫৩৩ খ্রীঃ), আর একটি প্রতিষ্ঠিত হয় মহম্মদ খান গাজীর পুত্র খিজির খানের আমলে (৯৬৭ হিজরা / ১৫৫৯ খ্রীঃ)।[২]

সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহের রাজত্বকালে প্রতিষ্ঠিত মসজিদটির যে প্রতিষ্ঠালিপি পাওয়া গেছে তা হলো—

ক্বালান নাবিয়ে আলায়হেস সাল্লামো মান বানি মাসজিদান ফিদ্দুনিয়া বানিল্লাহা লাহু সাবইনা কাসিরান ফিল জান্নাতে, ওয়াকাদ বানি হাজাল মাসজিদুস স্থলতানেল আদলে সাইফুদ্দিন ওয়াদ্দিনে আবুল মুজাফর ফিরোজ শাহু স্থলতানে খালেদিল্লাহে মালাকেহী ওয়া বানি হাজাল মাসজিদে মজালিস··· ওয়া হুয়া সাঈদ···খাওরেখান সানাতুন···সামানিয়াত।

এখানে শিলালিপিটিতে 'সাঈদ'-এর নাম পাওয়া যাচ্ছে, আর সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহের একজন কর্মচারীরূপে 'সাঈদে'র নাম উল্লেখ করেছেন শ্রীস্থখময় মুখোপাধ্যায়।[৩] এ থেকে অনুমান করা যায় যে সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহের অনুমতিক্রমে তাঁর কর্মচারী সাঈদ মসজিদটি প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীস্থখময় মুখোপাধ্যায় নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহের (২য়) যে দুজন রাজ কর্মচারীর উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে একজনের নাম দৌলতখান।[৪] এঁর নাম পাওয়া যায় নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহের (২য়) আমলের শাসপুরে প্রতিষ্ঠিত আর একটি মসজিদের শিলালিপিতে। এ থেকে অনুমান করা যায় যে নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহের (২য়) অনুমতিক্রমে হিজরা ৮৯৫ অব্দে দৌলতখান মসজিদটি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠালিপিতে বলা হয়েছে :

(১) আল্লাহ লা এলাহা ইল্লা হুয়াল কাইয়ুম। লা তা' খুজু ওলা নাওম, লাহু মা ফিস সামাওয়াতে ওয়া ফিল আরদে। মান জাল্লাজি ইয়াসফাও এনদাহু ইল্লা বে এজনেহী ইয়ালামো।

(২) মা বাইশা আইদিহিম ওয়ামাখালফাহুম। ওয়ালা ইয়াহ ইয়াতুনা বে সাইম্নিম মিন এলমে হি ইল্লা বেমাশাআ। ওয়াশেয়া কুরশিয়াহুস সামাওয়াতে ওয়াল ওয়াল আরদা ওয়ালা ইয়াওতুহু হেফজুহুমা। ওয়া হুয়াল আলিউল আজিম।

(৩) লা একরাহা ফিল্দুনিয়া কাদ ভাবাইয়ানার রাশিদো মিনাল গাইয়ে। ফামাই ইয়া কাফার বিত্তাগুতে ওয়া ইয়ুমেহু বিল্লাহে ফাকাদ এসতামসেকা বিল উরুতেল উসাকা লা আনফুসামে লাহা ওয়াল্লাহো।

(৪) সামীউল আলীম, বানি হাজাল মাসজিদে দৌলতখানা। কী আহাদেস সুলতানো এবনে সুলতানুন নাসিরুদ্দ্‌নিয়া ওয়াদ্দিনে আবু (মুজাহাদ) মাহমুদা সাহু বে আদসাহা গাজী। খালেদুল্লাহে মালেকাহু ওয়া সুলতানাহু। ফিত্তারিখো সানাতো খামিসো ওয়া তেসইনা ওয়া নামানিয়াতা।

অবশ্য এই শিলালিপিটির তারিখ নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ বলেছেন যে এর তারিখ ৮৯৫ হিজরা।[৫] আবার কোথাও বলা হয়েছে যে এর তারিখ ৮৯৬ হিজরা।[৬] আর এই মতভেদ আসছে শিলালিপিখানির অস্পষ্টতার জন্য। তবে বলা যায় সুলতান সৈফুদ্দীনের মৃত্যুর পর ১৪৮৯-৯০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মসজিদটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

শ্রীযজ্ঞেশ্বর চৌধুরী বলেছেন যে হোসেন শাহের রাজত্বকালে এখানে একটি মসজিদ তৈরী করে দেন হাযরত খানের পৌত্র তাইফুর খানের পুত্র মজলিস ফতওয়ার (৯১৮ হিজরী / ১৫১২-১৩ খ্রীঃ)। ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যে আলাউদ্দিন্ হোসেন্ শাহের একখানি মাত্র শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বর্ধমান জেলার কালনার শাহ মজলিসের আস্তানার নিকটে একটি পুরাতন মসজিদে এই শিলালিপিখানি আবিষ্কৃত হয়েছিল এবং তদনুসারে ৯৩৯ হিজরায় রমজান মাসের প্রথম দিবসে (২৭শে মার্চ ১৫৩৩ খ্রীঃ) উলুগ্ মসনদ খান মালিক কর্তৃক এই মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল।[৭] কিন্তু ঐতিহাসিক রাখালদাসের মতানুযায়ী মসজিদটি যদি ৯৩৯ হিজরায় প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে তা আলাউদ্দিন্ হোসেন শাহের রাজ্য কালের হতে পারে না। কারণ তাঁর রাজত্বকাল ১৪৯৩ থেকে ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। অবশ্য 'বর্ধমান পরিচিতি' নামক গ্রন্থের লেখকদ্বয় বলেছেন যে ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত 'ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব' নামক সরকারী পুস্তিকার সম্পাদকদ্বয় আরও যে দুটি শিলালেখের উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে একটি আলাউদ্দিন হোসেন শাহের।[৮] কিন্তু শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর' নামক গ্রন্থে হোসেন শাহের প্রাপ্ত যে শিলালিপির তালিকা দিয়েছেন[৯] তাতে এমন কোন হোসেন শাহী শিলালিপির উল্লেখ নেই, যা কালনায় পাওয়া গেছে। সুতরাং এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে. তবে কেন কালনায় হোসেন শাহের আমলের বা হোসেন্ শাহের মসজিদ প্রতিষ্ঠার কথা আসছে? এক্ষেত্রে বলা যায়, প্রথমে ব্লকম্যান সাহেব মনে করেছিলেন যে শিলালিপিগুলি হোসেন শাহের

আমলের।[10] আর এই মনে করা থেকেই যতদূর সম্ভব হোসেন শাহী আমলের বা হোসেন শাহের মসজিদ প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে।

শাসপুরের অন্তর্গত দাঁতনকাঠি তলায় যে মসজিদটি রয়েছে তা আলাউদ্দিন আবুল মুজফ্‌ফর ফিরোজ শাহের সেনাধ্যক্ষ ও অমাত্য উলুগ মসনদ খান মালিক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় ৯৩৯ হিজরার রমজান মাসের (২৭শে মার্চ ১৫৩৩খ্রীঃ) প্রথম দিনে। এর শিলালেখে বলা হয়েছে :

(১) বানি হাজাল মাসজিদেল জামি ফি জামান্নুল মালেকুল আদলে আলাউদ্দ্‌ নিয়া ওয়াদ্দিন আবুল মুজাফর ফিরোজশাহ।

(২) সুলতান বিন নুসরাত্‌ শাহাস সুলতান খালেদুল্লাহে মালেকুহু ও সুলতান্নুহুবানা কারেদুহু মালিকুল মুয়াজ্জাম ওয়াল সুকরিম উলুগ মসনদখান মালিক সেরলস্করওয়া উজিরো মালামাল্লাহু ফিদুনিয়া। মওরে খান ফিল গুররাতে মিন শাহরেল মুবারকে রামাজান সানাতো তেসআ ওয়া আলসিনা ওয়া তেসএমাইয়াতে। কালান্নাবিয়ে আলায়হেস্‌ সালামো সান বানি মাসজিদান ফিদ্দ্‌ নিয়া বানিল্লাহা সাবয়িনা কাসিরান ফিল জান্নাতে। বানি ফি আহাদেস সুলতানে ফিরোজ (শাহ) এস্‌সুলতানে খালেদিল্লাহে মালেকুহু ওয়া সুলতান্নুহু ......উলুগ আলি জাফরখান......খান......উলুগ......খামসে ওয়া তেইসনা ওয়া সামানিয়াতা।

এই জামিয়া মসজিদটির শিলালিপিটিতে নসরত শাহের পুত্র ফিরোজ শাহের সৈন্যাধ্যক্ষ ও অমাত্য উলুগ মসনদ খান মালিকের নাম থাকলেও উলুগ আলি জাফর খানের নামও রয়েছে। সুতরাং এ থেকে অনুমান করা যায় যে মসজিদটির প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উলুগ আলি জাফর খানের বিশেষ একটা ভূমিকা ছিল, বা উলুগ মসনদ খানের সাথে সম্বন্ধসূত্রে নামটি যুক্ত হতে পারে।

এই জামিয়া মসজিদটিকে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, এর দশটি গম্বুজ ছিল। এর অলঙ্কার-সজ্জা-প্রকরণের সাথে গৌড়ের ছোট সোনা মসজিদের নিকট সাদৃশ্য আছে। অলঙ্করণের মধ্যে রয়েছে ফুল, লতাপাতার পদ্মসজ্জা ও নানা জ্যামিতিক নক্সা। দ্বারের ভিতরের অংশের মাথার দুইকোণে প্রথাগত দুটি পদ্ম। এই মন্দির পরিকল্পনায় বিভিন্ন সাইজের পাথর ব্যবহার করা হয়েছিল। বিনয় ঘোষ পাথরের টুকরোর উপর হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি খোদিত দেখেছিলেন।[১১] কিন্তু তিনটি মসজিদের ধ্বংসের মধ্যে বহু পাথরই ছড়িয়ে

রয়েছে। কিন্তু তাদের মধ্যে আমি হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি দেখি নি। তবে একটি পাথরে ঘাস খাওয়া মুদ্রায় একটি হরিণের মূর্তি দেখেছিলাম। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদনে আর একটি মসজিদের উল্লেখ রয়েছে। কালনায় আবিষ্কৃত একখানি শিলালিপি অনুসারে ৯৬৭ হিজরায় (১৫৫৯ খ্রীঃ) গিয়াস-উদ্দীন বাহাদুর্ শাহের রাজ্যকালে সরওয়ার খান একটি মসজিদ নির্মাণ করিয়েছিলেন।[১২]

সুতরাং আমরা ৪টি মসজিদের অস্তিত্ব পাচ্ছি। এখন দেখতে হবে সেই চারটি মসজিদের অবস্থান কোথায় ছিল। এক্ষেত্রে প্রথমেই বলা যায় যে উলুগ মসনদ খান প্রতিষ্ঠিত জামিয়া মসজিদটি ছিল শাসপুরের অন্তর্গত দাঁতনকাঠি তলায়।

কালনা মিশন হাউসের কাছেই রয়েছে শাহ মজলিসের বা মজলিস সাহেবের সমাধি। এর গায়েই রয়েছে একটি মসজিদের ও বাসস্থানের ধ্বংসাবশেষ। এক্ষেত্রে প্রশ্ন থাকে, তবে কি মসজিদটি মজলিস সাহেব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত? যদি হয় তবে কে ছিলেন ঐ মজলিস সাহেব?

পূর্বেই বলা হয়েছে যে নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহের (২য়) আমলে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেই নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহের (২য়) একজন কর্মচারী ছিলেন, যাঁর নাম মজলিস খান, যিনি গৌড়ে একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু এখানে মসজিদটি নির্মাণ করছেন নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহের অন্য কর্মচারী দৌলত খান। অন্যদিকে, সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহের আমলে যে মসজিদটির প্রতিষ্ঠা হয়, তার প্রতিষ্ঠাতারূপে যে নামটি পাই তা হলো সাঈদ। ইনি ছিলেন সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহের কর্মচারী। এঁর নামের পূর্বে মজালিস (>মজলিস) নামটি যুক্ত আছে শিলালেখে। এ থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে কালনা মিশন হাউসের কাছে যে মসজিদটির ধ্বংসাবশেষ রয়েছে সেটি হল সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহের আমলে মজালিস (মজলিস) সাঈদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

আর একটি মসজিদের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে জামিয়া মসজিদ আর মজলিস সাহেবের দীঘির মধ্যস্থলে। আর একটির প্রসঙ্গে শ্রীযজ্ঞেশ্বর চৌধুরী বলেছেন যে মসলিস দীঘির তীরে একটি মসজিদ আস্তানা ও মাজার ছিল।[১৩] কিন্তু মসজিদ যদি থাকত তবে দীঘিটির কোন তীরে ধ্বংসাবশেষ জনিত ঢিবি থাকত,

কিন্তু তা নেই। বরং একটি ধ্বংসাবশেষ জনিত ঢিবি রয়েছে মীরের বাগানে। তবে দীঘির ঈশান কোণে যে একটা মাজার ছিল, তা ঐ স্থানটিকে পবিত্র জ্ঞানে সংরক্ষণের নির্দেশ থেকে স্পষ্ট হয়, যা কিছুদিন পূর্বেও অবশ্য পালনীয় বলে শুনেছি দীঘির বর্তমান সত্ত্বাধিকারীর কাছে।

জামিয়া মসজিদ ও মজলিস দিঘীর মধ্যস্থলে যে মসজিদটি অবস্থিত, তা দৌলত খান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত, না সরওয়ার খান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত তা নির্ধারণ করা দুরূহ।

এই মসজিদগুলি ছাড়াও যবানীপাড়া ও জেলেপাড়ায় আরও দুটি মসজিদ রয়েছে। উনবিংশ শতকে নির্মিত জেলেপাড়ার মসজিদটির প্রসঙ্গে শ্রীযজ্ঞেশ্বর চৌধুরী বলেছেন যে মসজিদের প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায়, পরম করুণাময় আল্লাহ্ ও তাঁর দূত মহাম্মদকে স্মরণ করে সেখ খয়েরউল্লা এই মসজিদ নির্মাণের সংকল্প করেছিলেন। উক্ত মসজিদের নির্মাণকার্য হিজরা ১২৬১ অব্দের (১৮৪৫ খ্রীঃ) ৬ই ফাল্গুন শুরু হয় ও ১৪ই শ্রাবণ সমাপ্ত হয়।[১৪]

এখন আবার সেই পুরাতন মসজিদগুলির প্রসঙ্গ। সেই প্রসঙ্গে খান সাহেব মৌলবী আবদুল ওয়ালী বলেছেন যে হিন্দু দেবালয়ের ভগ্নাবশেষ দিয়ে মসজিদগুলি তৈরী।[১৫] কিন্তু কালনার পুরাতন মসজিদগুলি এই মতের যে পুনঃ বিবেচনার দাবী রাখে তা আমার মনে হয়েছে মসজিদগুলির ধ্বংসাবশেষ পর্যবেক্ষণ করে।

আমরা জানি, 'খলীফৎ আল্লাহ' সুলতান শামসুদ্দীন য়ুসুফ খাঁর রাজত্বকালে ৮৮২ হিজরার ১লা মহরম (১৫ই এপ্রিল, ১৪৭৭ খ্রীঃ) তারিখে বর্তমান হুগলী পাণ্ডুয়ায় হিন্দুর মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ তৈরী করা হয়েছিল। নারায়ণ ও সূর্যের মন্দিরকে মসজিদ ও মিনারে পরিণত করা হয়েছিল।[১৬] আর তারই ১২ বছর পরে ১৪৮৯-৯০ খ্রীষ্টাব্দে অম্বিকা কালনার শাসপুরে ২টি মসজিদ নির্মিত হচ্ছে। সুতরাং এখানেও যে হিন্দুমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দিয়ে মসজিদ দুটি নির্মিত হচ্ছে না, তা বলা যায় না। তবু বলা যেত যদি আরও দুটি মসজিদ একই সময়ে নির্মিতা হোতো। একটি হচ্ছে ৪২ বছর পরে, আর তার ২৭ বছর পরে আর একটি নির্মিত হচ্ছে। অর্থাৎ ১৪৮৯-৯০ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুর দেবালয় ভেঙ্গে দুটি মসজিদ নির্মাণ করা হচ্ছে, আবার ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুর দেবালয় ভেঙ্গে আর একটি মসজিদ নির্মাণ করা হচ্ছে, আবার ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুর দেবালয় ভেঙ্গে আর

একটি মসজিদ নির্মাণ করা হচ্ছে, এমন কল্পনার ক্ষেত্রে কেমন যেন একটা খট্‌কা থেকেই যায়।

মৌলবী আবদুল ওয়ালী মসজিদগুলির ধ্বংসাবশেষের মধ্যে হিন্দু স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষ দেখেছেন, বিনয় ঘোষও ৪২-৪৫ বছর পূর্বে মসজিদগুলির পাথরের টুকরোর উপর হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি খোদিত দেখেছিলেন, তাঁদের ঐ প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রে অবশ্যই সত্য আছে। কিন্তু জামিয়া মসজিদের ভিতর যেসব প্রস্তরখণ্ড রয়েছে, এবং অন্য মসজিদের ক্ষেত্রে যে সব প্রস্তরখণ্ড ইতঃস্তত বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে রয়েছে তাদের মধ্যে হিন্দু-দেবদেবীর মূর্তি খোদিত দেখি নি। অবশ্য ৪২-৪৫ বছর পরে সেসব স্থানান্তরিত হওয়া হয়তো অসম্ভব নয়। আর একথা স্বীকার করে নিয়েও যখন নিখুঁতভাবে জামিয়া মসজিদের গঠন কৌশল দেখি তখন পূর্বসিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে পুনঃবিবেচনার প্রশ্নটি এসে যায়।

জামিয়া মসজিদটি বিশাল, সুউচ্চ এবং দশগম্বুজ বিশিষ্ট। অন্য মসজিদ দু'টি আয়তনে ততটা বিশাল না হলেও সুউচ্চ গম্বুজবিশিষ্ট ছিল। এদের মধ্যে প্রথম দুটির নির্মাণকাল ১৪৮৯-৯০ খ্রীষ্টাব্দ। এক্ষেত্রে শ্রীঅমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যটিকে উদ্ধার করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন "মোসলেম-বিজয়ের পরবর্তী প্রায় দেড়শো-দু'শো বছর হিন্দু-মন্দির প্রতিষ্ঠা প্রচণ্ডভাবে ব্যাহত এমন কি স্তব্ধ হয়ে গেলেও সংশ্লিষ্ট কারিগররা তাঁদের যুগ-যুগান্তর ব্যাপী বংশানুক্রমিক অভিজ্ঞতা একেবারে ভুলে যান নি। কেন না, পনর শতকের প্রথমার্ধে বিজেতারা যখন নিজেদের ধর্মীয় প্রয়োজনে মসজিদ, কবর-হর্ম্য প্রভৃতি বানাতে শুরু করলেন তখন বাধ্য হলেন এইসব সুলভ, হতোদ্যম শিল্পীদের সাহায্য নিতে।"[১৭] আর তা যদি হয় তবে বিদেশাগত তত্ত্বাবধায়ক থাকলেও এখানেও যে এদেশীয় শিল্পীদের স্থাপর্যকার্যে নিয়োগ করা হয়েছিল, তা বলা যায়। কারণ, "প্রয়োজনীয় অসংখ্য কারিগর যে তাঁরা ইরাণ-তুরাণ থেকে সঙ্গে আনেননি তা বলাই বাহুল্য।"[১৮] আর তার প্রমাণও রয়েছে জামিয়া মসজিদে। এই মসজিদের দ্বারের ভিতরের অংশের মাথার দুই কোণে রয়েছে প্রথাগত দুটি পদ্মের অনুকৃতি, যা হিন্দুশিল্পীদের স্বাক্ষরবাহী। সুতরাং যেখানে এখানকার স্থাপত্যকার্যে হিন্দু শিল্পীদের নিযুক্ত করা হচ্ছে, যেখানে "গম্বুজ নির্মাণে মুসলমান স্থপতিদের কাছেই হিন্দু স্থপতিদের হাতে খড়ি",[১৯] সেখানে মোসলেম স্থাপত্য-সৃষ্টির প্রায় সূচনাকালে (দ্বিতীয়ার্ধে)

হিন্দু শিল্পীরা বিশাল স্থাপত্য ও সুউচ্চ গম্বুজের ক্ষেত্রে স্থায়ীত্বের কথা চিন্তা করে একমাত্র ইঁটের গাঁথুনীকে আশ্রয় করে হয়তো ঝুঁকি নিতে চান নি। সেক্ষেত্রে স্থায়ীত্বের কথা চিন্তা করেই হয়তো পাথর আনানো হয়েছিল, এবং তা সম্ভব হয়েছিল সুলতানগণের অর্থানুকূল্যের জন্যই। আর তা অন্য দুটির ক্ষেত্রে বোঝার উপায় না থাকলেও জামিয়া মসজিদটির গঠন কৌশল প্রত্যক্ষ করে স্পষ্ট বোঝা যায়।

যেহেতু তৎকালীন সময়ে ঢালাই-এর ব্যবস্থা ছিল না, সেইহেতু স্থাপত্যকে দৃঢ় করতে লিন্‌টুল ঢালাই-এর পরিবর্তে এখানে সাইজমাফিক প্রস্তর খণ্ডের ব্যবহার করা হয়েছিল। একটা দেওয়ালকে আর একটা দেওয়ালের সাথে দৃঢ়-বন্ধনে বাঁধতে কোণগুলিতেও পাথরের ব্যবহার করা হয়েছে। আবার গম্বুজগুলোকে পাথরের থাম্বার উপর স্থাপন করা হয়েছে। সেই পাথরগুলি কৃষ্ণবর্ণের সিলিকন মিশ্রিত গ্রানাইট পাথর।

মেঝের উপরে প্রথমে ২'×২' সাইজের পাথব বসানো হয়েছে। তার উপর ২'×১½' সাইজের পাথর বসানো হয়েছে। তার উপর ৪'×১' ফুট সাইজের পাথর বসিয়ে তার উপর গম্বুজের কাজ শুরু করা হয়েছে। এইভাবে গম্বুজের এক একটা থাম্বা সৃষ্টি করা হয়েছে। এই থাম্বার পাথরের কোন অংশ গোলাকার, কোন অংশ অষ্ট কোণাকৃতি। এবং সেগুলি স্থাপত্যের ব্যাকরণ অনুসারেই সন্নিবিষ্ট। এখানে ৫'×১' সাইজের পাথরও রয়েছে। তাছাড়া আরও নানা সাইজের পাথর রয়েছে। আবার দুই গম্বুজের মধ্যবর্তী স্থানের জলকে নীচে বার করে দেবার জন্য পাথরের নালিকা তৈরী করে যে বসানো হয়েছিল, তার প্রমাণও দেখেছি। সর্বোপরি এই স্থাপত্যের ক্ষেত্রে প্রস্তরখণ্ডগুলির বিন্যাস এমনই যথাযথ ও ব্যাকরণ সম্মত এবং প্রয়োজনমাফিক যে এই স্থাপত্য কোন হিন্দু দেবালয়ের ধ্বংসাবশেষ দিয়ে তৈরী তা মেনে নিতে কুণ্ঠিত হতে হয়। তাছাডা তিনটি মসজিদে যত সংখ্যক প্রস্তরখণ্ড ব্যবহৃত হয়েছিল তা সবই যে 'Hindu ruins' তা মেনে নিতেও কুণ্ঠা জাগে। তাই এখানকার মসজিদ স্থাপত্যগুলির সম্বন্ধে যে পূর্ব-সিদ্ধান্তে রয়েছে, তার ক্ষেত্রে পুনঃবিবেচনা ও পুনঃ-মূল্যায়নের কথা বলেছি।

জামিয়া মসজিদটির অলঙ্কার সজ্জাপ্রকরণের সাথে গৌড়ের ছোট সোনা মসজিদের নিকট সাদৃশ্য আছে। বিনয় ঘোষ বলেছেন যে প্রবাদ এই, পূর্বে

নাকি একটি সোনালি মসজিদ মজলিস সাহেবের দীঘি থেকে উপরে ভেসে উঠত মেলার সময়।[২০] এই প্রবাদের মধ্যে কতটা সত্য আছে তা জানি না, তবে যেটুকু সত্য আছে বলে মনে হয়, তা হলো বড় সোনা মসজিদ বা ছোট সোনা মসজিদের মতো এই মসজিদগুলি, বিশেষ করে এই জামিয়া মসজিদটিতেও হয়তো সোনালি রঙের গিল্টির কারুকার্য ছিল, যা হয়তো কালান্তরের সংস্কারে অবলুপ্ত। এর মিহ্‌রাব রচনার ক্ষেত্রে রয়েছে ফুল, লতাপাতার পদ্ম সজ্জা এবং নানা জ্যামিতিক নক্সা।

মজলিস সাহেব ঃ

শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় বলেছেন যে সুলতানের মন্ত্রী, অমাত্য, পদস্থ কর্মচারীরা 'খান মজলিস', 'মজলিস-অল-আলা', 'মজলিস-অল-আজম', 'মজলিস অল-মুআজ্জম', 'মজলিস-অল-মজালিস', 'মজলিস-বারবক' প্রভৃতি উপাধি লাভ করতেন।[২১] আর এখানে সেই মজালিস উপাধিধারী একজনকেই পাচ্ছি, যাঁর নাম সাঈদ, যিনি সৈফুদ্দীন শাহের কর্মচারী ছিলেন, এবং এখানে প্রথম মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। আর তার সময়কাল ১৪৮৯-৯০ খ্রীষ্টাব্দ, অর্থাৎ সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহের রাজত্বের শেষপর্বে।

শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় বলেছেন যে অধিকতর সত্য বিবরণ এই—ফিরোজ শাহও পাইকদের হাতে নিহত হন।[২২] এতে অনুগত কর্মচারীরূপে তাঁরও ভাগ্যবিপর্যয় ঘটতে পারে, এবং সেক্ষেত্রে কালনায় এসে বাসস্থান নির্মাণ করে বাস করতে পারেন। আর সেই বাসস্থানের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে মাজারের যে প্রান্তে মসজিদটি রয়েছে তার বিপরীত প্রান্তে। এই বাসস্থানটি (মসজিদসহ) যে সুউচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল তারও ধ্বংসাবশেষ রয়েছে।

বিনয় ঘোষ বলেছেন যে প্রবাদ এই, পূর্বে নাকি একটি সোনালি মসজিদ ও চৌকি, মজলিস সাহেবের দীঘি থেকে উপরে ভেসে উঠত মেলার সময়।

—এই প্রবাদের মধ্যে যেটুকু সত্য আছে বলে মনে হয়, তা হলো মজালিস সাঈদ, যিনি মজলিস সাহেব নামে পরিচিত হন, তাঁর প্রতিষ্ঠিত মসজিদটি ছিল সোনালি রঙে গিল্টি করা, এবং চৌকিটি হয়তো ছিল তাঁর সাধন-চৌকি। অর্থাৎ এখানে এসে তিনি নিজেকে সাধনার সাথে যুক্ত করেন। জনহিতকর কার্যরূপে তিনি একটি বিশাল দীঘি (মজলিস দীঘি) খনন করান। তাতে

তিনি মজলিস সাহেব নামে আখ্যাত হতে থাকেন, এবং মৃত্যুর পর পীররূপে বন্দিত হতে থাকেন। সেক্ষেত্রে তাঁর সেবাইতগণ ওষুধদানের ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। সেই সূত্রে হিন্দু-মুসলমানের মেলবন্ধনের সূচনা হয়। মানতকারীরা তাঁর সমাধিতে মাটির ঘোড়া দিয়ে পূজা দেন। তাছাড়া, মজলিস সাহেবের 'উরস' কালনার প্রাচীন উৎসবগুলির অন্যতম। এটি হয়ে থাকে উত্তরায়ণের দিন। ঐদিন মজলিস সাহেবের দীঘির পাড়ে একটি মেলা বসে। এতে যোগ দেন সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষ। ঐ দিন জামী মসজিদে নমাজ পড়া হয়। এই নমাজ পড়া হয় ঈদের দিনেও। এইভাবেই অম্বিকা কালনার বুকে চলে আসছে ঐস্লামিক সংস্কৃতির চর্চা।

বদর সাহেব ঃ

পীর-পূজার উৎপত্তি আকস্মিক নয়। তুর্কী-অধিকারের প্রথম থেকেই এদেশে মুসলমান সাধু ও ধর্মপ্রচারকের প্রতিষ্ঠার আরম্ভ। সেক্ষেত্রে তাঁদের সিদ্ধান্তই তাঁদের প্রতি জন সাধারণের মনে ভয়ভক্তি জাগাতে শুরু করেছিল। তারপর শ্রীচৈতন্য হরিদাসকে মর্যাদা দিয়ে মুসলমান পীরের সঙ্গে হিন্দু সন্ন্যাসীর বিভেদ ঘুচিয়ে দেন। সেই থেকে জাতি-ধর্মনির্বিশেষের পীরভক্তি সঞ্চারিত হয়। তাছাড়া পীরদের ব্যাধিনিবারক ভূমিকা হিন্দুদেরও আরও কাছে টেনে নিল। আরম্ভ হলো পীরপূজা। সাধারণত পীর মরিয়ৎ, পীর তরিকৎ, পীর হকিকৎ এবং পীর মরিফৎ—এই চার প্রকারের পীর পূজার প্রবর্তন হয়।

পীরগণ হলেন ওলি ওথাৎ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহভাজন বন্ধু। কোরান শরিফে বলা হয়েছে, ওলিগণের মৃত্যু হয় না। বরং তিরোধানের পর তাঁদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। তাই পীরের সমাধিতে বা স্মৃতিবেদীতে পূজা দিয়ে জাতি-ধর্মনির্বিশেষে অনুগ্রহ লাভের চেষ্টা করা হয়। এখানেও তাই করা হয়।

ডঃ এনামুল হক বলেন যে বদর পীর ১৪৪০ খ্রীষ্টাব্দে বিহারে দেহরক্ষা করেন।[২৩] গোলাম সাকলায়েনের মতে, সম্ভবত পঞ্চদশ শতকের প্রথমভাগে বদরুদ্দিন কালনায় আসেন। তাঁর জন্মস্থান ছিল বিহারে, এবং ১৪৪০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মভূমিতেই তিনি দেহত্যাগ করেন। তবে কালনায় ধর্মপ্রচারে তিনি বহুদিন কাটান। কালনা কোর্টের কাছাকাছি পল্লীতেই সম্ভবত তাঁর আস্তানা ও খানকা ছিল।[২৪] অন্যদিকে যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী আর একজন বদর পীরের উল্লেখ

করেছেন, তিনি বদরশাহ আউলিয়া। তাঁকে নাকি মসজিদ নির্মাণের স্থানটি দান করেন বর্ধমান রাজ কীর্তিসিংহের দেওয়ান মানিকচাঁদ। তাঁর দেওয়া স্থানে সেই মসজিদটি বদরশাহ কর্তৃক নির্মিত হওয়ার জন্য মসজিদটি বদরশাহের মসজিদ নামে প্রসিদ্ধ। এই মসজিদের অভ্যন্তরে তাঁরই সমাধি রয়েছে।[২৫]

এই বদর পীরের স্মৃতি-সমাধি একমাত্র অম্বিকা কালনা বা দাঁইহাটেই নয়, বৃহৎ বঙ্গের বিভিন্ন স্থানেই প্রতিষ্ঠিত। বর্ধমান জেলার জৌগ্রামের চাষাপাড়ায়ও রয়েছে তাঁর সমাধি। কুমুদনাথ মল্লিক বলেছেন যে নদীয়া জেলার মুসলমানগণ সাতপীর, পাঁচপীর, পীর বদর প্রভৃতি মহাপুরুষগণের পূজা করে থাকেন।[২৬] তাছাড়া, বদর মাঝিমাল্লাদের পীররূপে পরিগণিত হন। সুতরাং বৃহৎ বঙ্গে পীর বদরের যে সব মাজার রয়েছে, সেগুলি আসলে তাঁর মাজারেরই স্মৃতি প্রতীক বা নজরগাহ। আমরা জানি, কীর্তিচন্দ্রের (১৭০৪—১৭৪০ খ্রী:) পূর্ব থেকেই দাঁইহাট একটি প্রসিদ্ধ নদীগঞ্জে পরিণত হয়েছিল। সেই সূত্রে বলা যায়, ঐ স্থানে মাঝিমাল্লাদের সূত্রে বদর পীরের স্মৃতিপূজার প্রচলন হয়। সুতরাং দাঁইহাটের সমাধিটি তাঁরই মাজারের স্মৃতি প্রতীক বা নজরগাহ। সেক্ষেত্রে দেওয়ান মানিকচাঁদ জড়িয়ে যান দাঁইহাটে কীর্তিচন্দ্রের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধির সূত্রে। আর এই জড়িয়ে যাওয়া মূলতঃ জনশ্রুতি নির্ভর।

অন্যদিকে, রাজা চিত্রসেন রায় ও মহারাজ ত্রিলোক চাঁদের আমলে ছোট দেউড়ি অঞ্চলে বসতি শুরু হয় এবং রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ঐ অঞ্চলে একটি নদীগঞ্জ গড়ে উঠেছিল, যা এখনও 'পুরাতন হাট' নামটির মধ্যে তার স্মৃতিকে ধরে রেখেছে। আর ঐ নদীগঞ্জটি আরও জমকালো হয়ে উঠেছিল উনিশ শতকের সূচনাতেই প্রতিষ্ঠিত নীলকুঠি (বর্তমানে যা মহকুমা শাসকের ডাক-বাংলো)-কে কেন্দ্র করে। আর সেইগঞ্জে মাঝিমাল্লাদের ভিড়কে কল্পনা করা যায়। আর সেই সূত্রেই অম্বিকা কালনায় বদরপীরের নজরগাহের প্রতিষ্ঠা ও তাঁর পূজার প্রচলন হয়, এবং তা সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেই হয়েছিল বলে অনুমান করা যায়।

এখনও ফাল্গুন মাসে চাঁদ ওঠার পরে প্রথম মঙ্গলবারে আশে পাশের হিন্দুরাও পালনি করতে যায়। বিশেষতঃ গরুর মঙ্গলার্থে পূজা দেয়। গরুর দুধ নিবেদন করে। পূজা হয় প্রতি শুক্রবারেও। এইভাবেই অম্বিকা কালনার বুকে প্রবাহিত হয়ে চলে ঐস্লামিক সংস্কৃতি।

তথ্যপঞ্জী

১। The Antiquities of Kalna: Bengal Past & Present, Vol. 14, Jan—June, 1917.

২। কৌশিকী, জানুঃ ১৯৯৫, পৃঃ ১৭৭—৭৮

৩। বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর: স্বাধীন সুলতানদের আমল, শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়, ভারতী বুক স্টল, ২য় সং ১৯৬৬, পৃঃ —২৫৮

৪। তদেব, পৃঃ—২৬৩

৫। তদেব, পৃঃ—২৫৯

৬। Annual Report of the Archaeological Survey, Bengal Circle, 1903—4, P. 4

৭। বাঙ্গালার ইতিহাস (২য় খণ্ড), রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নবভারত পাবলিশার্স, পুনঃমুদ্রণ সং ১৯৭৪, পৃঃ ২১৭—১৮ / Journal of the Asiatic Society of Bengal, old Series, Vol. XLI. 1872, Pt.1, P. 332

৮। বর্ধমান পরিচিতি, শ্রীঅনুকূল চন্দ্র সেন ও শ্রীনারায়ণ চন্দ্র চৌধুরী, বুক সিণ্ডিকেট, ১ম প্রকাশ ১৩৭৩, পৃঃ ৩০৯-১০

৯। বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর: স্বাধীন সুলতানদের আমল, শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়, ভারতী বুক স্টল, ২য় সং ১৯৬৬, পৃঃ ৩৮৪-৮৫

১০। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (১ম), বিনয় ঘোষ, প্রকাশ ভবন, ৩য় মুদ্রণ ১৩৯৫, পৃঃ—১৩৩

১১। তদেব, পৃঃ—১৩২

১২। Annual Report of the Archaeological Survey, Bengal Circle, 1903—4, P. 4

১৩। বর্ধমান: ইতিহাস ও সংস্কৃতি (৩য় খণ্ড), যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, পুস্তক বিপনি, ১ম প্রকাশ ১৯৯৪, পৃঃ—১২৪

১৪। তদেব, পৃঃ—১২৫

১৫। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (১ম), বিনয় ঘোষ, প্রকাশ ভবন, ৩য় মুদ্রণ ১৩৯৫, পৃঃ—১৩২

১৬। বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর: স্বাধীন সুলতানদের আমল, শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায়, ভারতী বুক স্টল, ২য় সং ১৯৬৬, পৃঃ—২১৪
১৭। কৌশিকী, শারদীয় ১৩৯৩, পৃঃ—৪১
১৮। তদেব, পৃঃ—৪০
১৯। তদেব, পৃঃ—৪২
২০। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (১ম খণ্ড), বিনয় ঘোষ, প্রকাশ ভবন, ৩য় মুদ্রণ ১৩৯৫, পৃঃ—১৩৩
২১। বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর: স্বাধীন সুলতানদের আমল, শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায়, ভারতী বুক স্টল, ২য় সং ১৯৬৬, পৃঃ ৪৬১—৬২
২২। তদেব, পৃঃ—২৫৮
২৩। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (৩য় খণ্ড। ১ম পর্ব), ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ন বুক, ২য় সং ১৯৮০, পৃঃ—৭০৩
২৪। কৌশিকী, জানুয়ারী ১৯৯৫, পৃঃ—১৭৯
২৫। তদেব, শারদীয় ১৩৯৫, পৃঃ—১৮
২৬। নদীয়া-কাহিনী, কুমুদনাথ মল্লিক, সম্পাঃ—মোহিত রায়, পুস্তক বিপনী, ৩য় সং ১৯৮৬, পৃঃ—১৭৪

বৈষ্ণব-সংস্কৃতি

কাটোয়ায় চৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণ। সেই সন্ন্যাস গ্রহণের দৃশ্য বাংলার সর্বাঙ্গে মাখিয়ে দিয়েছিল বিশেষ বৈষ্ণবীয় ভাব-চন্দন। এতে নবদ্বীপ কেন্দ্রিক বৈষ্ণব পরিমণ্ডল গড়ে উঠল। শুরু হলো বৈষ্ণব সংস্কৃতির চর্চা ও চর্যা। কালনা মহকুমার মধ্যে কালনা, বাঘনাপাড়া, প্যারীগঞ্জ (পিয়ারীনগর), দেনুড়, চাঁপাহাটি, বিদ্যানগর প্রভৃতি স্থানে বৈষ্ণব পাট গড়ে উঠল। এর মধ্যে শহর কালনায় ৪টি—গৌরীদাসের পাট, সূর্যদাসের পাট, পরমানন্দ গুপ্তের পাট, এবং নামব্রহ্মের পাট। এই পাটগুলির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে কালনার সংস্কৃতির ইতিহাসে।

গৌরীদাসের পাট ঃ মহাপ্রভু বাড়ি ঃ

গৌরীদাসের পৈতৃক নিবাস শালিগ্রাম। পিতা কংসারি মিশ্র, মাতা কমলা। তিনি তাঁর অগ্রজ সূর্যদাসের অনুমতি নিয়ে অম্বিকা কালনায় তাঁর পাট স্থাপন করেন। তাঁর জীবন-কথা ভক্তিরত্নাকর, অদ্বৈত প্রকাশ, পদ-কল্পতরু, গৌরপদ তরঙ্গিনী, বাসু ঘোষের পদাবলী প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে জানা যায়। কিন্তু ঐসব গ্রন্থের মধ্যে এত অতিরঞ্জিত কাহিনী ও অসঙ্গতি রয়েছে যে তা সর্বক্ষেত্রে দ্বিধাহীন চিত্তে গ্রহণ করা যায় না। তাই বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে সংস্কৃতি ও প্রত্নতত্ত্বের প্রকৃত ইতিবৃত্তকে ধরার চেষ্টা করতে হবে।

কবি কর্ণপুরের 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'র রচনাকাল কেউ বলছেন ১৫৬৭ খ্রীঃ, কেউ বলছেন ১৫৫৪ খ্রীঃ, আবার কেউ বলছেন ১৫৪৭ খ্রীঃ। ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্য রচনাকালকে ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দ বলে সনাক্ত করেছেন।[১] শ্রীহরিদাস দাস বলেছেন যে কবি কর্ণপুরের জন্মকাল ১৫২৪ খ্রীঃ। ১৪৯৪ শকে ইনি 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটক সংস্কৃত-ভাষায় রচনা করেন। তার চার বৎসর পরে 'শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা' রচনা করেন।[২] অর্থাৎ তিনি তা রচনা করেন ১৪৯৮ (১৫৭৬ খ্রীঃ) শকে। সুতরাং এটা নিশ্চিত যে চৈতন্যের অন্তর্ধানের বেশ কিছু পরেই রচিত হয়েছিল। আর ঐ গ্রন্থেই গৌরীদাসকে

প্রথম 'সুবলসখা' নামে চিহ্নিত করা হয়। তা থেকে পরবর্তীকালের বিভিন্ন গ্রন্থে গৌরীদাসকে চৈতন্যের বাল্য সঙ্গী বলা হয়েছে। কিন্তু 'গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা'র সমকালে বা কিছু পূর্বেই রচিত বৃন্দবনদাসের 'চৈতন্যভাগবতে'র মতো প্রামাণ্য গ্রন্থে গৌরীদাস যে চৈতন্যের বাল্য সঙ্গী ছিলেন, এমন কথা বলা হচ্ছে না। অন্য প্রামাণ্য গ্রন্থ কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে'ও নয়। তাছাড়া, সুবলসখা সম্বন্ধে অনন্ত সংহিতা, গৌরগণোদ্দেশ, চৈতন্য-সঙ্গীতা, পাটপর্যটন ও বৈষ্ণবাচার দর্পণাদি গ্রন্থে এ সম্বন্ধে মতানৈক্য আছে। শেষোক্ত গ্রন্থটিতে হলায়ুধ ঠাকুরকে সুবলসখা নামে চিহ্নিত করা হয়েছে।[৩] সুতরাং গৌরীদাস যে চৈতন্যের বাল্যলীলার সঙ্গী ছিলেন তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। আসলে কবি কর্ণপুর তাঁর গ্রন্থে দ্বাপরের বৃন্দাবনের নরনারীর সঙ্গে চৈতন্য-সমসাময়িক ও চৈতন্য ভক্তদের অবতার চক্রের মাধ্যমে মিলাতে গিয়ে কষ্ট কল্পনার আশ্রয় নিয়েছিলেন বলেই বাংলার বৈষ্ণব সমাজে বিশেষভাবে প্রচারিত হলেও কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রামাণ্যতার অভাবহেতু চৈতন্যচরিতামৃতে তাঁর গ্রন্থটির নামও উল্লেখ করেন নি। তাছাড়া, গৌরীদাস যদি গৌরাঙ্গের বাল্যলীলার সঙ্গী হতেন তবে কৃষ্ণদাস কবিরাজ যেখানে স্কন্ধশাখা বর্ণনের মধ্যে খোলাবেচা শ্রীধরকেও চৈতন্য শাখার সাথে যুক্ত করেছেন, সেখানে গৌরীদাসকে নিত্যানন্দ শাখার সাথে যুক্ত করেছেন। আসলে গৌরীদাস যে নিত্যানন্দেরই ঘনিষ্ট ছিলেন তা বৃন্দাবন দাস সেখানেই ইঙ্গিত করেছেন যেখানে বলেছেন 'গৌরীদাস পণ্ডিত-পরম ভাগ্যবান্। কায়-মনোবাক্যে নিত্যানন্দ যাঁর প্রাণ॥'[৪] অন্যদিকে কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর 'শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে'র আদিলীলার ১১ পরিচ্ছেদে গৌরীদাসের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন—

> শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের প্রেমোদ্দণ্ড ভক্তি।
> কৃষ্ণপ্রেম দিতে নিতে ধরে মহাশক্তি॥
> নিত্যানন্দে সমর্পিল জাতিকুল পাঁতি।
> শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ করি প্রাণপতি॥

এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে গৌরীদাস চৈতন্য এবং নিত্যানন্দকে প্রাণপতি করে নিত্যানন্দকে 'জাতিকুল পাঁতি' সমর্পণ করছেন, অর্থাৎ নিত্যানন্দের কাছে দীক্ষিত হয়েছেন। এখন প্রশ্ন, সেই দীক্ষা গ্রহণের সময়টি কখন? আমরা জানি, ১৫০৮ খ্রীষ্টাব্দে চৈতন্যের গয়ায় গমন। আর এই সময়েই নবদ্বীপে

নিত্যানন্দের আগমন। ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দের মাঘ মাসে কাটোয়ায় চৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণ, এবং ফাল্গুনে চৈতন্যের নীলাচল গমন। সুতরাং ঐ সময়ের মধ্যে গৌরীদাসকে নিত্যানন্দের দীক্ষাদানের প্রশ্ন ওঠে না। কারণ, ঐ সময়ের মধ্যে চৈতন্য-পরিকরদের মধ্যে কেউ যে দীক্ষা দিচ্ছেন, তার কোন প্রমাণ নেই। বরং বলা যায়, ঐ সময়ের মধ্যে চৈতন্য-বলয়ে অবস্থিত কোন ভক্তেরই দীক্ষা-দানের দুঃসাহস হয়নি।

বৃন্দাবন দাসের 'শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত' এর অন্ত্যলীলার ৫ম পরিচ্ছেদে থেকে জানা যায়, চৈতন্য তাঁর আরব্ধ কর্ম সম্পূর্ণ করার জন্য নিত্যানন্দকে দেশে পাঠিয়ে দেন। আর সেই সময়টি হচ্ছে চৈতন্যের দাক্ষিণাত্য থেকে প্রত্যাবর্তনের পরে, অর্থাৎ ১৫১১ খ্রীষ্টাব্দে। সুতরাং এই সময়ের পরেই গৌরীদাস দীক্ষা গ্রহণ করতে পারেন।

নীলাচলে গমনের পর চৈতন্য আর একটিবার মাত্র বাংলায় ফিরে এসেছিলেন। সেই সময়টি ১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দ। এই সময় তিনি শান্তিপুরে আসেন মা এবং অদ্বৈতাদি ভক্তদের সাথে মিলিত হওয়ার বাসনায়। আর এই শান্তিপুরে আসার পথে তিনি গৌরীদাসের সাথে মিলিত হতে পারেন। এবার গৌরীদাসের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গ। তাঁর বিগ্রহের প্রথম উল্লেখ আছে মুরারী গুপ্তের কড়চায়। কিন্তু ঐ গ্রন্থটি নির্ভরযোগ্য নয়। কারণ, ঐ কড়চায় যে কাব্য রচনাকাল রয়েছে তা ১৫০৩ বা ১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দ। কিন্তু কাব্যটিতে চৈতন্যের তিরোভাবের এবং অন্ত্যলীলার বর্ণনা থাকায় শ্রীহরিদাস দাস সিদ্ধান্ত করেছেন যে গ্রন্থটি ১৫৩৪ থেকে ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত হয়েছিল। তিনি আরও বলেছেন যে কেহ কেহ মনে করেন ৪।১৬ সর্গের পরের অংশগুলি পরবর্তী কালের সংযোজন হতে পারে।[৫] সুতরাং এমন একটি গ্রন্থকে প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে স্বীকার করা যায় না।

ভক্তি রত্নাকরের (৭।৩৪৬) মতে মহাপ্রভুর আজ্ঞায় গৌরীদাস নবদ্বীপ থেকে নিমবৃক্ষ এনে গৌর নিতাই-এর বিগ্রহ নির্মাণ করেন। এই আজ্ঞাদানের সমর্থন রয়েছে অদ্বৈত প্রকাশ, প্রেমবিলাস, অভিরাম লীলামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে। সেই মূর্তি যে চৈতন্য সাক্ষাৎ করেছিলেন তার কথা আছে ঐ সমস্ত গ্রন্থ ছাড়া বৃন্দাবন দাসের নামে প্রচলিত বৈষ্ণব বন্দনাতেও। এসব থেকে ডঃ রবীন্দ্রনাথ মাইতি বলেন যে এসব বিবরণ সত্য হলে বলতে হয় যে গৌরীদাসই সর্বপ্রথম

গৌরাঙ্গ বিগ্রহের সেবাপূজার প্রবর্তন করেন।[৬] এখন দেখতে হবে এসব বিবরণ কতদূর সত্য ?

ডঃ রবীন্দ্রনাথ মাইতি বলেছেন যে গৌরীদাস কর্তৃক গৌরাঙ্গ বিগ্রহ সেবার কারণ সম্পর্কে গ্রন্থকারগণ সকলে একমত নন। তিনি এও বলেছেন যে 'প্রেমবিলাসে'র প্রত্যেক ঘটনাকে আবার প্রামাণিক বলে গ্রহণ করা চলে না। তিনি অদ্বৈত প্রকাশের বর্ণনাকে 'সন্দিগ্ধ' বলেছেন। 'চৈতন্য সংগীতে'ও এরূপ ঘটনার উল্লেখ আছে। কিন্তু তিনি বলেছেন যে ঐ গ্রন্থের বর্ণনার অগ্র-পশ্চাৎ অংশগুলি পাঠ করলে তা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় না।[৭] তাছাড়া ঐসব গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে পরস্পর বিরুদ্ধতা, সন্দিগ্ধতা ও অতিরঞ্জনতা। তাই ঐসব গ্রন্থের উপর পরিপূর্ণ নির্ভর করে কোন সিদ্ধান্তে আসা যায় না। এক্ষেত্রে বিচার বিশ্লেষণের প্রয়োজন।

ডঃ সুকুমার সেন চৈতন্য ভাগবতের প্রমাণ বলে বলেছেন যে চৈতন্য নিজে সর্বদা দৈন্যভাবে থাকতেন। তাঁকে দেবতার সম্মান দিতে গেলে অত্যন্ত বিরক্ত হতেন। কিন্তু প্রিয়জনদের সর্বদা পেরে উঠতেন না। তাঁর একজন পরম প্রিয়জন ও অত্যন্ত মান্য স্বজন অদ্বৈত আচার্য তাঁকে নীলাচলে প্রথম প্রকাশ্যে ঈশ্বরের অবতার বলে ঘোষণা করেছিলেন। তাতে চৈতন্য বিরক্ত হয়েছিলেন।[৮] ডঃ সুকুমার সেন বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যমঙ্গল রচনার প্রসঙ্গে বলেছেন যে চৈতন্যের বর্তমান কালে কোন ভক্ত, বিশেষ করে নিত্যানন্দের অনুচর, এ কাজে হাত দিতে পারতেন না চৈতন্যের তীব্র বিরক্তির ভয়ে।[৯] অন্যদিকে কৃষ্ণ-দাসের শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (মধ্য/৩) দেখা যায়, তিনদিন রাঢ়দেশ ভ্রমণকালে তিনি অদ্বৈতের গৃহে ছিলেন। সেখান থেকে নীলাচলে ফেরার সময় তিনি ভক্তদের উদ্দেশ্যে বলেন—

ঘরে গিয়া কর সবে কৃষ্ণ সংকীর্তন।
পুনরপি আমা সঙ্গে হইবে মিলন ॥[১০]

কৃষ্ণদাসের গ্রন্থের অন্ত্যলীলার ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে দেখা যায়, চৈতন্য রঘুনাথ দাসকে গোবর্দ্ধন শিলা এবং গুঞ্জামালা দিচ্ছেন। ঐ গ্রন্থেরই অন্ত্যলীলার দ্বাদশ পরিচ্ছেদে দেখা যায়, জগদানন্দ মারফত চৈতন্য শচীমাতাকে জগন্নাথের বস্ত্র-প্রসাদ পাঠিয়েছিলেন। ঐ গ্রন্থের অন্ত্যলীলারই ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে দেখা যায়, চৈতন্য রঘুনাথ ভট্টকে কণ্ঠমালা দান করে উপদেশ দিয়ে বলেছেন—

বৃদ্ধা মাতা পিতা যাই করহ সেবন।
বৈষ্ণব-পাশ ভাগবত কর অধ্যয়ন ॥

তিনি চৌদ্দ হাত জগন্নাথের তুলসীর মালা এবং ছুটা পান রঘুনাথ ভট্টকে দিচ্ছেন। সুতরাং এই গ্রন্থে দেখা যাচ্ছে যে তিনি অনেককেই অনেক বস্তু দান করছেন, এবং নির্দেশ দিচ্ছেন। কিন্তু তিনি কোথাও তাঁর বিগ্রহ নির্মাণ করে পূজা করার নির্দেশ দেন নি। আর এমন প্রমাণ বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবতেও নেই। যদি চৈতন্য কোন ভক্তকে বা তাঁর প্রিয়জনকে নিজের বিগ্রহ নির্মাণ করে পূজা করার নির্দেশ দিতেন, তবে তা কৃষ্ণদাস বা বৃন্দাবন দাসের অজ্ঞাত থাকত না। আর এইরকম ক্ষেত্রে চৈতন্যের আজ্ঞা—

নবদ্বীপ হইতে নিমবৃক্ষ আনাইবে।
মোর ভ্রাতাসহ মোরে নির্মাণ করিবে ॥[১১]

—ভক্তিরত্নাকরের এই উক্তিকে গ্রহণ করা যায় না।

চৈতন্য শেষ বারের মতো বাংলায় আসছেন ১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু তখনও পর্যন্ত নিত্যানন্দের ঈশ্বরত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় নি। সুতরাং যেখানে চৈতন্যকে সম্মান দিতে গেলে তিনি বিরক্ত হতেন, যেখানে তখনও নিত্যানন্দের ঈশ্বরত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় নি, সেখানে গৌর নিতাই-এর যুগল দেবতারূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা কল্পনা করা যায় না। সুতরাং সেক্ষেত্রে বৃন্দাবন দাসের নামে প্রচলিত 'বৈষ্ণব বন্দনা'তে লিখিত 'প্রভু বিদ্যমানে মূর্তি করিলা প্রকাশ' বা প্রেমবিলাসের ১২-শ বিলাসে লিখিত চৈতন্যের উক্তি: 'শুনিলাম দুই মূর্তি করিয়াছ প্রকাশন। সাক্ষাতে আনহ তারে করিব দর্শন ॥'—এমন সব উক্তি বা মত সত্য হতে পারে না।

ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যে চৈতন্যের জীবদ্দশাতেই তাঁর মূর্তি গড়িয়ে পূজার ব্যবস্থা করা হয়। নরহরি সরকার ও বংশীবদন চৈতন্যের মূর্তিস্থাপন করে পূজা করতেন। স্বপ্নাদেশের ফলে বংশীদাস কাষ্ঠের মূর্তি নিজে নির্মাণ করে পূজার ব্যবস্থা করেন। শুনা যায় রাজা প্রতাপরুদ্র নাকি চৈতন্যের সুবৃহৎ মূর্তি স্থাপন করেছিলেন। মুরারি গুপ্তের কড়চায় আছে যে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী চৈতন্যদেবের বিগ্রহ পূজা করতেন। অম্বিকা কালনায় গৌরীদাস পণ্ডিতও গৌর নিতাইয়ের বিগ্রহ স্থাপন করে আরাধনা করতেন।[১২] এখন দেখতে হবে, ঐ মূর্তিগুলি চৈতন্যের জীবদ্দশাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কিনা। এক্ষেত্রে

প্রথমেই ধরা যেতে পারে রাজা প্রতাপরুদ্রের প্রতিষ্ঠিত চৈতন্য বিগ্রহের কথা।

চৈতন্য চরিতামৃত থেকে জানা যায় যে বাসুদেব সার্বভৌম জনসমক্ষে প্রথম 'সচল জগন্নাথ' বলে ঘোষণা করেন। সেই থেকে চৈতন্য জনমানসে 'সচল জগন্নাথ' এবং দারু জগন্নাথ 'অচল জগন্নাথ' রূপে প্রতিষ্ঠিত হন। সেক্ষেত্রে রাজা প্রতাপরুদ্র দারু বিগ্রহ নির্মাণ করে 'সচল জগন্নাথ' শ্রীচৈতন্যকে যে 'অচল জগন্নাথে' পরিণত করবেন, তা কল্পনা করা যায় না।

এবার আসা যেতে পারে বিষ্ণুপ্রিয়ার চৈতন্য বিগ্রহের পূজার প্রসঙ্গে। এই বিগ্রহ পূজার সংবাদ পাওয়া যায় মুরারিগুপ্তের কড়চায়। কিন্তু পূর্বেই বলেছি, গ্রন্থটির সর্বাংশ নির্ভরযোগ্য নয়। সুতরাং এমন একটি গ্রন্থকে নির্ভর করে সিদ্ধান্তে আসা যায় না। তাছাড়া, বিষ্ণুপ্রিয়া কর্তৃক চৈতন্যের বিগ্রহ পূজা—এটি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই ঘটনা যদি চৈতন্যের জীবৎকালেই ঘটে থাকত, তবে সেই ঘটনার উল্লেখ অবশ্যই কৃষ্ণদাস এবং বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থে থাকত। এক্ষেত্রে ডঃ রবীন্দ্রনাথ মাইতির উক্তিটির মধ্যে রয়েছে পূর্ণ সত্যতা। তিনি বলেছেন যে মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর বংশীবদন তাঁর দ্বারা স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে গৌরাঙ্গ যে নিম্ববৃক্ষতলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই বৃক্ষের কাষ্ঠের দ্বারা মহাপ্রভুর দারুময় মূর্তি নির্মাণ করে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর মতানুসারে তার প্রতিষ্ঠা করেন। 'বংশীশিক্ষা' মতে মহাপ্রভু বিষ্ণুপ্রিয়া ও বংশীবদন উভয়কেই স্বপ্নাদেশ দান করলে প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৩]

নরহরি সরকারের চৈতন্যের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গে যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী বলেছেন যে চৈতন্যের তিরোধানের পর শ্রীখণ্ডবাসী ঠাকুর নরহরি সরকার শ্রীগৌরাঙ্গের একটি সুন্দর মূর্তি তৈরী করে গদাধরকে কাটোয়ায় প্রতিষ্ঠা করতে আদেশ দেন। পরবর্তীকালে যদুনন্দনের বংশধরগণ সেখানে নিত্যানন্দের বিগ্রহ স্থাপন করেন।[১৪] ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যে শ্রীখণ্ডে প্রতিষ্ঠিত গৌরাঙ্গ বিগ্রহের বামে বিষ্ণুপ্রিয়ার মূর্তি স্থাপিত দেখা যায়। শুনা যায়, রঘুনন্দনের পুত্র ঠাকুর কানাই ইহা স্থাপন করেছিলেন।[১৫] এ থেকে এটাই প্রমাণিত যে নরহরি সরকার চৈতন্যের অন্তর্ধানের পরেই মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

আসলে সচল জগন্নাথ শ্রীচৈতন্য 'অচল জগন্নাথে' লীন হয়ে যাওয়ার পূর্বে

চৈতন্যকে দারুবিগ্রহে পরিণত করার কথা কল্পনায় আসে নি চৈতন্যের বিরক্তির ভয়ে। তাছাড়া, দেহে থাকতে মূর্তি প্রতিষ্ঠা অশাস্ত্রীয়।

শ্রীচৈতন্যের দিব্য জীবনের প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা মাধব পট্টনায়ক চৈতন্যের অপ্রকটের প্রসঙ্গে বলেছেন যে রথযাত্রা উপস্থিত হোল। গৌড়ীয় ভক্তরা নীলাচলে রথযাত্রা দর্শনে এলেন। রথের উপব থেকে গজপতি প্রতাপরুদ্রদেব শ্রীচৈতন্যের দারুবিগ্রহে লীন হয়ে যাবার কথা ঘোষণা করলেন।[১৬] আর তার অব্যবহিত পর থেকেই শুরু হয়ে যায় চৈতন্যের দারু মূর্তি প্রতিষ্ঠা। আর সেই প্রতিষ্ঠা স্বপ্ন-তত্ত্বের মাধ্যমে। আসলে স্বপ্নাদেশে মূর্তি প্রতিষ্ঠা বাংলায় একটি রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আর এই স্বপ্নাদেশে মূর্তি প্রতিষ্ঠা গৌরীদাসের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এক্ষেত্রে 'পদ কল্পতরু'র একটি পদ উদ্ধার করা যায়। পদটিতে বলা হয়েছে—

একদিন রাত্রি শেষে দেখিলেন স্বপ্নাবেশে
মহাপ্রভু নিত্যানন্দ সনে।
কহে ওহে গৌরীদাস পুরিবে তোমার আশ
আমরা আসিব দুইজনে॥
···দোঁহে রব তোমার মন্দিরে।

এখানে এই স্বপ্নাদেশই গৌরীদাসের মূর্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অধিকতর গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। সুতরাং এটাই নিশ্চিত যে চৈতন্যের অন্তর্ধানের পরেই স্বপ্নতত্ত্বের মাধ্যমে গৌরীদাস গৌর-নিতাই-এর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এখন প্রশ্ন, সেই সময়টি কখন?

শ্রীসুকুমার সেন বলেছেন যে চৈতন্যের দেহত্যাগের পর নিত্যানন্দ আট দশ বৎসর ও অদ্বৈত আচার্য দশ বার বৎসর জীবিত ছিলেন। এর কিছুকাল আগেই শ্রীবাস ও গদাধর দেহত্যাগ করেছিলেন বলে মনে করা হয়।[১৭]

পূর্বেই বলেছি, দেহে থাকতে মূর্তি প্রতিষ্ঠা অশাস্ত্রীয়। সুতরাং নিত্যানন্দ দেহে থাকতেই পণ্ডিত গৌরীদাস যে নিত্যানন্দের মূর্তি গড়ে অশাস্ত্রীয় কর্ম করবেন তা কল্পনা করা যায় না। তাই বলা যায়, নিত্যানন্দের অপ্রকটের (১৫৪১-৪৩ খ্রীঃ) পরেই।

ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন যে বীরভদ্রকে অদ্বৈত ও নিত্যানন্দের ভক্তেরা চৈতন্যের অবতার বলে মনে করতেন। সুতরাং নিত্যানন্দের পুত্রলাভ ১৫৩৪

খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে হয় নি।[১৮] আর তা যদি হয় তবে গৌরীদাসের মূর্তি প্রতিষ্ঠাকালে বীরভদ্র ন্যূনতম ৮।১০ বৎসরের বালক মাত্র। জাহ্নবা তখনও বৈষ্ণব সমাজের নেতৃত্বে আসেন নি।

ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন যে চৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে অদ্বৈতপ্রভুর বয়স প্রায় পঞ্চাশ হয়েছিল।[১৯] আর তাই যদি হয় তবে তখন অদ্বৈত আচার্য অতিবৃদ্ধ।

চৈতন্য দক্ষিণ ভারত থেকে ফিরে আসছেন ১৫১১ খ্রীষ্টাব্দে। ঐ সময়ে বা দুই এক বৎসর পরে অদ্বৈত তাঁর পুত্র অচ্যুতানন্দকে নিয়ে নীলাচলে যাচ্ছেন। তখন অচ্যুতানন্দের বয়স মাত্র পঞ্চ বৎসর।[২০] আর তা যদি হয়, তবে গৌরীদাসের মূর্তি প্রতিষ্ঠাকালে অচ্যুতানন্দের বয়স ছিল মোটামুটি ৩৫ বৎসরের ঊর্ধ্বে। আর তখন তিনিই ছিলেন শান্তিপুরের অদ্বৈত-পাটের কর্তৃত্বে। তাই 'অদ্বৈত প্রকাশে'র বর্ণনায় বলা হয়েছে যে অদ্বৈত প্রভুর নির্দেশানুসারে অচ্যুতানন্দ অম্বিকায় মহাসমারোহে দুই মূর্তি স্থাপন করেছিলেন, অর্থাৎ অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করেছিলেন। তাই এখনও পূর্ব ঐতিহ্যানুসারেই গৌরীদাসের পাট বাড়ির বাৎসরিক উৎসবে শান্তিপুরের (বাঁশবনিয়া পাড়া) অদ্বৈতবংশীয় কেউ না কেউ অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করেন।

শ্রীঅজিতকুমার গোস্বামী বলেন যে গৌরীদাস কিছুকাল অম্বিকায় বিগ্রহ সেবা করে বিগ্রহ সেবার ভার তাঁর শিষ্য হৃদয় চৈতন্যকে দিয়ে তিনি বৃন্দাবনে গমন করেন। ১৪৮১ শকাব্দে (১৫৫৯ খ্রীঃ) শ্রাবণী শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে তাঁর তিরোধান ঘটে। তাঁর নিজস্ব 'ধীর সমীর কুঞ্জে' তাঁর শ্রী অঙ্গকে সমাহিত করা হয়।[২১]

গৌরীদাসের সঙ্গে কাজীর নাকি একবার বাদ হয়েছিল। অদ্বৈত প্রকাশে বলা হয়েছে—

> কাজি সনে বাদ করে প্রেম উন্মাদে।
> সাতদিন গৌরীদাস ছিলা গঙ্গাহ্রদে ॥[২২]

জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে'ও আছে যে গৌরীদাস পণ্ডিত মুসলমানের ভয়ে সাতদিন জলাশয়ে লুকিয়ে ছিলেন। আর তা যদি হয় তবে এটি একটি কারণ হতে পারে গৌরীদাসের অম্বিকা ত্যাগের।

শাসপুরের মসজিদের প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায়, ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে উলুগ

মসনদ খান মসজিদ নির্মাণ করছেন। গৌরীদাস তার ৮।১০ বছর পরে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। আবার ১৫৫৯ খ্রীষ্টাব্দে সরওয়ার খান আর একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এই ১৫৩৩ থেকে ১৫৫৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে হোসেনশাহী বংশের অবসান হয়েছে। সৃষ্টি হয়েছে রাজনৈতিক অস্থিরতা। সেক্ষেত্রে গৌবীদাসের সাথে বাদ সৃষ্টি হতে পারে। সেই কারণে তাঁর হয়তো অম্বিকা ত্যাগ। কিন্তু এক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন থেকে যায়, তিনি যদি ভয়ের কারণে অম্বিকা ত্যাগ করেন তবে তাঁর শিষ্য হৃদয়ানন্দের সেই বিগ্রহ নিয়ে অম্বিকা কালনায় থাকা সম্ভব হচ্ছে কি করে? তাই গৌরীদাসের 'কাজী সনে বাদ' এবং সেই সূত্রে অম্বিকা ত্যাগের ইতিহাসকে ঠিক স্বীকার করে নেওয়া যায় না।

শাস্ত্রানুসরণে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন—

সাধুসঙ্গ নামকীর্তন ভাগবত শ্রবণ।
মথুরাবাস শ্রীমূর্তি শ্রদ্ধায় সেবন॥
সকল সাধন শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ। (মধ্য/২২)[২৩]

এখানে দেখা যাচ্ছে, সাধনার একটি শ্রেষ্ঠ অঙ্গ মথুরাবাস। এই মথুবাবাসের সাথে যুক্ত হয়েছে বৃন্দাবনবাস। এই বৃন্দাবন মথুবাবাসের মতো সাধনার অঙ্গকে গৌরীদাসের সমকালীন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তদের অনেকেই বরণ করে নিয়ে মথুরা বৃন্দাবনে বাস করেছেন। আর সেই সূত্রেই হয়তো গৌবীদাসের অম্বিকা ত্যাগ, এবং বৃন্দাবনবাস।

শ্রীঅজিতকুমার গোস্বামী লিখেছেন যে পাছে কোনও ভক্ত হৃদয়ে ধারণ করে প্রভুকে নিয়ে যান, এই ভয়ে গৌরীদাস আর দর্শন দিতে রাজি হলেন না। কিন্তু শচীমাতার নির্দেশে তিনি ঝাঁকি দর্শনের ব্যবস্থা করলেন।[২৪]

অদ্বৈত প্রকাশাদি গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে ঐ গৌর-নিতাই-এর মূর্তিদ্বয় ছিল গৌরীদাসের কাছে জীবিতসত্তা, তাঁর প্রাণস্বরূপ, এবং পরম পাওয়া। কিন্তু যাঁরা ছিলেন জীবিতসত্তা, তাঁর প্রাণ, যাঁরা পলায়ণ করতে পারেন—এই আশঙ্কায় ঝাঁকি দর্শনের ব্যবস্থা করলেন, তাঁদের ছেড়ে গৌরীদাসের বৃন্দাবনে বাস—এ কেমন যেন খট্‌কা এনে দেয়। যদি বাসের কথা না ধরে গৌরীদাসের তীর্থদর্শনের জন্য বৃন্দাবন যাত্রা, এবং তথায় দেহরক্ষা, সেই সূত্রে সমাধিকল্পে 'ধীর সমীরকুঞ্জ' নির্মাণ ধরা যায়, তবে সেক্ষেত্রেও সেই বিগ্রহদ্বয়কে ছেড়ে থাকার প্রশ্ন থাকে।

এখানে দুটি বস্তু সংরক্ষিত আছে। একটি 'প্রভুর শ্রী হস্তের অক্ষর গীতাখানি।' অন্যটি যে বৈঠা করে শ্রীচৈতন্য নৌকা চালিয়ে অম্বিকায় আসেন, সেই বৈঠাখানি। এই দুটির সম্বন্ধে নরহরি চক্রবর্তী ঠাকুরের শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকরে (৭/৩৩৫-৩৪১) বলা হয়েছে—

গঙ্গাপার হৈলু—নৌকা বাহিরে বৈঠায়।
এই লেহ বৈঠা—এবে দিলাম তোমায়॥

* * *

পণ্ডিতে লইয়া প্রভু গেলা নদীয়ায়।
করিলেন মগ্ন অতি অদ্ভুত লীলায়॥
কে বুঝিতে পারে গৌরচন্দ্রের চরিত।
পণ্ডিতে দিলেন আপনার গীতামৃত॥
কিছুদিনে পণ্ডিত আসিয়া অম্বিকায়।
প্রভুদত্ত গীতা পাঠ করেন সদায়॥

* * *

প্রভুদত্ত গীতা, বৈঠা প্রভু-সন্নিধানে।
অদ্যাপিহ অম্বিকায় দেখে ভাগ্যবানে॥

পূর্বেই বলেছি, নীলাচলে গমনের পর চৈতন্য আর একটিবার মাত্র বাংলায় ফিরে এসেছিলেন। সেই সময়টি ১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দ। এই সময় তিনি শান্তিপুরে আসেন মা এবং অদ্বৈতাদি ভক্তদের সাথে মিলিত হওয়ার বাসনায়। আর এই শান্তিপুরে আসার পথে তিনি গৌরীদাসের সাথে মিলিত হতে পারেন। তবে এমন উল্লেখযোগ্য ঘটনা সম্বন্ধে বৃন্দাবনদাস এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ নীরব থেকেছেন। তাছাড়া, সংরক্ষিত বৈঠাটি নৌবাহনের উপযুক্ত বলে মনে হয় না। অন্যদিকে, ভক্তি রত্নাকর থেকেই জানা যায় যে গীতাটি তিনি নদীয়ায় নিয়ে গিয়ে দিয়েছিলেন, এবং গৌরীদাস তা নিয়ে অম্বিকায় ফিরে আসেন।

এরপর তেঁতুলতলা, যেখানে একটি ফলকে লেখা আছে 'শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বিশ্রামস্থান আমলিতলা শ্রীগৌর ও গৌরীদাসের সম্মিলন স্থান' সেখানে রয়েছে চুণ সুরকি ইটের নির্মিত গৌরীদাসের ভজন-সিংহাসন, এবং চৈতন্যের পদচিহ্ন। কিন্তু কোন প্রামাণ্য গ্রন্থেই চৈতন্যের পদচিহ্নের উল্লেখ নেই। শ্রীহরিদাস দাসও তাঁর 'শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধান' গ্রন্থের 'প্রাচীন

স্মৃতিচিহ্নাবলি' অংশে (পৃঃ-১৯৮৩) বৈঠা ও গীতার উল্লেখ করলেও শ্রীচৈতন্যের পদচিহ্নের উল্লেখ করেন নি। এমনকি ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে দীনবন্ধু মিত্র যে 'সুরধুনী' কাব্য রচনা করেন তাতে 'তেঁতুলবৃক্ষে'র উল্লেখ থাকলেও[২৫] চৈতন্যের পদচিহ্নের উল্লেখ নেই। এসব থেকে অনুমান করে নিতে কষ্ট হয় না যে পাটের গৌরব-বৃদ্ধির জন্যই ঐগুলি পরবর্তীকালে সংযোজিত হয়েছিল।

ঠাকুর বাড়ির একজন সেবাইত শ্রীগোবিন্দলাল গোস্বামী এক সাক্ষাৎকারে বর্তমান লেখককে বলেছিলেন যে বর্তমান মন্দিরের গায়ে যে উঁচু ঢিবি রয়েছে, সেখানেই ছিল প্রাচীন মন্দির। তা জীর্ণতা প্রাপ্ত হলে বর্তমান মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

মন্দিরটি দক্ষিণমুখী দালানরীতির স্থাপত্য। বিভিন্ন সময়ের দানে মন্দিরটি সমৃদ্ধ হয়েছে। এই মন্দিরে রয়েছে নাট-মন্দির, এবং রাসমঞ্চ। দালানরীতির এই রাসমঞ্চটি রয়েছে সিংহদরজার উপর। এখানেও রথের টান হতো। শ্রীহরিদাস দাস ১১৬৫ সালে নির্মিত ৪ হাত উচ্চ পিতলের রথ দেখেছিলেন।[২৬]

মূল মন্দিরের পাঁচটি প্রকোষ্ঠ। পশ্চিম দিক থেকে পর্যায়ক্রমে ১ম প্রকোষ্ঠে রয়েছেন গৌরীদাস পণ্ডিত, রাধাগোবিন্দ, গোপাল, মহাদেব, লক্ষ্মীনারায়ণ ও রাম লক্ষ্মণ। ২য় প্রকোষ্ঠে রাধাগোবিন্দ, দুই সখী ও গরুড়। ৩য় প্রকোষ্ঠে রয়েছেন গৌর নিতাই। ৪র্থ প্রকোষ্ঠে রয়েছেন জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা। ৫ম প্রকোষ্ঠে রয়েছেন বলরাম, রাম ও সীতা। ঐ মূর্তিগুলির মধ্যে সবই যে গৌরীদাস প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তা নয়। তাছাড়া গৌরীদাসের মূর্তি, মহাদেব, রামলক্ষ্মণ, বলরাম, রাম ও সীতা—এসব মূর্তি অবশ্যই পরবর্তীকালের সংযোজন। জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা আসছেন চৈতন্যের সাথে নীলাচলের সম্পর্ক সূত্রেই। আর ঐ মূর্তি সমাবেশের ক্ষেত্রে 'শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে'রও প্রভাব স্পষ্ট। 'শ্রীশ্রীগৌর-গৌরীদাস-লীলামৃত' গ্রন্থ থেকে জানা যায়, গিরিধর নামক পুকুর থেকে পুকুর সংস্কারকালে প্রাপ্ত দু'টি মহাদেব মূর্তিকে মন্দিরে স্থান দেওয়া হয়েছে, এবং বৈষ্ণবায়ন করার উদ্দেশ্যে নাম দেওয়া হয়েছে শ্রীযাদব রায় ও শ্রীমাধব রায়। তবে তাঁদের স্বাতন্ত্র্যকে একেবারে লুপ্ত করা হয় নি। শ্রীগোবিন্দলাল গোস্বামীর কাছ থেকে জানা যায় যে চড়কের সময় যাদব রায়কে নিয়ে যাওয়া হয় চড়ক তলায়, আর মাধব রায়কে মীরের বাগানে।

ঠাকুরের সেবার জন্য বর্ধমানের রাজা এই পাটে কিছু জমি দান করেন, এবং ১০ টাকা মাসোহারা দেন।

মন্দিরে নিত্য ভোগদানের ব্যবস্থা আছে। তিন ভাজা, তিন তরকারী, ডাল, পায়েস ও টক। কার্তিক মাস ভোর অঙ্কুরিত স্বর্ণমুগ দিয়ে শীতল দেওয়া হয়। মধ্যাহ্নে কাঁচাকলা ও সোনামুগের তরকারী দিয়ে ভোগ নিবেদন করা হয়।

বাৎসরিক উৎসব চলে মাঘী শুক্লা একাদশী থেকে মাঘী পূর্ণিমা পর্যন্ত। এই উৎসব মূলতঃ নিত্যানন্দের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে সূচিত হয়েছিল। এই তিথিতেই গৌর-নিতাই-এর মূর্তি প্রতিষ্ঠা এবং তাঁদের অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছিল। আর তার স্মারকরূপে চলে আসছে এই উৎসব। ঐ সময় তিনদিন নাম চলে। পূর্ণিমার দিন কুঞ্জভাঙ্গা হয়ে গেলে নগর সংকীর্তনে বার হওয়া হয়। সামনে থাকে খোস্তাখুন্তি। এর ব্যবহারের ক্ষেত্রে বীরভদ্রীয় প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

শ্রীজগদ্বন্ধু ভদ্র তাঁর 'গৌরপদতরঙ্গিনী'তে এই পাটের সেবাইতগণকে গৌরীদাসের বংশধর বলে সনাক্ত করেছেন। অন্যদিকে শ্রীঅমূল্যধন রায় ভট্ট বলেছেন যে গৌরীদাস বা হৃদয় চৈতন্যের বংশ নাই। বর্তমান সেবাইতগণ গৌরীদাস পণ্ডিতের বা হৃদয় চৈতন্যের শিষ্য-শাখা বংশ।[২৭] এখন দেখতে হবে, এই মত কতটা যুক্তিযুক্ত।

শ্রীহরিদাস দাস তাঁর গ্রন্থে গৌরীদাসের যে বংশলতিকা উদ্ধৃত করেছেন তাতে দেখা যাচ্ছে গৌরীদাসের দুই পুত্র—বলরাম ও রঘুনাথ।[২৮] কিন্তু গৌরীদাস তাঁর দুই পুত্রের মধ্যে কাউকেই তাঁর অম্বিকা পাটের সেবক করে আনছেন না। সেবাধিকার দিচ্ছেন তাঁরই শিষ্য গদাধর পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্র, শ্রীবাণীনাথের পুত্র হৃদয় চৈতন্যকে। 'গৌরপদ তরঙ্গিনী'র মতে ইনি ছিলেন গৌরীদাস পণ্ডিতের নাতি জামাই।[২৯] কিন্তু তিনিও অম্বিকা পাটের সেবক-রূপে তাঁর বংশধরদের কাউকে স্থাপন করছেন না। ভক্তি রত্নাকরের সাক্ষ্য (১৪।৯৭) থেকে জানা যাচ্ছে যে হৃদয়ানন্দের পর সেবার অধিকার পাচ্ছেন শ্রীগোপীরমণ ঠাকুর। সুতরাং হৃদয় চৈতন্যের বংশ না থাকার উক্তিকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সুতরাং শ্রীঅমূল্যধন রায় ভট্টের অনুসরণে বলা যায়, এই পাটের বর্তমান সেবকগণ যাঁরা আছেন, তাঁরা হয়তো গৌরীদাস পণ্ডিতের বা হৃদয় চৈতন্যের শিষ্য শাখা বংশ।

হৃদয়ানন্দের শিষ্য শ্যামানন্দ এই পাটের বৈষ্ণব সংস্কৃতির ধারাকে মেদিনীপুর ও উৎকলে বহন করে নিয়ে যান।

সূর্যদাসের পাট ঃ শ্যামসুন্দর বাড়ি

সূর্যদাস ছিলেন গৌরীদাস পণ্ডিতের অগ্রজ। তিনি রাজকর্মচারী ছিলেন। সেই সূত্রে তাঁর উপাধি ছিল সরখেল। ডঃ সুখময় মুখোপাধ্যায় বলেছেন যে দশজন অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে গঠিত দলের নায়কের উপাধি ছিল সর-ই-খেল।[৩০] তবে চৈতন্য চরিতামৃতে (মধ্য/৫ম) শিবানন্দের উদ্দেশ্যে যেখানে বলা হয়েছে—

ইঁহার ঘরের আয়-ব্যয় সব তোমার স্থানে।
সরখেল হৈঞা তুমি করহ সমাধানে॥

সেখানে 'সরখেল' কথাটির অর্থ আমরা 'হিসাব রক্ষক' ধরতে পারি। সেক্ষেত্রে হয়তো বলা যায়, সূর্যদাস গৌড়ের হিসাবরক্ষকের পদে নিযুক্ত ছিলেন। ইনিই নাকি তাঁর সেবিত শ্যামসুন্দরের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে নাকি যে বাড়িতে তাঁর প্রতিষ্ঠা করা হয় তাকে শ্যামসুন্দর বাড়ি বা সূর্যদাসের পাট বাড়ি বলা হয়। এটি এবং গৌরীদাসের পাট বাড়ি মহাপ্রভু পাড়ায় অবস্থিত।

সূর্যদাসের পাটে উড়িয়া কবি রাধাবল্লভ দাসের অনূদিত রঘুনাথ গোস্বামীর 'কুসুমাঞ্জলি'র একটি পুঁথি ছিল। সেইসূত্রে এবং 'চৈতন্য চকড়া' নামক উড়িয়া গ্রন্থে সূর্যদাসের উল্লেখ এবং পুঁথি অবস্থায় গ্রন্থটি উৎকলের রাজা প্রতাপরুদ্রের হস্তে সমর্পণ করার সূত্রে শ্রীবিনয় মুখোপাধ্যায় উড়িষ্যার রাজার সাথে এই পাটের যোগসূত্র আবিষ্কার করেছেন।[৩১] কিন্তু কোন প্রামাণ্য গ্রন্থ থেকে সেই যোগসূত্রকে আবিষ্কার করা যায় না।

এক্ষেত্রে প্রশ্ন থাকে, তবে কিভাবে এখানে উড়িয়া পুঁথি আসছে? এক্ষেত্রে বলা যায়, উড়িষ্যার সাথে কালনার যোগসূত্রটি স্থাপন করেছিলেন হৃদয় চৈতন্যের শিষ্য শ্যামানন্দ। তাঁর শিষ্য প্রশিষ্যরা কালনায় আসছেন তাঁদের পরম গুরু গৌরীদাসের পাট দর্শনে। আর এঁরাও যাচ্ছেন উড়িষ্যায়। সেই সূত্রে বা জগন্নাথদেবের দর্শনের জন্য উড়িষ্যায় গমন করার সূত্রে উড়িয়া পুঁথি আসছে। আর তা আসছে গ্রন্থটিতে সূর্যদাসের উল্লেখ থাকার জন্য, এবং তার জন্যই তা সূর্যদাসের পাট বাড়িতে সংরক্ষিত হয়েছে।

১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দে 'চৈতন্য চকড়া'র সমাপ্তিকাল এবং ঐ গ্রন্থে সূর্যদাসের উল্লেখ ধরে

গ্রন্থটির প্রাচীনতা ও প্রামাণিকতাকে স্বীকার করে নিয়ে শ্রী বিনয় মুখোপাধ্যায় ১৫১০-১১ খ্রীষ্টাব্দকেই সূর্যদাসের মূর্তি প্রতিষ্ঠার কালরূপে নিরূপণ করেছেন।[৩২] কিন্তু ওড়িয়া লিপিতত্ত্ববিদ বিষ্ণুপদ পাণ্ডা লিখেছেন যে 'চৈতন্য চকড়া' পুঁথিটির লেখক শ্রীগোবিন্দ দাস বাবাজী মহাপ্রভুর সমকালীন, কিন্তু সমস্ত লীলার প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা নন। অন্যান্যদের কাছ থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে লেখা। এই গ্রন্থটি উড়িষ্যায় প্রচারিত হয় নি। ডঃ বিষ্ণুপদ পাণ্ডা গ্রন্থটির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করেছেন। শ্রী চপলাকান্ত ভট্টাচার্য 'মহাপ্রভুর অপ্রকটের নতুন কাহিনী শ্রীচৈতন্য চকড়া' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে গ্রন্থটির সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।[৩৩] সুতরাং এমন এক অপ্রামাণ্য গ্রন্থের প্রমাণ বলে সূর্যদাসের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার কালকে ১৫১০-১১ খ্রীষ্টাব্দে নিয়ে যাওয়া যায় না। তাছাড়া, গৌরীদাসের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার কালকে যখন ১৫৪১-৪৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে নিয়ে যাওয়া যায় না, তখন সূর্যদাসের মূর্তি প্রতিষ্ঠার কালকে তো নয়ই। সূর্যদাস যদি কালনায় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে থাকেন, তবে তা গৌরীদাসের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার অনেক পরেই করে থাকবেন।

'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে বলা হয়েছে যে জাহ্নবা অম্বিকায় এসে 'নিত্যানন্দ চৈতন্যের করিলা দর্শন।' কিন্তু সেখানে ভক্তিরত্নাকরের লেখক গৌরীদাসের মূর্তিদ্বয়ের প্রসঙ্গেই উচ্ছ্বসিত, সূর্যদাসের প্রতিষ্ঠিত ঠাকুরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নীরব থাকছেন। তাই অম্বিকা কালনায় যে বিগ্রহ দর্শন, তা গৌরীদাসের মূর্তিদ্বয়েরই দর্শন বলা যায়।

শ্যামসুন্দর বাড়িতে একটি বাঁধানো গোলাকার ঘের, এবং ঘেরের মধ্যে একটি মড়া কুলগাছ রয়েছে। ঐ কুলগাছের তলায় নিত্যানন্দের বিবাহ কার্য সম্পন্ন হয়, এমন দাবি করা হয় মন্দিরের পক্ষ থেকে। সেখানে একটি শিল সংরক্ষিত রয়েছে, যা ছাতনাতলায় ব্যবহৃত বলে দাবি করা হয়। কিন্তু ভক্তিরত্নাকর এবং প্রেমবিলাস থেকে জানা যায়, সূর্যদাসের শালিগ্রামস্থ গৃহেই নিত্যানন্দের বিবাহানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছিল। পাত্রপক্ষ উঠেছিল বড়গাছিতে। তাই বলা যায়, অম্বিকা কালনায় নিত্যানন্দের বিবাহ বাসরের প্রশ্ন থাকতে পারে না। বলতে কি, এসব সংযোজিত হচ্ছে পাটের গৌরব বৃদ্ধির জন্য।

পাট নির্ণয় গ্রন্থে মহাপাট বর্ণনায় বোধখানা বা খানাতে সূর্যদাসের পাট বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।[৩৪]

শ্রীঅমূল্যধন রায় ভট্ট সূর্যদাসের পাট বাড়ির বংশ তালিকার অনুসরণে যে বংশ তালিকা উদ্ধৃত করেছেন তাতে দেখা যায়, সূর্য দাসের দুই কন্যা জাহ্নবা ও বসুধা, আর পুত্র চন্দ্রশেখর গোস্বামী।[৩৫] এই বংশ তালিকার শ্রী চন্দ্রশেখর গোস্বামী থেকে শ্রী বিনয়কৃষ্ণ গোস্বামী (বর্তমান) পর্যন্ত মোট ১০ পুরুষ। প্রতি পুরুষ ২৫ বা ৩০ বৎসর ধরলে ১০ পুরুষে হয় ২৫০ বা ৩০০ বৎসর। সুতরাং ২৫০ থেকে ৩০০ বৎসরের মাথায় অবস্থানরত এক পুরুষকে (চন্দ্রশেখর গোস্বামী) সূর্যদাসের সময়ে নিয়ে গিয়ে তাঁর পুত্ররূপে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে অসঙ্গতি থেকে যায়। তাই শ্রীহরিদাস দাস সূর্যদাসের যে বংশ তালিকা উদ্ধৃত করেছেন[৩৬] তাতে দেখা যায়, সূর্যদাসের দুই কন্যা বসুধা ও জাহ্নবা ছাড়া কোন পুত্রের অস্তিত্ব নেই। যদি থাকত তবে তিনি তা অবশ্যই উল্লেখ করতেন। শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় 'অদ্বৈত প্রকাশ' গ্রন্থটিকে জাল এবং অনেক পরবর্তী কালের রচনা বলেছেন।[৩৭] আর একটি অপ্রামাণ্য এবং অনেক পরবর্তীকালের রচিত গ্রন্থ 'নিত্যানন্দ প্রভুর বংশ বিস্তার'। আর এই দুই গ্রন্থের সাক্ষ্যেই হঃতো শ্রীহরিদাস দাস বলেন যে শালিগ্রামে সূর্যদাসের বাস ছিল। পরে অম্বিকা কালনায় অবস্থান করেন।[৩৮] এ থেকে কালনায় সূর্যদাসের বাস ছিল—এ সত্যকে সম্পূর্ণ অস্বীকার না করে আমরা এমন সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে সূর্যদাস যখন গৌরীদাসের সকাশে আসতেন, তখন হয়তো উক্ত বাড়িতেই অবস্থান করতেন। এবং পরবর্তীকালে কোন ভক্ত শিষ্য উক্ত বাড়িটিকেই সূর্যদাসের পাটরূপে প্রতিষ্ঠা করেন।

যাইহোক উচ্চ ভিত্তি বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত বারান্দাযুক্ত দক্ষিণমুখী মন্দিরটি দালানরীতির মন্দির। সামনে নাটমন্দির রয়েছে। এই মন্দিরের পশ্চিম দিক থেকে তিনটি কক্ষের ১মটিতে রয়েছেন সূর্যদাস, বসুধা ও জাহ্নবা। মাঝের কক্ষটিতে শ্যামসুন্দরের দুপাশে ৪' উচ্চতাবিশিষ্ট দারু নির্মিত গৌর নিতাই। আর ৩য় কক্ষে মদনমোহন ও রাধাকৃষ্ণ।

এই মন্দিরের খোদিত লিপি থেকে মন্দির সংস্কারের তথ্য জানা যায়: 'শ্রীপাট অম্বিকা কালনা/৺শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর নিতাই গৌরের শ্রীমন্দির/৺সূর্যদাস পণ্ডিতের গাদী/স্বাধীন ত্রিপুরার তৃতীয় ঈশ্বরী শ্রীশ্রীমতী মনোমঞ্জরী/মহাদেবী কর্তৃক ১৮৩১ শকাব্দে ১৩১৯ ত্রিপুরাব্দে/জীর্ণ সংস্কৃত হইল।'

এখানেও বার্ষিক উৎসব মাঘী শুক্লা একাদশী থেকে মাঘী পূর্ণিমা পর্যন্ত

অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসব হয় নিত্যানন্দের জন্মতিথি উপলক্ষে। দশমীতে অধিবাস। বরণডালা সাজিয়ে গৌর নিতাইকে আহ্বান ও বরণ করা হয়।

মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশীতে নিত্যানন্দের জন্মদিনে অদ্বৈত বংশীয় কেউ শান্তিপুর থেকে এসে অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। এদিক থেকে অনুমান করা যায়, উভয় পাটবাড়ির মধ্যে একটি যোগসূত্র ছিল।

পূর্ণিমার দিন কুঞ্জভাঙ্গা হয়। তারপর নগরকীর্তনে বার হওয়া। সামনে থাকে খোন্তা খুন্তি। আর এসবের মধ্য দিয়ে বৈষ্ণব সংস্কৃতির ধারা বহমান।

নামব্রহ্মের পাট ঃ

উনিশ শতকের প্রথম ভাগে ভগবান দাস বাবাজী কালনায় প্রতিষ্ঠা করেন নামব্রহ্মের পাট। তিনি রাগানুগা সাধন মার্গের সাধক ছিলেন। জনশ্রুতি—তিনি উড়িষ্যাবাসী ছিলেন। তাঁকে ঘিরে রয়েছে নানা অলৌকিক কাহিনী। জনশ্রুতি--তিনি নাকি স্থুলদেহে কালনায় থেকে বৃন্দাবনের শ্রীগোবিন্দ জীউর মন্দিরের আঙ্গিনায় তুলসিগাছে মুখ দেওয়া ছাগল তাড়িয়েছিলেন, এবং বর্ধমান রাজ মহতাব চাঁদকে তার প্রমাণ দিয়েছিলেন। জড়াতুর অবস্থায় তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত কূয়াতে সিঁড়ি বেয়ে নেমে স্নান ও নামব্রহ্মের জপ করতেন, যার মধ্যে নাকি গঙ্গাদেবীর আবির্ভাব ঘটত। তাই কূয়াটি 'পাতালগঙ্গা' নামে লোক মধ্যে পরিচিত।

ত্যাগ তপস্যা পবিত্রতা ও ভক্তির ঐকান্তিকতায় তিনি হয়ে উঠেছিলেন উনিশ শতকের বৈষ্ণব সমাজের নিয়ামক। তিনি যদি কোন বৈষ্ণবের জপ তপ ধ্যান ধারণার স্খলন দেখতেন তবে তাঁর কণ্ঠী কেড়ে নিয়ে তাঁকে তিনি বৈষ্ণব সমাজ থেকে তাড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করতেন। কলুটোলা হরিসভা রামকৃষ্ণদেবকে শ্রীচৈতন্যের অবতার প্রতিপন্ন করতে সচেষ্ট হওয়ার জন্য তিনি সভ্যগণের প্রতি বিরক্ত হন, এবং রাগান্বিত হয়ে ভৎর্সনা করেন। ভবিষ্যতে অনুরূপ আচরণের যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে তার বন্দোবস্ত করে যান। রামকৃষ্ণদেব ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে কালনায় তাঁর কাছে উপস্থিত হলে প্রমাণ সাপেক্ষে তিনি রামকৃষ্ণকে চৈতন্যের অবতাররূপে স্বীকার করে নেন। শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীও তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসেন ১২৭৩ সালের চৈত্র মাসে।

কালনায় আগমনকালে রামকৃষ্ণের বয়ঃক্রম ছিল অশীতি বৎসরেরও অধিক।[৩৯]

শ্রীঅজিতকুমার গোস্বামী লিখেছেন যে তিনি সন ১২৯০ (১৮৮৩ খ্রীঃ) বঙ্গাব্দের আশ্বিন কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে নিত্যলীলায় গত হন।[৪০] শ্রীহরিদাস দাস বলেছেন, গৌণী কার্তিকী কৃষ্ণাষ্টমী তিথি।[৪১] অর্থাৎ তিথি অনুসারে দুই-ই এক। আর তা যদি হয় তবে তাঁর জীবৎকাল ছিল প্রায় শত বৎসর।

সময়ের দিক থেকে বর্ধমানের যে মহারাজ তাঁর কৃপাধন্য হয়েছিলেন তিনি মহতাব চাঁদ, যাঁর রাজত্বকাল ১৮৪৪-১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দ। তবে ভগবান দাস বাবাজীর মৃত্যুকাল যদি ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ হয়, তবে মহারাজ আফতাব চাঁদও (১৮৮১-১৮৮৫ খ্রীঃ) তাঁর কৃপাধন্য হয়েছিলেন।

ভগবান দাস বাবাজী ছিলেন নামব্রহ্মের সেবক। এক লক্ষ নামব্রহ্ম জপ করতেন প্রতিদিন। তিনি প্রতিষ্ঠা করেন রাধাগোবিন্দের বিগ্রহ। তিনি কারও প্রণাম গ্রহণ করতেন না। তাঁর গাত্রের কন্থা পশ্চাৎ দিকে মাটি পর্যন্ত লুটিয়ে দিতেন যাতে তাঁর চরণচিহ্ন মুছে যায়। তিনি ভাবতেন যে তাঁর চরণ-চিহ্নের উপর কারও চরণ পড়লে তাঁর অপরাধ হবে। এ তাঁর দীনতার পরিচয়। তিনি প্রতিদিন মহাপ্রভু বাড়ির মধ্যাহ্ন ভোগ গ্রহণ করতেন। তাই তাঁর সমাধিতে এখনও মহাপ্রভু বাড়ি থেকে মধ্যাহ্ন ভোগ আসে। মহাপ্রভু বাড়ির সেবাইতগণই তাঁরই উইল অনুসারে 'শ্রীনামব্রহ্ম' ঠাকুরের সেবাইত নিযুক্ত আছেন।[৪২] আশ্রমের মধ্যে একটি পুরাতন কামরাঙা গাছের নীচে তাঁর সমাধি রয়েছে। আজও এখানে নিত্যসেবা চলে। বিশেষ বিশেষ উৎসবে ভক্তদের সমাবেশ ঘটে। প্রতি বছর কার্তিক মাসে গৌণী কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে তাঁর তিরোধান উৎসব পালিত হয়।

তথ্যপঞ্জী

১। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (২য় খণ্ড / চৈতন্যযুগ), ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ন বুক, ৩য় সং ১৯৮৩, পৃঃ—৩৪৯

২। শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধান (২-৪ খণ্ড), সঙ্ক ঃ—শ্রী হরিদাস দাস, নবদ্বীপ, ২য় সং ৫০১ শ্রীচৈতন্যাব্দ, পৃঃ—১১৬৪

৩। তদেব, পৃঃ—১২৫৮

৪। শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত, বৃন্দাবন দাস, বসুমতী, পৃঃ—৩১৬

৫। শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধান (২-৪ খণ্ড), সঙ্ক:-শ্রীহরিদাস দাস, নবদ্বীপ, ২য় সং ৫০১ শ্রীচৈতন্যাব্দ, পৃঃ—২০৬০

৬। চৈতন্য-পরিকর, শ্রীরবীন্দ্রনাথ মাইতি, বুকল্যাণ্ড ১৯৬২, পৃঃ—৪২৫

৭। তদেব, পৃঃ-৪২২, ৪২৫-২৬

৮। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড। পূর্বার্ধ), ডঃ সুকুমার সেন, ইস্টার্ন পাবলিশার্স, ৪র্থ সং ১৯৬৩, পৃঃ—২৮৬-৮৭

৯। তদেব, পৃঃ— ৩২৬

১০। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, সম্পাঃ-উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, রিফ্লেক্ট, ৩য় মুদ্রণ ১৯৮৬, পৃঃ—১১৩

১১। শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর, শ্রীনরহরি চক্রবর্তী ঠাকুর, গৌড়ীয় মিশন (কলকাতা), ৩য় সং ১৯৮৭, পৃঃ— ৩৫২

১২। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (২য় খণ্ড। চৈতন্যযুগ), ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ন বুক, ৩য় সং ১৯৮৩, পৃঃ—২৯৭

১৩। চৈতন্য-পরিকর, শ্রীরবীন্দ্রনাথ মাইতি, বুকল্যাণ্ড, ১৯৬২, পৃঃ—৩০

১৪। কৌশিকী, শারদীয় ১৩৯৫, পৃঃ—২৩

১৫। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (৩য় খণ্ড / ১ম), ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ন বুক, ২য় সং ১৯৮০, পৃঃ—৫৩৫

১৬। শ্রীচৈতন্যের দিব্য জীবন ও অজ্ঞাত তিরোধান পর্ব, মাধব পট্টনায়ক, অনুঃ-বিষ্ণুপদ পাণ্ডা, দে'জ, ১ম প্রকাশ ১৯৯০, পৃঃ —৬৬

১৭। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড। পূর্বার্ধ), ডঃ সুকুমার সেন, ইস্টার্ন পাবলিশার্স, ৪র্থ সং ১৯৬৩, পৃঃ—৩২৬

১৮। তদেব, পৃঃ—৩৩৫

১৯। তদেব, পৃঃ—৩৭৭

২০। শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত, বৃন্দাবন দাস, বসুমতী, পৃঃ—২৮৬

২১। শ্রীশ্রীগৌর-গৌরীদাস লীলামৃত, শ্রীঅজিত কুমার গোস্বামী, ২য় সং ১৩৫২, কালনা, পৃঃ— ২৪

২২। অদ্বৈত প্রকাশ, ঈশান নাগর, সাহিত্য-পরিষদ-সং, পৃঃ—১৫১

২৩। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, সম্পাঃ-উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, রিফ্লেক্ট, ৩য় মুদ্রণ ১৯৮৬, পৃঃ—২৭৮

২৪। শ্রীশ্রীগৌর-গৌরীদাস লীলামৃত, শ্রীঅজিত কুমার গোস্বামী, ২য় সং ১৩৫২, কালনা, পৃঃ—২৪
২৫। দীনবন্ধু রচনাবলী, সম্পাঃ-ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত, সাহিত্য-সংসদ, ৪র্থ মুদ্রণ, ১৯৯২, পৃঃ—৩৬৯
২৬। শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধান (২-৪ খণ্ড), সঙ্কঃ-শ্রীহরিদাস দাস, নবদ্বীপ, ২য় সং ৫০১ শ্রীচৈতন্যাব্দ, পৃঃ—১৮৪০
২৭। শ্রীশ্রীদ্বাদশ গোপাল বা শ্রীপাটের ইতিবৃত্ত, শ্রীঅমূল্যধন রায় ভট্ট, পানিহাটি ১৩৩১, পৃঃ—৫৯-৭৮
২৮। শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব জীবন (১ম খণ্ড), সঙ্কঃ-শ্রীহরিদাস দাস, নবদ্বীপ, ২য় সং ৫০১ শ্রীগৌরাব্দ, পৃঃ—৬২
২৯। শ্রীশ্রীদ্বাদশ গোপাল বা শ্রীপাটের ইতিবৃত্ত, শ্রীঅমূল্যধন রায় ভট্ট, পানিহাটি ১৩৩১, পৃঃ—৭২
৩০। বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর : স্বাধীন সুলতানদের আমল (১৩৩৮-১৫৩৮ খ্রীঃ), শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়, ভারতী বুক স্টল, ২য় সং ১৯৬৬, পৃঃ—৪২৬
৩১। ব্যতিক্রম, শীত সংখ্যা ১৩৯৫, 'শ্যামসুন্দর মন্দির' প্রবন্ধ, পৃষ্ঠা—সংখ্যাহীন
৩২। তদেব, 'শ্যামসুন্দর মন্দির' প্রবন্ধ, পৃষ্ঠা—সংখ্যাহীন
৩৩। শ্রীচৈতন্যের দিব্যজীবন ও অজ্ঞাত তিরোধান পর্ব, মাধব পট্টনায়ক, অনুঃ বিষ্ণুপদ পাণ্ডা, দে'জ, ১ম প্রকাশ ১৯৯০, পৃঃ—১০
৩৪। চৈতন্য-পরিকর, রবীন্দ্রনাথ মাইতি, বুকল্যাণ্ড ১৯৬২, পৃঃ ৭৯—৮০
৩৫। শ্রীশ্রীদ্বাদশ গোপাল বা শ্রীপাটের ইতিবৃত্ত, শ্রীঅমূল্যধন রায় ভট্ট, পানিহাটি ১৩৩১, পৃঃ—৫৯-৭৮
৩৬। শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব জীবন (১ম খণ্ড), সঙ্কঃ—শ্রীহরিদাস দাস, নবদ্বীপ, ২য় সং ৫০১ শ্রীগৌরাব্দ, পৃঃ—৬২
৩৭। বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর : স্বাধীন সুলতানদের আমল (১৩৩৮-১৫৩৮ খ্রীঃ), শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়, ভারতী বুক স্টল, ২য় সং ১৯৬৬, পৃঃ—৪১০
৩৮। শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধান (২-৪ খণ্ড), সঙ্কঃ-শ্রীহরিদাস দাস, নবদ্বীপ, ২য় সং ৫০১, শ্রীচৈতন্যাব্দ, পৃঃ—১৪০৪

৩৯। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ, সারদানন্দ মহারাজ, উদ্বোধন, পৃঃ—১৩২

৪০। শ্রীশ্রীগৌর-গৌরীদাস লীলামৃত, শ্রীঅজিতকুমার গোস্বামী, ২য় সং ১৩৫২, কালনা, পৃঃ—৪৫

৪১। শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধান (২-৪ খণ্ড), সঙ্কঃ-শ্রীহরিদাস দাস, নবদ্বীপ, ২য় সং ৫০১ শ্রীগৌরাব্দ, পৃঃ—১৮৪০

৪২। শ্রীশ্রীগৌর-গৌরীদাস লীলামৃত, শ্রীঅজিতকুমার গোস্বামী, ২য় সং ১৩৫২ ; কালনা, পৃঃ—৪৫-৪৬

রাজবৃত্তের সংস্কৃতি

সুকুমার সেন বলেছেন যে দেবালয় প্রতিষ্ঠার দ্বারা ও দেবসেবা উপলক্ষে আতিথ্য আয়োজন করে জমিদাররা প্রকারান্তরে সংস্কৃতির ধারণ ও পোষণ যে কিছু পরিমাণে করেছিলেন সে কথা স্বীকার করতে হবে।[১] সেদিক থেকে বর্ধমানের রাজন্যবর্গ দেবসেবা উপলক্ষে আতিথ্য আয়োজন করে, সর্বধর্ম-সম্প্রদায়ের দেবসেবার উদ্দেশ্যে ভূসম্পত্তি বা বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করে সংস্কৃতির ধারণ ও পোষণ করেছিলেন। সেক্ষেত্রে কালনাকে তীর্থ নগরীরূপে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, এবং মন্দিরময় করে তুলে কালনার সংস্কৃতিকে পল্লবিত করে তুলেছিলেন।

১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে চিত্রসেন রায় তাঁর পিতা মহারাজ কীর্তিচন্দ্রের বর্তমানেই ইন্দ্রাণী (দাঁইহাট) পরগণার জমিদারী প্রাপ্ত হন, এবং ইন্দ্রাণীর উন্নতি বিধানে সচেষ্ট হন। কীর্তিচন্দ্র সেখানে আবাসগৃহ নির্মাণ করেন, প্রতিষ্ঠা করেন শিবমন্দির। সেখানে সমাজবাড়ি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে কীর্তিচন্দ্র দেহরক্ষা করলে ঐ সমাজবাড়ির মধ্যস্থলের একটি কক্ষে তাঁর দেহ-ভস্ম রক্ষিত হয়। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিলোকচন্দ্র দেহরক্ষা করলে তাঁর দেহ-ভস্মও রক্ষিত হয় ঐ সমাজবাড়িতেই। ঐ বাড়ির সন্নিকটেই অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে বর্ধমানের মহারানী 'বারদুয়ারী ঘাট' নামে একটি স্নানের ঘাট, যা বুড়ারানীর ঘাট নামে প্রসিদ্ধ, এবং বর্ধমানের দেওয়ান একটি ঘাট নির্মাণ করেন, যা 'মানিক চাঁদের' ঘাট নামে প্রসিদ্ধ।[২]

অন্যদিকে, বর্ধমানের রাজাদের দ্বারা অম্বিকা কালনায় ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে লালজী মন্দির ও সিদ্ধেশ্বরী মন্দির। এই সময় থেকে রাজা তেজচন্দ্রের সমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় (১৮৩২ খ্রীঃ) পর্যন্ত অম্বিকা কালনায় অধিকাংশ মন্দিরই প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এ থেকে এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে অম্বিকা কালনা দাঁইহাটের (ইন্দ্রাণী) সমান্তরালে রাজাদের গঙ্গাস্নানের স্থানরূপে গড়ে উঠছে, এবং ক্রমান্বয়ে তীর্থনগরীর রূপ নিচ্ছে।

এখানকার পুরাতন সমাজ বাড়িতে দুটি সমাধি মন্দির রয়েছে। তার মধ্যে একটি তেজচন্দ্রের, যার প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দ। অন্যটি ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে

প্রতিষ্ঠিত রানী কমল কুমারীর সমাধি মন্দির। এ থেকে মনে করা যায় যে গঙ্গা দূরে সরে যাওয়ায় দাঁইহাট বর্ধমানের রাজগণ কর্তৃক রাজপরিবারের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ক্ষেত্ররূপে সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়েছে, এবং তার পরিবর্তে অম্বিকা কালনাকে গ্রহণ করা হয়েছে। বর্ধমানের রাজন্যবর্গের কুলদেবতা লক্ষ্মীনারায়ণ। শ্রীবিনয় ঘোষ বলেছেন যে রাধাবল্লভী সম্প্রদায়ভুক্ত শ্যামসুন্দর গোস্বামী বর্ধমানের রাজা জগৎরাম রায় ও তাঁর রানীকে দীক্ষা দেন। তাঁর পুত্র ভক্তলাল গোস্বামী মহারাজ কীর্তিচন্দ্র ও চিত্রসেনকে দীক্ষা দেন।[৩] তাই প্রাণবল্লভ তাঁর 'জাহ্নবী-মঙ্গলে' কীর্তিচন্দ্রের জননীকে বলেছেন 'কৃষ্ণপরায়ণী'।

কীর্তিচন্দ্রের চন্দ্রকোণা ও বরদা অভিযানের সময় যে সাধু জয়সূচক ভবিষ্যৎ-বাণী করেছিলেন, সেই নিম্বার্ক সম্প্রদায়ভুক্ত মহন্তকে ৫০০ বিঘা নিষ্কর সম্পত্তি দান করেন।[৪] হয়তো এই সম্প্রদায়ের প্রতি আনুগত্য বশেই কীর্তিচন্দ্রের জননী ব্রজসুন্দরী দেবী কেঁদুলির নিম্বার্ক অস্থলকে ৩৬৫ বিঘা জমি দান করেন। এবং জয়দেবের মন্দিরও নির্মাণ করে দেন।[৫] কিন্তু এঁরা বৈষ্ণব মতের দ্বারা দীক্ষিত হলেও বৈষ্ণব মতের মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখেন নি। বরং সর্বধর্মের প্রতিই এঁরা ছিলেন অনুরাগী, পৃষ্ঠপোষক এবং সর্বোপরি পরধর্ম-সহিষ্ণু। তাই দেখা যায়, চিত্রসেন বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হয়েও কালনায় সিদ্ধেশ্বরীর মন্দির নির্মাণ করছেন। আবার আবদুল গনি খান বলেছেন যে বর্ধমান রাজার আমলে রাজ দরবার হতে প্রতি সন্ধ্যায় হজরত পীর খক্কড় শাহের সমাধিতে সন্ধ্যাদীপ এবং প্রতি বৃহস্পতি ও শুক্রবার নিয়মিত শিন্নি, লোবান, গোলাপ-পানি, ও ভোগের ব্যবস্থা থাকত। পূর্বে ১৭ ফাল্গুনের বাৎসরিক স্মৃতি-উৎসবের যাবতীয় খরচ বর্ধমানের রাজন্যবর্গ বহন করতেন।[৬] আর এই সর্বধর্মের প্রতি অনুরাগের প্রেরণাতেই তাঁরা কালনায় কৃষ্ণমন্দির, শিবমন্দির ও কালীমন্দির দিয়ে তীর্থনগরীকে সাজিয়ে দিয়েছেন। সেই সাজানো মন্দিরগুলিকে কাল-পারম্পর্যে সাজিয়ে তাদের সংস্কৃতি ও প্রত্নতত্ত্বের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করছি।

লালজী মন্দির

কালনায় বর্ধমানের রাজাদের তৈরী মন্দিরগুলির মধ্যে সর্বপ্রাচীন এবং একই বৎসরে প্রতিষ্ঠিত দুটি মন্দির—সিদ্ধেশ্বরী ও লালজী মন্দির। এই লালজী মন্দির পঁচিশ রত্ন শৈলীর মন্দির। পশ্চিমবঙ্গে এই শৈলীর মন্দিরের সংখ্যা মাত্র পাঁচটি।

তার মধ্যে একটি হুগলী জেলার সুখাড়িয়ার আনন্দময়ী কালীমন্দির, অন্যটি বাঁকুড়া জেলার সোনামুখীর শ্রীধর মন্দির। আর তিনটি অম্বিকা কালনায়—কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দির, গোপালজীর মন্দির, এবং লালজী মন্দির। এর প্রতিষ্ঠালিপিতে বলা হয়েছে :

যৎ-পুত্রাঃ পৃথিবীতলে সুবিদিতাঃ সৎ কৃর্ত্তিচন্দ্রঃ কৃতী
সা শ্রীরাজকুমারিকাঃ ব্রজকিশোরী কৃষ্ণভক্তর্য্যথিনী।
শাকে বৈকষডর্ত্তুচন্দ্র গণিতে প্রাসাদমেতম্ দদৌ
রাধাকৃষ্ণ যুগায় সৎ-কবিসভামধ্যেস্থ তৎ প্রিতয়ে॥ শকাব্দাঃ ১৬৬১

অর্থাৎ যাঁর পুত্রগণ পৃথিবীতলে সুবিদিত কৃতী কীর্তিচন্দ্র সেই কৃষ্ণভক্তি-প্রার্থনাকারিনী শ্রীরাজকুমারী ব্রজকিশোরী ১৬৬১ শকাব্দে (১৭৩৯ খ্রীঃ) রাধাকৃষ্ণের চরণযুগে এই প্রাসাদ (মন্দির) দান করে কবিসভায় তিনি প্রীত হয়েছিলেন।

অর্থাৎ মন্দিরটি কীর্তিচন্দ্রেব রাজত্বকালে নির্মিত হয়েছিল। ব্রিটিশ শক্তির দেওয়ানী লাভের (১৭৬৫ খ্রীঃ) পূর্বে অম্বিকা কালনায় যে আটটি মন্দির নির্মিত হয়েছিল তার মধ্যে অন্যতম লালজী মন্দির। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পূর্বে রচিত দীনবন্ধু মিত্র তাঁর সুরধুনী কাব্যে (১ম খণ্ড) এই মন্দিরে 'লালজী' প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন :

এই স্থলে লালজির সুখ অবস্থান,
নির্ম্মিত মন্দির বড়, সুন্দর সোপান,
বায়ান্ন মোহন চূড়া শোভিত মন্দিরে,
শিখরনিকর যথা শিখরীর শিরে,
উপাদেয় রাজভোগ প্রদত্ত রাজার,
জামাই আদরে দেব করেন আহার,
অতিথি বৈষ্ণব সাধু যে সেখানে যায়,
প্রসাদ ভক্ষণ করে রাজার কৃপায়।
কীর্তিচন্দ্র নরপতি বর্দ্ধমানেশ্বর,
বিভবে কুবের, দানে কর্ণ গুণাকর,
জাহ্নবীর স্নান আশে মহিষীর সনে,
উপনীত কালনায় সুপবিত্র মনে।

সেই কালে কালনায় সন্ন্যাসীপ্রবর,
আইলেন লয়ে এক বিগ্রহ সুন্দর ;
ঠাকুরের হেরি রূপ রাজা রাজরাণী,
বলিলেন সন্ন্যাসীরে সবিনয় বাণী—
"মোহন মূরতি দেব শোভা আভাময়
সশরীরে নারায়ণ ভুবনে উদয় ;
কি কারণ তপোধন বামপাশে নাই,
বনমালিবিলাসিনী বিনোদিনী রাই ?
রমণী বিহনে মনে করো নাহি সুখ,
সংসার আঁধার, দুঃখে সদা ম্লানমুখ,
নারী বিনা গৃহ শূন্য মানবমণ্ডলে,
লক্ষ্মীছাড়া লক্ষ্মীপতি পত্নীছাড়া হলে ;
অতএব নিবেদন তপোধন করি,
হেমে রচি হেমকান্তি রাধিকা সুন্দরী,
তোমার শ্যামের সনে দিই পরিণয়,
বল দেখি তব মত হয় কি না হয় ?
সন্ন্যাসী সম্মতি দিল, রাজা সমাদরে
নিরমিয়ে হেমরমা মাধবের করে
করিলেন সম্প্রদান সহ রত্নরাজি,
বসন ভূষণ ভূমি গাভী গজ বাজী ;
স্নেহময়ী মহিষীর আনন্দ অপার,
সহচরীদলে মিলে করে কুলাচার ;
বরণ করিয়ে মেয়ে জামাই রতনে,
বসাইল সিংহাসনে হরষিত মনে।
নূতন নূতন পূজা হয় দিন দিন,
কালনায় রাজপুরে সুখ সীমাহীন।
এইরূপে কিছুদিন বিগত হইল—
তনয় তনয়বধূ সন্ন্যাসী যাচিল।
কীর্তিচন্দ্র মহারাজ কৌশলে তখন,

বলিলেন সন্ন্যাসীরে এই বিবরণ—
"বৈবাহিক তপোধন তুমি হে আমার,
জান না কি রাজবংশে আছে কি আচার ?
ভূপতি-দুহিতা ভূপ-কুল-সরোবরে
নবীনা নলিনীরূপে বিহরে আদরে,
মধুলোভী মধুকর রাজার জামাই;
সরে চ'রে জনকের মুখে দিয়ে ছাই।
কমলিনী নাহি যায় ভ্রমর-ভবনে,
কেন তবে যাবে মেয়ে জামাতার সনে ?
দূরীভূত কর ভ্রম বৈবাহিক ভাই,
হয়েছে তনয় তব রাজার জামাই।"
নিরুত্তর তপোধন রাজার কথায়
ঠাকুরে করিয়ে দান পর্য্যটনে যায়।
লালাজী জামাইগণে বর্দ্ধমানে বলে,
লালজীরে পূর্ব্বে বলে লালাজী সকলে।[৭]

এখানে দীনবন্ধু মিত্রের যে বর্ণনা তার মধ্যে কয়েকটি অসঙ্গতি রয়েছে। যেমন, তিনি মন্দিরটির সম্বন্ধে বলেছেন 'বায়ান্ন মোহন চূড়া'। কিন্তু মন্দিরটির চূড়া হচ্ছে পঁচিশটি। আসলে এখানে ৫২ বার ৫২ রকমের ভোগ দেওয়া হোতো। সেই ৫২ সংখ্যাটি ২৫টি চূড়ার ক্ষেত্রে মনে হয় ব্যবহৃত হয়েছে ভ্রমবশতঃ। রাধিকার সম্বন্ধে বলেছেন 'হেমে রচি হেমকান্তি রাধিকা সুন্দরী' বা 'নিরমিয়ে হেমরমা।' এ থেকে বলা যায়, রাধিকার মূর্তিটি স্বর্ণনির্মিত। কিন্তু এখন যে মূর্তিটি, তা দারু মূর্তি। এক্ষেত্রে হরিদ্রা বর্ণের বলে অবশ্য 'হেমরমা' বলা যেতে পারে। অন্যদিকে, দীনবন্ধু বলেছেন যে বর্ধমানে জামাইগণকে লালাজী বলে, সেই লালাজী থেকে লালজী এসেছে। কিন্তু পুত্র অর্থেই লালা বা লালের অধিকতর ব্যবহার। যেমন কৃষ্ণকে পুত্রার্থেই নন্দলালা বলা হয়। আবার কীর্তিচন্দ্রের জননী ব্রজসুন্দরী যখন মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা তখন 'লালজী'কে প্রাপ্তির সাথে কীর্তিচন্দ্রের পত্নীকে যুক্ত করা যায় না।

যাইহোক, কারও কাছ থেকে ঠাকুর নিয়ে নেওয়া, এর ইতিহাস এই রাজবংশের সাথে জড়িয়ে যে না ছিল, তা নয়। এই রাজবংশেরই কৃষ্ণরাম রায়

(১৬৮৯-১৬৯৬ খ্রীঃ) শিবমঙ্গল কাব্যের রচয়িতা কবি রামকৃষ্ণ রায়ের গৃহদেবতা 'রাধাবল্লভজী'কে লুণ্ঠন করে বর্ধমানে প্রতিষ্ঠা করেন।[৮] অন্যদিকে, পুতুলের বা ঠাকুরের বিয়ে দেওয়া রাজপরিবারের প্রবর্তনাতেই সংঘটিত হতো। সেদিক থেকে সন্ন্যাসীর কাছ থেকে ঠাকুর নিয়ে ঠাকুরের ব্যবস্থা যে করা হয়েছিল তা ধরে নেওয়া যেতে পারে। তাছাড়া ঠাকুর যে সন্ন্যাসীর তা ঠাকুরকে ভোগের সাথে পোড়া রুটি নিবেদন করা থেকে অনুমিত হয়। কারণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ কর্তৃক লিখিত 'ঐতিহ্যময় শহর অম্বিকা কালনা' নামক প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে লালজী প্রথমে ছিলেন এক সাধক ফকিরের উপাস্য। সাধক লালজীকে ভোগ হিসাবে নিবেদন করতেন পোড়া রুটি। আবহমান কাল থেকে প্রথানুযায়ী (বর্তমানে লুপ্ত) আজ অবধি ভোগের সাথে পোড়া রুটি লালজীকে নিবেদন করা হয়।[৯]

অক্ষয়কুমার দত্ত বলেছেন যে বল্লভাচার্য প্রবর্তন করেন বালগোপালের সেবা। এঁদের মন্দিরে গোপাল, রাধাকৃষ্ণ এবং কৃষ্ণাবতার সম্বন্ধীয় অন্যান্য প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে। প্রতিদিবস শ্রীকৃষ্ণের আটবার সেবা হয়। নিত্যসেবা ব্যতিরেকে কতকগুলি সাংবাৎসরিক মহোৎসব আছে, যথা—রথযাত্রা, রাসযাত্রা এবং জন্মাষ্টমী। কাশীধামে এবং পশ্চিমদেশীয় অনেক স্থানে জন্মাষ্টমী ও রাসযাত্রায় অতিশয় আমোদ হয়। ভারতবর্ষের সর্বস্থানে, বিশেষতঃ মথুরা ও বৃন্দাবনে এঁদের বিস্তর মঠ ও দেবালয় আছে। কাশীতে রয়েছে প্রসিদ্ধ লালজীর মন্দির।[১০]

এখানের লালজীর মন্দিরেও শ্রীকৃষ্ণের বাল্য লীলারই প্রাধান্য। এখানের প্রধান উৎসব জন্মাষ্টমী। তাছাড়া, রথের টান, রাসযাত্রাও অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

মন্দির-দালানে দণ্ডায়মান অবস্থায় রয়েছেন রাধাকৃষ্ণ। উচ্চতা যথাক্রমে ২' এবং ১½'। তাঁদের দুপাশে বসা অবস্থায় দুই বালগোপাল।

শ্রীসমীর কুমার চক্রবর্তী তাঁর 'সংস্কৃতিময়ী অম্বিকা কালনা' নামক প্রবন্ধে বলেছেন যে লালজী হলেন বালগোপালের মূর্তি।[১১] আর এই বালগোপালের উপাসনা বাংলাতেও যে সূচিত হয়েছিল তার প্রমাণ চন্দ্রকোণার নবরত্ন লালজী মন্দির, যার প্রতিষ্ঠাব্দ ১৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দ,[১২] এবং বিষ্ণুপুরের দুর্গ এলাকায় প্রতিষ্ঠিত লালজী মন্দির, যার প্রতিষ্ঠাব্দ ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দ।[১৩] সেক্ষেত্রে কালনায় 'লালজী মন্দির' প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে এক শতাব্দীর পরে।

পশ্চিমবঙ্গ তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ কর্তৃক লিখিত 'ঐতিহ্যময় শহর অম্বিকা কালনা' নামক প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে লালজীর মন্দিরে শারদীয়া পূজার পূর্বে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা থেকে যৌবন পর্যন্ত নানা লীলাকাহিনী পঞ্চগুঁড়ির সাহায্যে অঙ্কিত করা হয়। এর নাম সাঁঝি। একমাত্র কালনা এবং বৃন্দাবন ধাম ব্যতীত অন্য কোথাও এই ধরনের চিত্রমালা দেখা যায় না।[১৪] আর এই ঐতিহ্য যে বৃন্দাবনাগত তা স্বীকার করতে হয়। সুতরাং এসব দিক বিচার করে বলা যায়, লালজীব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যতই গল্পকথা থাক না কেন, গল্পে কথিত সন্ন্যাসী ছিলেন বল্লভাচার্য সম্প্রদায়ভুক্ত। তাঁর প্রবর্তনাতেই কালনায় কীর্তিচন্দ্রের মাতা ব্রজকিশোরী কর্তৃক 'বালগোপালের সেবা' প্রবর্তিত হয়, স্থাপিত হয় লালজী মন্দির।

মন্দিরটি পূর্ব ও দক্ষিণমুখী। এর গঠনের সাথে কালনার গোপাল মন্দিরের গঠনগত মিল আছে, তবে কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দিরের সাথে সামান্যই পার্থক্য, এবং তা প্রথম তলের কোণ সৃষ্টির ক্ষেত্রে।

এই মন্দিরের উত্তর দিকের দেওয়াল ২১´। তার পূর্বপ্রান্ত থেকে ৯০° কোণ করে দক্ষিণদিকে ৫´ বাডানো, তার প্রান্ত থেকে পূর্বদিকে ৪´ বাড়ানো, তার প্রান্ত থেকে দক্ষিণদিকে ৪´ বাডানো, তার প্রান্ত থেকে পূর্বদিকে ৪´ বাড়ানো। সেখান থেকে দক্ষিণমুখী ১৮´। তার দক্ষিণ প্রান্ত থেকে ৯০° কোণ করে ৫´ পশ্চিমদিকে বাডানো, তার প্রান্ত থেকে ৪´ দক্ষিণে বাড়ানো, তার প্রান্ত থেকে ৪´ পশ্চিমে বাডানো, তার প্রান্ত থেকে ৪´ দক্ষিণে বাড়ানো। অন্যদিকে পশ্চিমদিকের দেওয়াল সমভাবে পর্যায়ক্রমে পূর্ব ও দক্ষিণদিকে বাড়ানো।

দুই দিকের দক্ষিণদিকস্থ বাডানো অংশে জগমোহন ও নাটমন্দির। এ মন্দির উচ্চ ভিত্তিবেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত। তবে এর সংলগ্ন ভূমির সমতল বেদীতে আর একটি পৃথক সুবৃহৎ চারচালবিশিষ্ট নাটমন্দির সৃষ্টি করা হয়েছে, যার পরিসীমা ৩০´× ১৪´, এবং যার দুপাশে ৫টি করে, সামনে ৩টি খোলা দরজা।

মন্দিরটির প্রথম তলের ছাদের চারকোণে যে খাঁজের সৃষ্টি হয়েছে তাতে তিনটি করে—দুটি চূড়া সমমাপে এগোনো, মাঝেরটা একটু পিছানো—মোট ১২টি চূড়া স্থাপিত। তারপর বেড় কমিয়ে খানিকটা উপরে অষ্ট-

কোণাকৃতি ২য় তল সৃষ্টি করা হয়েছে। তার ছাদে আটকোণে ৮টি চূড়া। এরপর বেড়ের উচ্চতা কমিয়ে ২য় তলের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম উচ্চতায় ৩য় তল সৃষ্টি করা হয়েছে। তার ছাদের ৪ কোণে ৪টি, এবং মাঝে একটি বড় চূড়া। অর্থাৎ চূড়াগুলির সজ্জা হচ্ছে ১২+৮+৪+১, একুনে পঁচিশ চূড়া। এই চূড়াগুলি চারকোণা এবং তাদের ছাদ উঁচু নিচু কার্নিসের বিন্যাসে কিছুটা পীঢ়া শিখরের অনুরূপ।

মন্দিরের ত্রি-খিলান দালানের ছাদ ধনুকাকৃতি 'ভল্ট'-এর উপর, এবং গর্ভগৃহের ছাদ কোণে লহরাযুক্ত গম্বুজের উপর স্থাপিত।

পূর্বদিকের দরজা দিয়ে গর্ভগৃহে ঢুকতেই ডানদিকে রয়েছে সিঁড়ি, যা দিয়ে মন্দিরের উপরে ওঠা যায়।

পূর্ব ও পশ্চিমদিকে রয়েছে এক দালানযুক্ত ঢাকা বারান্দা। পূর্বদিকের বারান্দা-সংলগ্ন কাঠের দরজা দিয়ে নাটমন্দিরে যাওয়া যায়। এই মন্দিরের উচ্চতা প্রায় ৬০´/৬৫´। উত্তরে রয়েছে ২টি কাঠের জানালা, যেহেতু গর্ভগৃহের উত্তরে রয়েছে শয়নকক্ষ।

মন্দিবের পশ্চিমদিকে রয়েছে ঢাকা বারান্দা। দক্ষিণের ত্রিখিলানযুক্ত বারান্দার মাঝখানের খিলান শীর্ষে রয়েছে লঙ্কাযুদ্ধের 'মোটিফ', তাতে ফ্রেশকোর (রঙিন) আভাস দেখা যায়।

উত্তরদিকের জানালার মাথায় প্রতীক শিবমন্দিরের সজ্জা ও ফুলকারি কাজ। খিলানের দু'পাশের দেওয়ালে দুটি খাড়া সারিতে একক মূর্তি স্থাপিত ভিন্ন ভিন্ন খোপের মধ্যে। এ খোপের সারি কার্নিসের নীচ দিয়ে ঘুরে এসে মিলিত হয়েছে দুপাশের লম্ব সারিগুলির সঙ্গে। আর পশ্চিমদিকের দেওয়াল ভরাট করা হয়েছে নানাবিধ ফুলকারি কাজে।

'মৃত্যুলতা' খাড়া করে লাগানো হয়েছে দেওয়ালের কোণে ও গায়ে। তাছাড়া, পূর্ব ও দক্ষিণদিকের কোণের পাশ বেয়ে প্রথম তলের কার্নিস পর্যন্ত উঠে গেছে ফুলকারি কাজের পদ্ম ভাস্কর্য।

বারান্দার খিলান স্তম্ভগুলিতেও রয়েছে দক্ষিণাকালী, দুর্গা, বালগোপাল, ও নৌকাবিলাসের মতো নানা পৌরাণিক ভাস্কর্য। তাছাড়া, টেরাকোটার মধ্যে রয়েছে জগদ্ধাত্রী, অশ্বারোহী সৈন্য, উটের পিঠে সামরিক বাদ্যবাহিনী, হাতী সিংহের যুদ্ধ, সিংহবাহিনী, হরিণশিকার, শিকারীর প্রতি ব্যাঘ্রের আক্রমণ,

বালগোপাল, গণেশ মূর্তি, গরুর পিঠে হরিণ শিকারের চিত্র, মল্লযুদ্ধ, গোদোহনের সমাজচিত্র, শিশু কৃষ্ণের নন্দালয়ে যাত্রা, রথের উপর নহবৎ যাত্রা, পালিত সারমেয়, ঝুমুর নর্তকী, টিয়া পাখি ইত্যাদি। জন্মাষ্টমীর সময় মন্দির-প্রাঙ্গণে বিন্ধ্যবাসিনীর পূজা হয়। তিনি মৃন্ময়ী। তিনি অষ্টভুজা, সিংহবাহনা, কৃষ্ণবরণা। তাঁর দুপাশে জয়া বিজয়া। এঁর বিসর্জন হয় জন্মাষ্টমীর পরের দিন। জন্মাষ্টমীর দিন মাটির বড় আকারের কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পুতুল দিয়ে মন্দির-দালান সাজানো হয়। যেমন বৃহৎ দুই দ্বারপালের মূর্তি, বিশ্বামিত্রের মূর্তি, বিষ্ণুর ত্রিপাদ ও কৃষ্ণের ননীচোরা মূর্তি। তাছাড়া, রাম সীতার মূর্তি দিয়েও সাজানো হয়।

এই মন্দিরের পিছনে রয়েছে রন্ধনশালা। প্রবেশদ্বারে অতিথিশালা ও দানছত্রেব স্থান। এ ছাড়া মন্দির প্রাঙ্গণে রয়েছে আরও দুটি মন্দির—একটি গিরি-গোবর্দ্ধন মন্দির, অন্যটি আধুনিক বারান্দাযুক্ত নারায়ণের মন্দির। এই মন্দিরে ১০৮টি নারায়ণ শিলা পূজিত হতো। বর্তমানে সেগুলি লালজী মন্দিরে স্থানান্তরিত। সেখানে পূর্বমুখী সিংহাসনে রয়েছেন দ্বাদশ গোপাল, ছোট আকৃতির পাঁচটি শিব, ৬ জোড়া রাধাকৃষ্ণ (৩ জোড়া দারু ও ৩ জোড়া শিলামূর্তি)। গর্ভগৃহের দক্ষিণ-পূর্বকোণেব সিংহাসনে রয়েছে মদনগোপালের দারুমূর্তি, দ্বাদশ নারায়ণ শিলা, লক্ষ্মীর পঞ্চমুখী শঙ্খ এবং গোপাল মূর্তি।

এক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন থাকে, এই মন্দির যখন বিষ্ণুমন্দির তখন কেন এই মন্দিরে পঞ্চশিব রক্ষিত হয়, বা কেন বিন্ধ্যবাসিনীব পূজা অনুষ্ঠিত হয়? এক্ষেত্রে বলা যায়, এই মন্দির-প্রাঙ্গণেই আর একটি মন্দির রয়েছে, সেটি গোবর্দ্ধন মন্দির, যার প্রতিষ্ঠাকাল ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দ। অর্থাৎ লালজী মন্দিরের ১৯/২০ বছর পরে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। তাছাড়া, ১০৮ শিলার আধুনিক দালানযুক্ত নারায়ণের মন্দিরও প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। অর্থাৎ সময় সাপেক্ষে লালজী মন্দির বিবর্ধিত হচ্ছে। সেক্ষেত্রে সময় সাপেক্ষে এই মন্দিরে মধ্বাচারী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রভাব সঞ্চারিত হতে পারে তা বলা যায়। এই 'মধ্বাচারীদিগের দেবালয়ে বিষ্ণুর সহিত একত্রে শিব, পার্বতী প্রভৃতিরও পূজা হয়'।[১৫] সুতরাং সেদিক থেকে লালজীর মন্দিরে শিবের এবং তাঁর শক্তিরূপে বিন্ধ্যবাসিনীর পূজা অনুষ্ঠিত হতে পারে।

অন্যদিকে পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যে যিনি শ্রদ্ধা সহকারে একশত

শালগ্রাম শিলা পূজা করেন, তিনি বিষ্ণুলোকে বাসান্তে চক্রবর্তী অর্থাৎ রাজা হন।[১৬] আর এই বাসনায় শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনামের প্রভাবে এক শতকে বর্দ্ধিত করে ১০৮ শিলার নারায়ণ মন্দিরের প্রতিষ্ঠা।

আবদুল গণি খান বলেছেন যে বর্ধমানের সদাব্রত বাড়িতে রানী বিনোদেয়ী দেবী (বিজয়চাঁদের মাতা) আতপ চাল, সিদ্ধচাল, আটা, কলাই-অড়হর ডাল, ঘি, করকচ (লবণ), পাটালিগুড় পাঁচ ছয় শো লোকের মধ্যে দান করতেন। গরিব বিধবা, অন্ধ, খঞ্জ, অসহায় ছেলেমেয়েরা পেতেন দৈনন্দিন সিধা। এতে থাকত সিদ্ধ চাল পনের ছটাক, কলাই ডাল এক ছটাক, করকচ লবণ দেড় তোলা। সাধু সন্ন্যাসীদের গাঁজা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। যে সব সাধু ফকির আটা খেতে চাইতেন না তারা পেতেন আতপ চাল। আর এই একই সদাব্রত চালু ছিল অম্বিকা কালনার শ্রীশ্রীলালজী ঠাকুর বাড়িতে।[১৭] এই বাড়িতে প্রতিদিন ১ মণ চালের ভোগ হতো—৫২ বার ৫২ রকমের ভোগ।

রাসমঞ্চ

লালজী বাড়ির সম্মুখে রয়েছে রাসমঞ্চ। দীনবন্ধু মিত্র ১২৭ বছর পূর্বে তাঁর স্থরধুনী কাব্যে যেভাবে কালনার রাসমঞ্চটির বর্ণনা দিয়েছেন তাতে মনে হতে পারে রাসমঞ্চটি গৌরীদাসের পাট বাড়ির। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ রাসমঞ্চটিই আলোচ্য রাসমঞ্চ। সেখানে বর্ণনায় বলা হয়েছে—

অপরূপ রাসমঞ্চ স্থগোল গঠন,
বিরাজে ঘেরিয়ে তায়, স্থগোল প্রাঙ্গণ,
ধারে ধারে চক্রাকারে অতি স্থশোভিত,
জোড়া জোড়া দেবদারু তরু পল্লবিত।

এর অষ্ট কোণাকৃতি ক্ষেত্রে আটটি খোলা দরজা। এর বেড় ৪´×৮=৩২´। প্রায় ১৬´ এর পর আর একটি বৃত্তাকার বেষ্টন, যার খোলা দরজা ২৪টি, যাকে দীনবন্ধু মিত্র 'স্থগোল প্রাঙ্গণ' বলে অভিহিত করেছেন। এর বেড় ৪´×২৪= ৯৬´। এর উচ্চতা মোটামুটি ২৫´। এর নির্মাণ কৌশল—অষ্টাকৃতি ক্ষেত্রের উপর আর একটি অষ্টাকৃতি ক্ষেত্র। তার উপর গম্বুজাকৃতি শিখর। এই রাসমঞ্চ মূলতঃ লালজী বাড়িরই এক অঙ্গ। রাসের সময় মাজিবাড়ির শ্যামচন্দ্র এবং শ্যামরায় পাড়ার শ্যামরায়কে জামাই রূপে এই রাসমঞ্চে নিয়ে আসা হতো।

কৃষ্ণচন্দ্র মন্দির

লালজী মন্দিরের অগ্নিকোণে কোণাকুণি বিপরীতে অবস্থিত কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দির। এই মন্দিরে যে প্রতিষ্ঠালিপি রয়েছে তা হলো—

শ্রীহরিচরণ সরোজ গুণমুনি
ষোড়শ সংখ্যকে শকে অব্দে ম
ন্দিরম্ অর্পিতমেতদ্রাজা শ্রী
ত্রিলোকচন্দ্র মাত্রা ॥১৬৭৩
সন ১১৫৯

এ থেকে জানা যায় যে ১৬৭৩ শকাব্দে (১৭৫১ খ্রীঃ) রাজা ত্রিলোকচন্দ্রের মাতার দ্বারা শ্রীহরির চরণপদ্মে এই মন্দির অর্পিত হয়েছিল।

এই মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রধান সিংহাসনে রয়েছে কৃষ্ণচন্দ্র ও রাধার বিগ্রহ। উচ্চতা যথাক্রমে ২½´, ২´। সঙ্গে রয়েছেন চার সখী। এ সবই দারু বিগ্রহ। অন্য এক সিংহাসনে রয়েছেন দু'জোড়া রাধাকৃষ্ণ। পূর্বে রয়েছেন রাধাবল্লভজী এবং পশ্চিমে বৃন্দাবনচন্দ্রজী। এগুলির মধ্যে বৃন্দাবনচন্দ্রের বিগ্রহটি প্রস্তরের। এই দু'জোড়া বিগ্রহকেই রাধাবল্লভজীর মন্দির থেকে কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দিরে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। উঠানে রয়েছে গরুড়স্তম্ভ।

দক্ষিণমুখী এই মন্দিরটি উচ্চ ভিত্তিবেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত। এটিও তিনতল বিশিষ্ট পঁচিশ রত্নমন্দির।

মন্দিরের প্রথম তলের ছাদ ধনুকাকৃতি হয়ে যে কোণের সৃষ্টি করেছে, তার চারটি কোণই পর্দার আকারে খানিকটা উঁচু করা। সেই পর্দায় চুন সুরকির বড় আকৃতির হাতি ও সিংহের মূর্তি। এমন মূর্তি লালজী বা গোপাল মন্দিরে নেই।

ঐ পর্দার উপরেই উঁচু করা কোণগুলিতে ৩টি করে চারকোণে মোট ১২টি চূড়া। তবে গোপাল বা লালজী মন্দিরে প্রতি কোণের ৩টি চূড়া এমনভাবে সাজানো যে বাইরে থেকে কোণগুলিকে লক্ষ্য করলে মনে হবে যেন দুটি চূড়া সমমাপে এগোনো, আর মাঝেরটা একটু পিছানো। কিন্তু এই মন্দিরে মাঝেরটি সামনে এগোনো, আর পাশের দুটি সমমাপে পিছনে ঢোকানো। এইভাবে প্রথম তলের ছাদে মোট ১২টি চূড়া। এরপর বেড় কমিয়ে খানিকটা উপরে অষ্টকোণাকৃতি ২য় তল সৃষ্টি করা হয়েছে। তার ছাদের আটকোণে

৮টি চূড়া। এরপর বেড়ের প্রসারতা কমিয়ে ২য় তলের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম উচ্চতায় ৩য় তল সৃষ্টি করা হয়েছে। তার ছাদের চারকোণে ৪টি, এবং মাঝে একটি বড় চূড়া। এক্ষেত্রেও চূড়াগুলির সজ্জা হচ্ছে ১২+৮+৪+১। একুনে পঁচিশ রত্ন মন্দির। এর চূড়াগুলিও চারকোণা এবং এদের ছাদ উঁচু নিচু কার্নিসের বিন্যাসে কিছুটা পীঢ়া-শিখরের অনুরূপ।

সোনামুখীর শ্রীধর মন্দিরটিও পঁচিশ চূড়াযুক্ত। তবে এর গঠনটি দ্বিতলের। প্রথম তলেব ৪ কোণে ৩টি করে, এবং ২য় তলের ৪ কোণে ৩টি করে, আর একটি কেন্দ্রীয় চূড়া, একুনে ২৫টি চূড়া। তাই এর উচ্চতা যেখানে প্রায় ২৫´, সেখানে কালনার পঁচিশ চূড়া মন্দির তিনটির উচ্চতা আনুমানিক ৬০´/৬৫´।

মূল মন্দিরটি ৩৬´×৩৬´। তবে পূর্ব ও পশ্চিমদিকের দক্ষিণ প্রান্তকে ৯০° কোণ করে যথাক্রমে পশ্চিম ও পূর্বদিকে ৬´ বাড়ানো হয়েছে। আবার উভয়ের ঐ শেষপ্রান্ত থেকে দক্ষিণ দিকে খিলানের দ্বারা ১০´ বাড়ানো হয়েছে। এই বাড়ানো অংশেই সৃষ্টি করা হয়েছে জগমোহন ও নাট মন্দির।

জগমোহন ও নাটমন্দিরের ছাদ ধাপযুক্ত চারচালার উপর রক্ষিত এবং গর্ভগৃহের ছাদ গম্বুজের উপর স্থাপিত।

গর্ভগৃহের মূল দ্বার ১টি। এর ভিতরের দুই বিপরীতমুখী দরজা দিয়ে যুক্ত পূর্বদিকে শয়নকক্ষ, তার জানালা দুটি। আর পশ্চিমদিকে ভোগকক্ষ।— তার বাইরের দরজা ১টি, আর দু'পাশে দুই জানালা।

ভিতরের উত্তরদিকে রয়েছে সিঁড়ি। ঐ সিঁড়ি উঠে গেছে ৩য় তলে। মন্দিরের বাইরের দিকে পূর্ব ও উত্তরদিকের দেওয়াল গাত্রে ২টি পূর্ণ এবং ২টি অর্ধ স্তম্ভের দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে কৃত্রিম দরজা। ঐ কৃত্রিম দরজা ও জানালা-গুলির কপাল ছোট ছোট প্রতীক শিব মন্দিরের দ্বারা সজ্জিত করা হয়েছে। তাছাড়া, পূর্ব-পশ্চিম ও উত্তরদিকের দেওয়াল গাত্রে রয়েছে একমাত্র ফুলকারি কাজের সজ্জা, মূর্তিসজ্জা নেই।

এই মন্দিরের ত্রি-খিলানযুক্ত দালান একমাত্র সামনের দিকেই নিবদ্ধ। তোরণগুলির তিনটি খিলান ধারণের জন্য মধ্যের দুটি পূর্ণ স্তম্ভ, এবং ধারের দুটি অর্ধ স্তম্ভ রয়েছে। স্তম্ভগুলিতে ফুলকারি কাজ ছাড়াও রয়েছে টেরাকোটার প্রসাধন। যেমন, জগমোহনের পশ্চিম প্রান্তের স্তম্ভে রয়েছে বামাকালীর পূজাচিত্র, আর পূর্বপ্রান্তের খিলানে রয়েছে পাঁঠাবলিসহ দক্ষিণাকালীর

পূজাচিত্র। তাছাড়া অন্যান্য স্তম্ভে রয়েছে কীর্তন শোভাযাত্রা, হিরণ্যকশিপু বধ, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, টিয়া পাখীর সজ্জা ইত্যাদি।

নাটমন্দিরের ভিতরের মূল দ্বারের খিলান শীর্ষে যেখানে প্রতিষ্ঠালিপি রয়েছে তার দুপাশে রয়েছে রাসমণ্ডলের চিত্র।

মন্দিরের পশ্চিমদিকের নিম্নাঙ্গের সমান্তরাল প্যানেলে রয়েছে জন্মের পূর্বে (শ্রীকৃষ্ণের) বসুদেব কর্তৃক বিষ্ণুমূর্তি দর্শন, কংসের কারাগারে রক্ষীদের মায়ানিদ্রা, কৃষ্ণকে নিয়ে বসুদেবের যমুনা পার, নন্দালয়ে শিশুবদল, এবং শ্রীকৃষ্ণের মাতৃদুগ্ধপান। এই শেষোক্ত চিত্রটিকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে বাৎসল্যের শাশ্বতরূপের রস আস্বাদন করা যায়।

ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে 'মৃত্যুলতা'কে দেওয়ালের কোণে বা গায়ে খাড়া করে লাগানোই সর্বত্র প্রচলিত রীতি। এখানেও প্রতি কোণের দুপাশে তা সমতলভাবে নিবদ্ধ। তাছাডা, কামরাঙ্গার পলের মতো যে কোণ একতলার কার্নিস পর্যন্ত উঠে গেছে তাতেও খাড়া করে রক্ষিত।

এছাড়া বিভিন্ন টেরাকোটা কাজের মধ্যে রয়েছে অশ্বমেধ যজ্ঞ, বকাসুর বধ, নৌকাবিলাস, যুদ্ধচিত্র, সেবক কর্তৃক প্রভুকে গড়গড়া দান, বেহালা-বাদনরতা নারী, বন্দুকধারী ফিরিঙ্গী সৈন্য ইত্যাদি। আর এই টেরাকোটার বিন্যাস রয়েছে ১ম তলের কার্নিস পর্যন্ত।

উপরের তলদুটির চারদিকেই রয়েছে খিলানযুক্ত ঢাকা বারান্দা।

এখানে প্রতিদিন নিত্যপূজা হয়। সকালে মাখন ও মিছরি ভোগ, তারপর পূজা, মধ্যাহ্নে ভোগ ও শয়ন, বৈকালে উত্থান এবং সন্ধ্যায় সন্ধ্যারতি ও ভোগ। এই মন্দিরের প্রাচীর বেষ্টনীর মধ্যে রয়েছে তিনটি উপমন্দির। যেগুলি—বদ্রিনারায়ণের মন্দির, রাধাবল্লভজীর মন্দির, এবং রাম সীতা মন্দির।

রামসীতা মন্দির

কৃষ্ণচন্দ্র মন্দিরের বারান্দায় দক্ষিণমুখী হয়ে দাঁড়ালে বামদিকে পড়ে রাম-সীতার মন্দির, ডানদিকে বদ্রিনারায়ণের মূর্তি, আর সামনাসামনি রাধাবল্লভজীর মন্দির।

রামসীতার মন্দিরটি পশ্চিমমুখী। এটি ৫ খিলানের বারান্দাযুক্ত সমতল ছাদের দালানরীতির দেবালয়। এতে গর্ভগৃহ ছাড়াও দু'পাশে রয়েছে দুই

কক্ষ। এর মোট দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ ৪৮´×১৩´। এর গর্ভগৃহকে কেন্দ্র করে ৯½´ এ এক একটি কোণ, মোট ৫টি কোণ সৃষ্টি করে পঞ্চকোণাকৃতি খিলানের আধুনিক বারান্দা সৃষ্টি করা হয়েছে।

এই মন্দিরে পরিবার ও পারিষদসহ রামসীতা রয়েছেন। সবই দারু নির্মিত। উপবিষ্ট অবস্থায় রামচন্দ্রের উচ্চতা প্রায় ২½´।

বদ্রিনারায়ণ ও রাধাবল্লভজীর মন্দির

রামসীতা মন্দিরের যে মাপ ও আকৃতি, সেই একই মাপ ও আকৃতির মন্দির বদ্রিনারায়ণের। এটি পূর্বমুখী। রামসীতা মন্দিরের মুখোমুখী। এখানে রয়েছে নারায়ণের মূর্তি। উচ্চতা প্রায় ৪´। এটি কালো পাথরের উপর 'বা-রিলিফ' পদ্ধতিতে খোদিত ভাস্কর্য।

রাধাবল্লভজীর মন্দিরটি হলঘরের মতো দালানরীতির। খোলা বারান্দা। এর আয়তন ৩৬´×১০´। এর বিগ্রহ কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দিরে স্থানান্তরিত;

বিজয় বৈদ্যনাথ মন্দির

কৃষ্ণচন্দ্র মন্দিরের পিছনেই রয়েছে বিজয় বৈদ্যনাথ নামক শিব মন্দির। এই মন্দিরটি স্বতন্ত্র প্রাচীর বেষ্টনীর মধ্যে স্থাপিত হলেও কৃষ্ণচন্দ্র মন্দিরের প্রাচীর দ্বারের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করে মন্দির প্রাঙ্গন অতিক্রম করেই বিজয় বৈদ্যনাথের মন্দিরে প্রবেশ করতে হতো। অর্থাৎ বৈদ্যনাথ মন্দিরের দ্বার রয়েছে কৃষ্ণচন্দ্র মন্দিরের প্রাচীর বেষ্টনীর মধ্যেই।

মন্দিরটিতে শ্বেত প্রস্তরফলকে লিখিত একটি প্রতিষ্ঠালিপি রয়েছে, যা হয়তো বিনষ্ট মূল প্রতিষ্ঠা ফলকের পরিবর্তে সংস্থাপিত। এটির পাঠ:

কুমার মিত্রসেন—ধর্মপত্নী শ্রিয়ান্বিতা।
লক্ষ্মীদেবী বৈদ্যনাথং সমারাধ্য সুতার্থিনী ॥১॥
ত্রিলোকচন্দ্রং তনয়ং লব্ধা দেব প্রসাদতঃ।
নির্ম্মায় মন্দিরমিদং কারুকার্য্যাসুশোভিতম্ ॥২॥
বিজয়াদি বৈদ্যনাথনাম্নাত্র শিবলিঙ্গকম্।
মহেশ্বরস্য প্রীত্যর্থং স্থাপয়ামাস ভক্তিতঃ ॥৩॥

অর্থাৎ কুমার মিত্র সেনের ধর্মপত্নী শ্রীযুক্তা লক্ষ্মীদেবী বৈদ্যনাথকে আরাধনা করে সুতপ্রার্থী। দেবতার প্রসাদে ত্রিলোকচন্দ্র তনয়কে লাভ করে কারুকার্য-সুশোভিত এই মন্দির নির্মাণ করে মহেশ্বরের প্রীতির জন্য বিজয় আদি বৈদ্যনাথ নামক শিবলিঙ্গটিকে এখানে ভক্তিতে স্থাপন করিয়াছিলেন। আমরা জানি, কুমার মিত্রসেন ছিলেন রাজা চিত্রসেন রায়ের পিতৃব্য। তাঁর পত্নী ত্রিলোকচন্দ্রের জননী বৈদ্যনাথকে আরাধনা করেই ত্রিলোকচন্দ্রকে প্রাপ্ত হন। সেই ত্রিলোকচন্দ্র যখন রাজা হন তখন মানত পূরণার্থেই এই মন্দিরটি নির্মিত হয়। যতদূর মনে হয়, কৃষ্ণচন্দ্র মন্দিরের নির্মাণকালেই এই মন্দিরটি নির্মিত হয়, এবং কৃষ্ণচন্দ্র মন্দিরের অঙ্গীভূত বলেই হয়তো স্বতন্ত্রভাবে এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপিতে সময় উল্লেখিত হয় নি।

মন্দিরটি পূর্বমুখী। এর আয়তন ১৯´×২০´ (বারান্দাসহ)। উচ্চতা প্রায় ৩০´। খিলানযুক্ত ঢাকা বারান্দা। ২টি অর্ধস্তম্ভ এবং ২টি পূর্ণস্তম্ভ দিয়ে তৈরী তিন খোলা দরজা। দরজার দু'পাশ দিয়ে ২ সারি টেরাকোটার কাজ কার্নিস পর্যন্ত উঠে গেছে। পাশেও দুটি সারি নানাবিধ ফুলকারি কাজ নিয়ে উঠে গেছে। আটচাল বিশিষ্ট এই মন্দিরটিতে টেরাকোটা কাজের মধ্যে রয়েছে বীণাবাদনরতা পক্ষী-মানবী, নর্তকী, যুদ্ধযাত্রা, দশ মহাবিদ্যার মূর্তিসমূহ।

এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণবর্ণের শিবলিঙ্গটির উচ্চতা প্রায় ৪½´।

জগন্নাথ ঘাটের জোড়ামন্দির

ছোট দেউড়ি থেকে কোর্টের পথে ডানদিকে পড়ে জগন্নাথ ঘাট। এককালের জাঁকজমকপূর্ণ এই ঘাটে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে জোড়া শিবমন্দির।

পাশাপাশি একই উচ্চতা এবং আকৃতির প্রায় ৭´ উচ্চ দুই পৃথক ভিত্তি-বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত মন্দির দুটি। তবে পাশাপাশি এবং একই সিঁড়ি ব্যবহারের জন্য এই দুটিকে জোড়া মন্দির বলা হয়।

এই মন্দির দুটির সিঁড়িপথ রয়েছে সংলগ্ন। এদের ব্যবধান প্রায় ৩´। দক্ষিণমুখী এই মন্দির দুটির অবস্থান একটি পূর্বে, অন্যটি পশ্চিমে। দুটিই আটচালা রীতির স্থাপত্য। এদের এক একটির আয়তন ১৬´×১৬´। উচ্চতা প্রায় ৪০´। এদের দুটিতেই রয়েছে বেদীসহ প্রায় ৪´ ফুটের মতো কৃষ্ণবর্ণের শিবলিঙ্গ। মন্দির দুটির গর্ভগৃহের বাইরে রয়েছে একটি করে খিলানযুক্ত ঢাকা

বারান্দা। খিলানযুক্ত বারান্দার ছাদ ভল্ট-এর উপর ও গর্ভগৃহের ছাদ ধাপযুক্ত চারচালার উপর প্রতিষ্ঠিত, তার উপর আরও চারচাল প্রতিষ্ঠিত।

পশ্চিমদিকের মন্দিরটি রাজা চিত্রসেনের পত্নীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। এটি সম্ভবত ছঙ্গকুমারীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। প্রতিষ্ঠালিপির পাঠ:

বাণাদ্রি মাতৃকামানে শাকে প্রাসাদমৈষ্টকম্।
চিত্রসেনস্য মহিষী মহেশায় নীবেদয়ৎ॥
শকাব্দা: ১৬৭৫

অন্যদিকে, পূর্বদিকের মন্দিরটির একাংশ বিনষ্ট হওয়ায় এর প্রতিষ্ঠাকাল জানা যায় না। তবে শেষাংশে 'কানীয়সী' শব্দের উল্লেখ থাকায় এটি চিত্রসেনের কনিষ্ঠা পত্নী ইন্দ্রকুমারীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বলে অনুমান করা যেতে পারে। বর্তমানে অস্তিত্বহীন, কিন্তু ১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠালিপির যে অংশের অস্তিত্ব ছিল, তার পাঠ ছিল:

......শাকে রুদ্রায় মন্দিরং
......রাজ্ঞী প্রাদাৎ কানীয়সী।

এই মন্দিরটিও সম্ভবত ছঙ্গকুমারীর মন্দিরের সাথেই একই সময়ে (১৭৫৩ খ্রীঃ) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অর্থাৎ রাজা চিত্রসেনের মৃত্যুর (১৪০০খ্রী:) ১২ বৎসর পরে তাঁরই দুই মহিষী মন্দির দুটি প্রতিষ্ঠা করেন, এবং তা রাজা ত্রিলোকচন্দ্রের রাজত্বকালে।

মন্দির দুটিতে রয়েছে একই ধরনের ফুলকারি কাজ ও টেরাকোটা সজ্জা। ভিত্তিবেদীর উপরে প্রথম সারিতেই, এবং বারান্দার প্রবেশদ্বারের মাথাতেও রয়েছে নানাবিধ ফুলকারি কাজ। তবে দ্বারের নীচের অংশেই টেরাকোটার আধিক্য। এই টেরাকোটার মধ্যে রয়েছে 'ঘোড়াদাবা' জগদ্ধাত্রী মূর্তি, যুধ্যমান অশ্বারোহী ও গজারোহী যোদ্ধা, এক ঘোড়ার টমটম গাড়ী, মকরমুখী নৌকায় নৌকাবিলাস, যুধ্যমান দুই অশ্বারোহী যোদ্ধা, ডুলিতে গড়গড়াসেবী বাবু—পাশে সেবক, বাদ্যদল ও নর্তকী, চিৎ হয়ে যাওয়া হাতীর পাশে নর্তকী, ষাঁড়ে টানা গোযান, সপরিবারে দশভুজা দুর্গা, কদম তলায় দুই সখীসহ কৃষ্ণ, পুতনাবধ, হরিনাম সংকীর্তন, খোলকরতাল সহ নর্তকী, বাঈজী নাচ, তাকিয়ায় হেলান দেওয়া ফরসিসেবী বাবু, লোকলশকর সহ শিবিকবাহিত জমিদার, উটের পিঠে সামরিক বাজিয়ের দল, বেদেবেদিনীদের

কসরতের চিত্র ইত্যাদি। দরজার উপরে রয়েছে হনুমানের মূর্তি। তবে বারান্দার ভিতরের অংশ অলঙ্কারহীন।

অদূরে আর একটি ছোট শিবমন্দির রয়েছে। উচ্চ ভিত্তিবেদীর উপর আটচালার স্থাপত্য। পশ্চিমে ও দক্ষিণে মুখ। পশ্চিমের সাথে সিঁড়ি সংযুক্ত। এই মন্দিরটিব আয়তন ১০´×১০´। ২ ফুটের কৃষ্ণকায় শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত।

জগন্নাথ বাড়ি

জগন্নাথ ঘাটের সন্নিহিত স্থানেই জগন্নাথ বাড়ি। প্রায় ভগ্ন অবস্থায় রয়েছে। প্রতিষ্ঠালিপি না থাকায় এই বাড়ির প্রতিষ্ঠাকাল জানা যায় না। তবে শ্রীযজ্ঞেশ্বর চৌধুরী বলেছেন যে এটি রানী ছত্রকুমারীর প্রতিষ্ঠিত।[১৮]

দালানরীতির পূর্বমুখী জগন্নাথ মন্দিরের গর্ভগৃহটি ছাদহীন অবস্থায় বর্তমান রয়েছে। তার সাথে যে ভোগগৃহটি ছিল তা ধূলিস্যাৎ। এর গর্ভগৃহটির আয়তন দৈর্ঘ্য ২০´× প্রস্থ (বারান্দাসহ) ১৬´। এই মন্দিরে মধ্যেই রয়েছে একই মাপের, এবং একই রীতির দক্ষিণমুখী ছাদহীন (বারান্দার) রামচন্দ্রের মন্দির। এর মুখোমুখী ছিল একই মাপের নাটমঞ্চ, যাধূ লিস্যাৎ। আর প্রাচীর বেষ্টনীর বাইরে প্রবেশদ্বারের মুখোমুখী রয়েছে একটি দক্ষিণমুখী দ্বিতল বাড়ি। যার প্রথম তল ছিল অতিথিশালা বা পুরোহিতের বাসস্থান, আর উপরতল ছিল জগন্নাথের স্নানঘর।

মন্দিরের পূর্বদিকে একটি বাহির পথ রয়েছে। সেই দ্বারের মুখোমুখী একটি পশ্চিমমুখী শিবমন্দির রয়েছে। এর আয়তন ৭´×৭´, এবং উচ্চতা ১১´। জগন্নাথ মন্দিরটি ভগ্ন হওয়ায় জগন্নাথ বিগ্রহকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে রামচন্দ্র মন্দিরের গর্ভগৃহে। এখানে দু'সেট জগন্নাথের বিগ্রহ রয়েছে। তাছাড়া রয়েছে—

কষ্টিপাথরের কৃষ্ণ—১´ (কুঞ্জবিহারী)	রাধা—চুরি হয়ে গেছে
কষ্টিপাথরের রামচন্দ্র—২´	ধাতুর সীতা—চুরি হয়ে গেছে
শ্বেতপাথরের গণেশ—½´	শিব—১½´
শ্বেতপাথরের হনুমান—১´	বালক জগন্নাথ—½´

এছাড়া ছিল একটি অষ্টধাতুর জগন্নাথ মূর্তি, যা বর্ধমানের রাজারা

জোরপূর্বক ভাণ্ডারহাটা (থানা-পূর্বস্থলী) থেকে নিয়ে এসেছিলেন। বর্তমানে সেটি আইনগত কোন কারণে কালনা থানায় রক্ষিত।

আর রয়েছে একটি কাঠের গরুড়। কাঠের রথ রয়েছে। রথযাত্রার সময় রথের টান হয়। নিত্যপূজা চলে।

অনন্ত বাসুদেব মন্দির

সিদ্ধেশ্বরী বাড়ির অদূরে রাস্তার বিপরীতে অনন্ত বাসুদেবের মন্দির। মন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপিতে বলা হয়েছে—

রসাব্ধি রস-চন্দ্রাঙ্ক গণিতে-অব্দে শকাবধি।
চক্রে বৈকুণ্ঠনাথস্য মন্দিরম্ সুমনোহরম্ ॥
জগদ্রায়স্য মহিষী কৃত্তিচন্দ্র-নৃপ প্রসূ।
শ্রীশ্রীত্রিলোকচন্দ্রস্য নৃপতের্যা পিতামহী ॥

এই লিপি অনুসারে মন্দিরের নাম বৈকুণ্ঠনাথের মন্দির। এই মন্দিরটি ১৬৭৬ শকাব্দে (১৭৫৪ খ্রীঃ) প্রতিষ্ঠা করেন জগৎরাম রায়ের পত্নী কীর্তিচন্দ্রের মাতা রাজা শ্রীশ্রীত্রিলোকচন্দ্রের পিতামহী। অর্থাৎ রাজা ত্রিলোকচন্দ্র তাঁর পিতামহী ব্রজকিশোরীর নামে এই সুমনোহর বৈকুণ্ঠনাথের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

এই মন্দিরের অনন্ত বাসুদেবের মূর্তিটি কালো পাথরের পাটার উপর 'বা-রিলিফ' পদ্ধতিতে খোদিত ভাস্কর্য। এতে বাসুদেব গরুড়ের উপর দণ্ডায়মান। ডানদিকে লক্ষ্মী ও পাঁচ অবতার। বামে সরস্বতী ও পাঁচ অবতার। মাথার উপর নৃসিংহ। সবই একই প্যানেলে খোদিত। মূর্তিগুলিতে রঙিন 'ফ্রেসকো'র আভাস দেখা যায়।

এই মূর্তি ছাড়াও অন্য তিনটি সিংহাসনে রয়েছেন :

প্রথম সিংহাসনে—অষ্টধাতুর নৃসিংহ মূর্তি (উৎসঙ্গে লক্ষ্মী), অষ্টধাতুর দুই গোপাল ও দারু নির্মিত জগন্নাথ।

দ্বিতীয় সিংহাসনে—মৃৎ রাধাবল্লভ, অষ্টধাতুর রাধারাণী—গোপীনাথ, গিরিধারী (শিলা) ও দারু নির্মিত জগন্নাথ।

তৃতীয় সিংহাসনে—রাধাগোবিন্দ, রাধারাণী, দারু নির্মিত মহাপ্রভু, গৌর-গদাধর ও নারায়ণ শিলা।

মন্দিরটি দক্ষিণমুখী। পূর্বদিকেও একটি দরজা আছে। এটি উচ্চ ভিত্তিবেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত আটচালা রীতির স্থাপত্য। এর তিন খিলানযুক্ত দালানের ছাদ 'ভল্‌ট' এর উপর এবং গর্ভগৃহের ছাদ গম্বুজের উপর স্থাপিত। এর উচ্চতা প্রায় ৫০´। এবং আয়তন ২৭´×২৫½´।

বাঁকুড়া জেলায় উপরের চারচালাটি নীচের চারচালা থেকে অতি অল্প ব্যবধানে নির্মিত হওয়ায় ওখানকার আটচালা মন্দিরগুলি কিছুটা খর্ব দেখায়। এখানে কিন্তু তা নয়।

ঢাকা বারান্দাযুক্ত এই মন্দিরের খিলানগুলিতে রয়েছে নানাবিধ ফুলকারি কাজ, রথমধ্যস্থ শিবলিঙ্গ, শিকার দৃশ্য এবং দেবদেবীর মূর্তি। এই টেরাকোটার কাজ ছাদের বাঁকানো কার্নিসের তলা পর্যন্ত গেছে। তবে সিমেণ্টের প্রলেপ দিয়ে সংস্কার করার ফলে অনেক অলঙ্করণ সজ্জা আবরিত হয়েছে। এর সামনেই রয়েছে নাটমন্দির, যা পুনঃনির্মিত। পূর্বে এই মন্দিরের পশ্চিমে একটি দরজা ছিল। ঐ পশ্চিমদিকেই রয়েছে একটি শিবমন্দির। প্রথানুযায়ী ঐ শিবমন্দিরটি হয়তো অনন্ত বাসুদেব মন্দিরেরই অঙ্গ ছিল।

গিরি গোবর্ধন মন্দির

লালজী বাড়ির ভিতরেই রয়েছে গিরি গোবর্ধন মন্দির। এর প্রতিষ্ঠালিপি রয়েছে কালো স্লেট পাথরের। বাংলা ও রাজস্থানী ভাষায় লিখিত। এই জীর্ণ হয়ে যাওয়া প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায় যে ১৬৮০ শকাব্দে (১৭৫৯ খ্রীঃ) এই মন্দিরটির প্রতিষ্ঠা হয়। এই লিপিতে কৃষ্ণরাম, জগৎরাম, ব্রজকিশোরী, কীর্তিচন্দ্র, মিত্রসেন এবং ত্রিলোকচন্দ্রের নাম রয়েছে। সময়ের দিক থেকে ত্রিলোকচন্দ্রের রাজত্বকালেই এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এবং রাজা ত্রিলোকচন্দ্র, কৃষ্ণরাম, জগৎরাম, ব্রজকিশোরী, কীর্তিচন্দ্র এবং মিত্রসেনের নামে মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করে লালজী মন্দিরকে বিবর্দ্ধিত করা হচ্ছে। এ এক অভিনব নির্মাণ রীতির নিদর্শন। কৃষ্ণের গিরিগোবর্ধন ধারণের সুপরিচিত কাহিনীটির অনুসরণে দেবগৃহের চালা প্রচলিত কোন পদ্ধতিতে তৈরী না করে বড় বড় শিলাখণ্ডের আকারে বিন্যস্ত। অর্থাৎ কৃষ্ণের গোবর্ধন ধারণের প্রতীক স্বরূপ চালার বাইরের অংশ ইঁট চুন বালির তৈরী বড় বড় শিলাখণ্ডের অনুকৃতি দিয়ে ঢাকা।

বারান্দাহীন খোলা দ্বার যুক্ত এই মন্দিরের ভিতরের দেওয়ালে নিবদ্ধ চুন-বালির রঙিন ফ্রেসকোর কাজের অন্তর্ভুক্ত নৌকাবিলাস, বস্ত্রহরণ, সারিবদ্ধ-গোরুর পাল, যশোদার গোদোহন ইত্যাদি অতিকায় মূর্তিগুলি অভিনব।

এই মন্দিরের আয়তন ২৪২´×১০´। এবং উচ্চতা প্রায় ১৬´। এর মাথার উপরে নিবদ্ধ রয়েছে বড় আকারের চুন সুরকির দুটো ময়ূর, দুটো কুমীর, দুটো মাছ, দুটো সিংহ, দুটো সর্প, কিছু শিব মূর্তি, সিংহ, ঋষি, সাধ্বী, হনুমান ইত্যাদি।

রূপেশ্বর শিবমন্দির

লালজী বাড়ির পাশেই দক্ষিণমুখী দালানরীতির একটি শিবমন্দির রয়েছে। এটি অনুচ্চ ভিত্তিবেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত। এর আয়তন ১৮´×১৫´। এর মধ্যে ৪২´ এর মতো কৃষ্ণবর্ণের শিবলিঙ্গ রয়েছে।

খিলানের এক দালান বিশিষ্ট এই স্থাপত্যকে রূপেশ্বর শিবমন্দিব নামে অভিহিত করা হয়। এর প্রতিষ্ঠালিপিতে বলা হয়েছে—

শ্রীরাম প্রতিম মহাগুণময়স্ত্রৈলোক্যচন্দ্রো নৃপ
স্তস্যাস্তে নৃপশেখরস্য মহিষী জ্যেষ্ঠা ধরিত্রী সুতা।
সাকার্যী ত্রিপুরান্তকস্য ভবনং কৈলাস শৈলোপমং
শাকে তত্র রসাষ্টষড়বনিমে চাপেয়মার্তণ্ডকে ॥

শকাব্দা ১৬৮৩

অর্থাৎ রামপ্রতিম মহাগুণের অধিকারী রাজা ত্রিলোকচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা মহিষী রূপকুমারী দেবী ১৬৮৩ শকাব্দে (১৭৬১ খ্রীঃ) কৈলাস পর্বতের তুল্য ত্রিপুরারি শিবের ভবন নির্মাণ করেন।

পঞ্চশিব মন্দির

রূপেশ্বর শিবমন্দিরের পাশেই রয়েছে ছোট আকৃতির আটচালা রীতির পঞ্চশিব মন্দির। এগুলি সমতল ভিত্তিবেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত। এদের দক্ষিণ দিক থেকে পর পর চারটির মুখ পশ্চিমদিকে, শেষেরটি পূর্বদিকে। এদের মধ্যে দক্ষিণ দিক থেকে দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি অপেক্ষাকৃত বড়। এদের প্রতিষ্ঠা-লিপি ছিল। কিন্তু বর্তমানে একেবারেই ক্ষয়প্রাপ্ত।

শ্রীযজ্ঞেশ্বর চৌধুরী বলেছেন যে কালনা রাজবাড়ির মধ্যে তেজচন্দ্রের পঞ্চম পত্নী রানী কমলকুমারীর প্রিয় সহচরী দেবকী দেবীর প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির এখনও অটুট আছে। রেখ দেউল রীতিতে নির্মিত এই মন্দিরে কোনও টেরাকোটার সজ্জা নেই। লিপি থেকে জানা যায়, মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকাল ১৭৬৭ শকাব্দ (১৮৪৫ খ্রীঃ)। লিপির পাঠ :

শুভমস্তু শকাব্দা ১৭৬৭। / কাশীনাথ মন্দির/শ্রীদেবকী দেবী ॥[১৯] অন্যদিকে, পঞ্চমন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপির অবশেষ থেকে জানা যায় যে তৃতীয়টির নাম কাশীনাথ মন্দির। সুতরাং ইহা নিশ্চিত করে বলা যায় যে পঞ্চ মন্দিরের তৃতীয় মন্দিরটিই শ্রীদেবকী দেবীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। তবে এই মন্দির রেখ দেউল রীতির, এ তথ্য সঠিক নয়। কারণ প্যারীকুমারীর জলেশ্বর (প্রতাপেশ্বর) মন্দির এবং মাইজী বাড়ির একটি মন্দির ছাড়া রেখ দেউল রীতির ৩য় মন্দির কালনাতে আর নেই।

এই কাশীনাথ মন্দির ছাড়াও শ্রীযজ্ঞেশ্বর চৌধুরী আরও কয়েকটি মন্দিরের উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে রাজবাড়ির মধ্যে একটি আটচালা মন্দির আছে। তবে তার প্রতিষ্ঠালিপির অধিকাংশই ভেঙ্গে যাওয়ায় প্রতিষ্ঠাতার নাম পড়া যায় নি। 'বর্ধমান-রাজবংশানুচরিত্র' গ্রন্থ অনুসারে ঐ শিবমন্দিরটি রাজা ত্রিলোকচাঁদের দ্বিতীয়া রানী বিষণকুমারী দেবীর প্রতিষ্ঠিত। লিপির পাঠ :

বাণ নাগরসেন্দৌ চ শকাব্দে সোমবাসরে।
মধুমাসে সিতে পক্ষে শুভলগ্নেষ্টমী তিথৌ ॥
মহাবিষুব সংক্রান্ত্যাং দিনে ত্রিংশত্তমেপি চ।
······স্থাপিতং বহু যত্নতঃ ॥ শকাব্দা ১৬৮৫

অর্থাৎ, ১৬৮৫ শকাব্দের (১৭৬৩ খ্রীঃ) ফাল্গুন মাসের ৩০শে, শুক্লপক্ষে অষ্টমী তিথিতে, মহাবিষুব সংক্রান্তির প্রথম দিনে মন্দিরটি স্থাপিত হয়।

শ্রীযজ্ঞেশ্বর চৌধুরী আর একটি কাশীনাথ শিবমন্দিরের উল্লেখ করেছেন যা মহারানী বিষণকুমারীর প্রিয় সহচরী তুলসীদেবী কর্তৃক ১৬৮৭ (১৭৬৫ খ্রীঃ) শকাব্দে প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরটির শিলালিপিতেই তার প্রমাণ আছে :

অব্ধিব সুরমেন্দৌশ্চ শকাব্দেচোত্তহায়ণে।
ইহার্পিতং শিবাগারং শ্রীতুলস্যা দ্বিজাজ্ঞয়া॥ শকাব্দা ১৬৮৭

শ্রীযজ্ঞেশ্বর চৌধুরী বলেছেন যে কাশীনাথ মন্দিরের অনতিদূরে রানী কমলকুমারীর অপর এক সহচরী গঙ্গাদাসীর ১৭৫৪ শকাব্দে (১৮৪২ খ্রীঃ) প্রতিষ্ঠিত এক শিবমন্দির আছে। প্রতিষ্ঠালিপির পাঠ :

শকাব্দে বেদেষু ক্ষিতিধর শশাঙ্ক গণিতে
মহারাজ্ঞা ভার্য্যা হি কমলকুমার্য্যা অনুচরী।
ইদং গঙ্গদাসী শিবসদনস্মিন্ সমকবোৎ
ভবাব্দে পরার্থং ভবভজনধী স্থাপনবতী॥ শকাব্দা ১৭৫৪।[২০]

এখানে শ্রীযজ্ঞেশ্বর চৌধুরীর উল্লেখিত মন্দিরগুলিই যে পঞ্চ মন্দিরেরই অন্তর্ভুক্ত তা নিশ্চিত করে বলা যায়। এদের মধ্যে কোন টেরাকোটার সজ্জা নেই। একটি মন্দির কিছুটা বসে গেছে।

রামেশ্বর শিবমন্দির

বড়বাজার থেকে রাজবাড়িতে ঢুকতেই গেটের ডানদিকে প্রতিষ্ঠিত রামেশ্বর শিবমন্দির। পূর্বে শুভ্র লিঙ্গের শিব প্রতিষ্ঠিত ছিল। বর্তমানে অন্তর্হিত। এটি বিজয় আদি বৈদ্যনাথের মতো একই আকৃতির মন্দির। সমতল ভিত্তি-বেদীর উপর আটচালা রীতির। ঢাকা বারান্দাসহ মূল দরজা দক্ষিণমুখী। পূর্বেও রয়েছে একটি দরজা। উচ্চতা প্রায় ৩০´। আয়তন ১৬´×১৬´। এতে টেরাকোটার কাজ বলতে কিছুই প্রায় নেই। তবে কিছু ফুলকারি কাজ রয়েছে। মূল দরজার নিম্নাঙ্গের দুইপাশের কোলঙ্গায় মূর্তিতে হনুমানের মূর্তি। এরও প্রতিষ্ঠালিপি রয়েছে। লিপির পাঠ :

বাণ ব্যোম ধরাধরেন্দু গণিতে শাকে শশাঙ্কে প্রভ-
শ্রীকণ্ঠস্য নিবাস-মন্দিরমিদং রাধাপতি প্রীতয়ে।
ধীর শ্রীযুত তেজচন্দ্র ধরণী ধৌরেয় চূড়ামণে-
র্ম্মাতা সম্প্রতি নির্ম্মমে সুরসরিৎ ক্ষেত্রেহম্বিকাখ্যে পুরে॥

১৭০৫ শক

অর্থাৎ এই মন্দিরটি মহারাজ তেজচন্দ্রের জননী ১৭০৫ শকে (১৭৮৩ খ্রীঃ) প্রতিষ্ঠা করেন।

১০৮ শিব মন্দির

লোককথাতে এই মন্দির ১০৮ শিবমন্দির বলেই প্রসিদ্ধ। কিন্তু প্রতিষ্ঠা-লিপি অনুসারে এটি ১০৯ শিবমন্দির, এবং এর নাম হচ্ছে নবকৈলাস মন্দির। এর প্রতিষ্ঠালিপিতে বলা হয়েছে—

শাকে চন্দ্র শিবাক্ষি সপ্ত কুমিতে শ্রী
তেজচন্দ্রাভিধোবা সূর্য্যইব স্থি
রার্পিত চলচ্চণ্ড প্রতাপানলঃ
শম্ভোর্ধাম পরম নবাধিকশত শ্রী
মন্দিরৈর্মণ্ডলম্ প্রাকার্ষীন্মহদ
অম্বিকাখ্য নগরে কৈলাসমেতৎ নবং।

অর্থাৎ এই 'নবাধিক শত' মন্দিরটি ১৭৩১ শকাব্দে অর্থাৎ ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজা তেজচন্দ্র কর্তৃক নির্মিত হয়। এই মন্দির নির্মাণের পূর্বেই 'শাকে শূন্য শশাঙ্ক শৈল কুমিতে' অর্থাৎ ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমানের নবাবহাটে তেজচন্দ্রের মাতা বিষণকুমারী 'নবাধিকশতং' শ্রীমন্দির নির্মাণ করেন। তবে দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য—নবাবহাটের ১০৯টির মধ্যে ১০৮টি সমতলভূমিতে চতুষ্কোণ ক্ষেত্রের আকার নিয়ে বিন্যস্ত। আর বহির্দেশে একটি। এবং সবই কৃষ্ণবর্ণের শিবলিঙ্গ। আর কালনার ১০৯টির মধ্যে ১০৮টি জ্যামেতিক বৃত্তে বিন্যস্ত। বাইরের বৃত্তে ৭৪টি, এবং ভিতরের বৃত্তে ৩৪টি। আর বহির্দেশে একটি। এটি দুটি বৃত্তে বিন্যস্ত বলে এর বেষ্টনীর আয়তন বর্ধমানের মন্দিরের বেষ্টনীর আয়তনের চেয়ে কম।

বর্ধমানের মন্দির বেষ্টনীর মধ্যে রয়েছে বাঁধানো ঘাট সমেত দুটি পুষ্করিণী। আর কালনার মন্দিরের ভিতরের বৃত্তের মধ্যে রয়েছে একটি বৃহৎ ইঁদারা। এটিকে 'শূন্য অর্থাৎ নিরাকার' ব্রহ্মস্বরূপ পরম শিবের প্রতীক বলা যায়। অবশ্য নবাবহাটের মন্দির বেষ্টনীর মধ্যে বাঁধানো ঘাট সমেত দুটি পুষ্করিণীর অবস্থান থেকে মনে হতে পারে, কালনার মন্দিরের অভ্যন্তরস্থ ইঁদারাটি সংযোজিত হয়েছে মন্দিরের পূজাপার্বণের স্বার্থে, কোন তত্ত্বের স্বার্থে নয়।

কালনার বাইরের বৃত্তের শিবলিঙ্গগুলি একটি কৃষ্ণবর্ণের, পরেরটি শুভ্রবর্ণের—এই পর্যায়ক্রমে ৭৪টি শিবলিঙ্গ বিন্যস্ত। আর ভিতরবৃত্তের শিবলিঙ্গগুলি সবই শুভ্রবর্ণের, এবং বহির্দেশে মন্দিরের পশ্চিমদিকে (তেঁতুলতলাগামী রাস্তার

তেমাথায়) যে ১০৯ সংখ্যক শিবলিঙ্গটি রয়েছে, যার শিলালিপিটিতে ১০৯ সংখ্যাটি চিহ্নিত, তার শিবলিঙ্গটি কৃষ্ণবর্ণের।

এখানে এই যে দুই বৃত্তের শিবলিঙ্গগুলির বিন্যাস, এই বিন্যাসের ক্ষেত্রে বিশেষ তত্ত্ব থাকতে পারে। কারণ, তেজচন্দ্র এই সময় কমলাকান্তের মতো সাধকের সংস্পর্শে এসেছিলেন। তাই হয়তো এই মন্দির প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রয়েছে বিশেষ তত্ত্ব।

ডঃ অমরপ্রসাদ ভট্টাচার্য তাঁর 'ভগবান্ মহেশ্বর শিবের স্বরূপ উদ্ধার' নামক প্রবন্ধে ব্রহ্মসংহিতা, বায়ুপুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রের এবং মহামহোপাধ্যায় ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ প্রণীত 'তান্ত্রিক সাধনা ও সিদ্ধান্ত' গ্রন্থের অনুসরণে বলেছেন যে শিবপূজার মন্ত্রে তাঁর ব্যাপক ন্যাসে আছে - "চতুর্মূর্তিব পুষ্কায় ভাসিতাঙ্গায় শম্ভবে"। এখানে 'চতুর্মূর্তিবপুষ্কায়' কথাটি লক্ষণীয়। এই কথার অর্থ—শিবের চারটি মূর্তি বা রূপ। সেই চার বিগ্রহ মূর্তি বা প্রকাশের মধ্যে ভগবান্ 'পরম শিব' ত্রিগুণাতীত, নীরূপ, নিরাকার, নির্বিকার, নিরঞ্জন। 'সদাশিব' বিশুদ্ধসত্তময়, চিদুজ্জ্বল, শুভ্রদেহধারী। পঞ্চানন ত্রিগুণাত্মক, গুণত্রয়যুক্ত, ত্রিবিধ অহঙ্কারযুক্ত ও ররোগুণ প্রধান বলে রক্তবর্ণদেহধারী। আর ভগবান্ 'রুদ্র' গুণত্রয়যুক্ত কিন্তু তমোগুণপ্রধান, তাঁর বর্ণ কৃষ্ণ। ভগবান্ 'সদাশিব' বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণান্বিত বলে ধর্ম, জ্ঞান ও মোক্ষদাতা। ভগবান্ 'পঞ্চানন' রজোগুণ প্রধান বলে অর্থ ও কামদাতা।[২১] সুতরাং রূপতত্ত্বের দিক থেকে বলা যায়, কালনার ১০৯ মন্দিরের শুভ্রবর্ণের শিবগুলি হচ্ছেন ভগবান সদাশিবের প্রতীক, আর কৃষ্ণবর্ণের শিবগুলি হচ্ছেন রুদ্রের প্রতীক।

প্রথম বৃত্তে ভক্ত পর্যায়ক্রমে দেখেন ভগবান রুদ্র ও সদাশিব মূর্তি। অর্থাৎ প্রথম অবস্থায় ভক্তের চোখে ভগবান পর্যায়ক্রমে রুদ্র ও সদাশিবের মূর্তিতে ধরা দেন। পরিণামে ভক্ত বৈকুণ্ঠের অন্তর্গত তমোগুণ সম্বন্ধরাহত যে শিবলোক, সেখানে পৌঁছে যান, এবং সর্বত্রই সদাশিবের মূর্তি প্রত্যক্ষ করেন।

এখন প্রশ্ন, কেন এই ১০৯ মূর্তি? এক্ষেত্রে শ্রীযজ্ঞেশ্বর চৌধুরী বলেছেন যে জপমালায় যেরূপ ১০৮টি বীজ গ্রথিত থাকে, এবং মধ্যস্থলে ঈষৎ বড় আকারের একটি বীজ মেরুস্বরূপ থাকে—এই শিবক্ষেত্র নির্মাণের সময় উক্ত বিধান মানা হয়েছিল।[২১(ক)] কিন্তু এই বিধান যদি মানা হতো তবে ১০৯ নং মন্দিরটি

মন্দিরদ্বারের সামনাসামনি অদূরবর্তী স্থানে প্রতিষ্ঠিত হতো, তা প্রবেশ পথের ডানদিকে অতটা দূরে প্রতিষ্ঠিত হতো না।

এক্ষেত্রে বলা যায়, ষোড়শ শতাব্দীর আইন-ই-আকবরী থেকে প্রথম জানা যায় যে দেবীর দেহাংশ থেকে চতুষ্পীঠের উৎপত্তি।[২২] সেই সূত্রপাত। তা থেকে রুদ্রযামলে ১০টি পীঠ, কুলার্ণবতন্ত্রে ১৮টি পীঠ, কুব্জিকাতন্ত্রে ৪২টি পীঠ, জ্ঞানার্ণবতন্ত্রে ৫০টি পীঠ, শিবচরিতে ৫১টি পীঠ, এবং দেবী ভাগবতে মূলতঃ ১০৮টি পীঠের কল্পনা। অবশ্য যদিও আরম্ভ 'নামষ্টোত্তরশতম্' দিয়ে, কিন্তু কার্যতঃ লেখকের অতি উৎসাহে ১০৮-এর বদলে এসে গেছে ১১০টি নাম। এই ১১০ (মূলতঃ ১০৮) পীঠে যখন ১০৮টি দেবী রয়েছেন, সেক্ষেত্রে ১০৮টি শিবও রয়েছেন।

অম্বিকা কালনায় মূল মন্দিরটির উত্তর-পশ্চিম (বায়ু) কোণে ১০৯ সংখ্যক মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। অন্যদিকে, একই আকৃতি বিশিষ্ট আর একটি মন্দির প্রতিষ্ঠিত রয়েছে উত্তর-পূর্ব (ঈশান) কোণে। এ থেকে বলা যায়, দেবী-ভাগবতের ১১০টির অনুসরণে এখানে ১০৮+২=১১০টি শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু তা বলা যাচ্ছে না এই কারণেই যে মন্দিরটির প্রতিষ্ঠালিপিতে 'নবাধিক শত' অর্থাৎ ১০৯টি মন্দিরের কথাই বলা হয়েছে! অবশ্য কেউ কেউ 'নবাধিক শত' অর্থে ১০৯-এর অধিক মনে করেন। কিন্তু পঞ্চদশ-এর ব্যাসবাক্য ভাঙ্গলে যেমন 'পঞ্চ অধিক দশ' হয়, যার অর্থ পনের। তেমনই 'নব অধিক শত= নবাধিক শত' কথার অর্থ একশত নয়। সুতরাং যাঁরা ১০৯-এর অধিক মনে করে থাকেন, তাঁরা ভ্রান্তিবশতই মনে করে থাকেন। এক্ষেত্রে প্রশ্ন থাকে, তা যদি হয় তবে ১০৮টি বা ১১০টির পরিবর্তে কেন ১০৯টি মন্দির প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে? এক্ষেত্রে বলা যায়, দেবী ভাগবতে মূলতঃ ১ ৮টি (অতি উৎসাহে দুটির বৃদ্ধি) দেবীস্থানের উল্লেখ আছে। এর সাথে জড়িয়ে আছে দেবীর দেহপতনের কল্পনা। সেই সূত্রে ১০৮টি শিবের প্রতিষ্ঠা। আর আদিতে একটি শিব। যিনি সতীর দেহ কাঁধে করে উন্মত্ত হয়েছিলেন। এই একুনে ১০৯টি শিব। এই ১০৯-এর তত্ত্ব বর্ধমান, এবং কালনার মন্দির প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রয়েছে। তবে বর্ধমানের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় কোন তত্ত্ব নেই, যা আছে কালনার ক্ষেত্রে। আর সেই তত্ত্ব পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। তবে তার ব্যাখ্যাকে আরও স্পষ্ট করা যেতে পারে।

শ্বেতবর্ণ শিবের অর্থ—তিনি চৈতন্য, জ্ঞান। আর কৃষ্ণবর্ণ শিবের অর্থ—তিনি বোধের অতীত।

১০৯ সংখ্যক শিব রয়েছেন সাধন বৃত্তের বাইরে। সাধন বৃত্তের বাইরে থেকে ভক্ত বোধের অতীত যিনি তাঁর স্বরূপ শক্তিকে উপলব্ধি করতে পারেন না। ভক্ত যখন প্রথম সাধন বৃত্তে প্রবেশ করেন তখন ভক্ত প্রথম অবস্থায় একবার তাঁর স্বরূপকে উপলব্ধি করতে পারেন না, পর মুহূর্তে তাঁর চৈতন্য তথা জ্ঞান-স্বরূপকে উপলব্ধি করেন। ভক্তের উপলব্ধির ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে এই অবস্থা চলতে থাকে। এই অবস্থা চলতে চলতে ভক্ত যখন দ্বিতীয় সাধন বৃত্তে প্রবেশ করেন তখন সেই অবস্থায় তাঁর স্বরূপ আর ভক্তের কাছে অবোধ্য থাকে না। তিনি ভক্তের উপলব্ধিতে জ্ঞান তথা চৈতন্য স্বরূপে প্রতিভাত হন। ভক্তের চৈতন্য তখন বৈকুণ্ঠের অন্তর্গত তমোগুণ সম্বন্ধরহিত যে শিবলোক, সেই শিবলোকে সর্বত্রই সদাশিবের মূর্তি প্রত্যক্ষ করেন। আর যদি ইঁদারাটি নিরাকার ব্রহ্মস্বরূপ পরম শিবের প্রতীক হয়, তবে সাধক শিবলোকের উর্ধ্বে ব্রহ্মলোকে উঠে ব্রহ্মস্বরূপ পরম শিবকে প্রত্যক্ষ বা উপলব্ধি করেন।

মন্দিরগুলি আটচালা মন্দির। চারচালের উপরে ক্ষুদ্রাকৃতি আরেক চারচালা। উচ্চতা প্রায় ২০´, এবং প্রস্থ ৯½´। সেদিক থেকে ১ম বৃত্তের ভিতর দিকের পরিধি প্রায় ৭১০´ এবং ২য় বৃত্তের ভিতর দিকেব পরিধি প্রায় ৩৩৬´।

১০৯ সংখ্যক মন্দিরটি ৬ ফুট উচ্চ ভিত্তিবেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত পঞ্চরত্ন মন্দির। এর ছাদের চারকোণে ৪টি চূড়া, মাঝে অপেক্ষাকৃত বড় চূড়া। এর মধ্যে সিঁড়ি রয়েছে। বারান্দায় উঠতে ৮টি সিঁড়ি। এর আয়তন ১৩´×১৩´। উচ্চতা প্রায় ৩৫´। এই একই আকৃতি ও মাপের মন্দির রয়েছে মূল মন্দিরের বহির্দেশে পূর্বদিকে। এর নাম রত্নেশ্বর মন্দির। পূর্বেই বলেছি যে এর সাথে নবকৈলাস মন্দিরের তথা ১০৯ শিব মন্দিরের কোন সম্পর্ক নেই, অবশ্য এটি 'দেবী ভাগবতের' অনুসরণে পরবর্তী সময়ে সংযোজিত হতে পারে।

১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে রাজা তেজচন্দ্র সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর অভি-ভাবিকারূপে রাজ্য শাসন করতে থাকেন তাঁর মাতা বিষণকুমারী। ১৭৭৬ থেকে ১৭৭৯—এই তিন বছর বর্ধমানের জমিদারী কার্যতঃ গ্রাহাম ও ব্রজকিশোরের হাতে ছিল। ১৭৭৯-তে তেজচন্দ্র সাবালক হয়ে জমিদারীর অধিকার ফিরে পান।

যুবক তেজচন্দ্র ছিলেন উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবের। উচ্ছৃঙ্খল স্তাবকবৃন্দ তাঁকে সঙ্গ দিত। আবদুল গনি খান বলেছেন যে তেজচন্দ্র নাবালক হয়ে রাজকার্য নিজ হাতে নেওয়ায় মহারানী বিষণকুমারী অধিকাংশ সময় অম্বিকা কালনায় থাকতে লাগলেন।[২৩] ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দে অক্ষম রাজা তেজচন্দ্র পুনরায় বিষণকুমারীকে রাজকার্য পারচালনাব ভার দেন। ১৭৯৮-এ বিষণকুমারীর মৃত্যু। এরপর তেজচন্দ্র সংযত হন, এবং রাজকার্যে মনোনিবেশ করেন। এরপর তিনি ক্রমেই ধর্মানুরক্ত হয়ে ওঠেন। আর তাব প্রথম পরিচয় কালনার ১০৯ শিব মন্দির বা নবকৈলাস মন্দির।

রাজবাড়ি

১০৮ শিবমন্দিব প্রতিষ্ঠার একই বৎসবে অর্থাৎ ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজবাডি নির্মিত হয়। এটি লালজী মন্দিবেব পাশেই। পূর্বে কীর্তিচন্দ্র, চিত্রসেন এবং ত্রিলোকচাঁদের আমলে একটি বাসগৃহ থাকলেও রাজবাডিটি তৈরী হয় রাজা তেজচন্দ্রের সময়। রাজবাডির প্রবেশ পথের উপরে নিবদ্ধ লিপিব পাঠ :

মুক্তা হেম প্রবালৈ রজত দববরৈ স্ফটিকে রত্নসংঘৈঃ
পূগৈঃ সিন্দুর চন্দ্রৈরগুরু ঘটপটৈশ্চাময়াদ্যৈঃ প্রপূর্ণা।
শাকে শুভ্রাংশুবহ্নি ক্ষিতিধর কুমিতে তেজচন্দ্রস্থরাজ্ঞঃ-
পূর্ভূ'তা সাম্বিকাখ্যা স্থর নগব সরিত্তীর পূর্য্যাংচ কান্তি॥

শকাব্দা ১৭৩১

অর্থাৎ ১৭৩১ (১৮০৯ খ্রীঃ) শকাব্দে সুরনগর অম্বিকায় রাজা তেজচন্দ্র মুক্তা স্বর্ণ প্রবাল রজত স্ফটিক রত্নসহিত মৃগ সিন্দুর চন্দ্র গুরুঘট দ্বারা পরিপূর্ণ এই রাজবাড়ি নির্মাণ করেন। এর দুদিকে এখনও দুটি সুউচ্চ ও সুসজ্জিত তোরণ বর্তমান।

পুরাতন সমাজবাড়ি

ভাঙ্গাপাড়ায় পুরাতন সমাজবাড়ি প্রতিষ্ঠিত। পশ্চিম দেশীয় রীতি অনুযায়ী পাথরের আধার বা তাম্রকলসে চিতাভস্মসহ মৃতের কিছু প্রিয়দ্রব্য সমাজ বাড়িতে রক্ষিত হয়। এই সমাজবাড়িতে দুটি সমাধি মন্দির রয়েছে। একটি রাজা তেজচন্দ্রের, অন্যটি তাঁর মহিষী কমলকুমারীর। প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায়, একটির প্রতিষ্ঠা ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দ, অন্যটির ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ।

কমলকুমারীর সমাধি মন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপিতে বলা হয়েছেঃ ১৭৮৩ শকে ২২ মাঘে চতুর্দশ মহামহীন্দ্র শ্রীশ্রীমহতাবচন্দ্র বাহাদুরের মাতা পর ব্রহ্মলীনা মহারানী কমলকুমারী দেবীর নিজ পতি মহারাজ তেজচন্দ্র বাহাদুরের সমাধি মন্দিরের সন্নিধানে এই সমাধি মন্দির স্থাপিত হইল।

দেওয়ান—পরাণচন্দ্র বাবুজী

তেজচন্দ্রের সমাধি মন্দিরটি দালানরীতির। এর প্রথমতলের চারকোণে চারটি চূড়া। এই চারচূড়ার মাঝে অপেক্ষাকৃত ছোট হয়ে ২য় তল উঠে গেছে। এর ছাদে চারকোণে ৪টি চূড়া, এবং মাঝে অপেক্ষাকৃত বড় একটি চূড়া। অর্থাৎ এটি একটি নবরত্ন মন্দির। এর চূড়া সজ্জা হচ্ছে ৪+৪+১। এরও প্রতিষ্ঠালিপি রয়েছে। নিবদ্ধ লিপির পাঠঃ

নৃপতি শকাদিত্যস্যাতীতাব্দা ১৭৫৪/৪/১/১৪
শকাব্দে বেদবাণাচলবিধুবিমিতে ভাদ্রমাসে ভুজাহে
স্বর্ধুন্যাং ন্যস্যকায় পরপদমগমদ যো নৃপস্তেজচন্দ্রঃ।
তৎ প্রীত্যা অম্বিকায়াং নৃপমুকুটমণি শ্রীমহতাবচন্দ্রো
বাটিং চক্রে সমাধেবিহ কমলকুমার্য্যা স্বমাতুর্নিদেশাং॥

অর্থাৎ ১৭৫৪ (১৮৩২ খ্রীঃ) শকাব্দের ২রা ভাদ্র তেজচন্দ্রের মৃত্যুর পর কমলকুমারীর নির্দেশে মহতাব চাঁদ অম্বিকায় তেজচন্দ্রের সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন।

কমলকুমারীর সমাধি মন্দিরটি দালানরীতির প্রথম তল। এর ছাদের চারকোণে ৩টি করে মোট ১২টি চূড়া। এর পরের তলের ছাদের চারকোণে ৪টি, এবং মাঝে একটি অপেক্ষাকৃত বড় চূড়া। অর্থাৎ এটি একটি সপ্তদশ রত্ন মন্দির। এর চূড়া বিন্যাস হচ্ছে ১২+৪+১।

জলেশ্বর মন্দির

কালনায় উড়িষ্যারীতির যে বৃহৎ মন্দিরটি রয়েছে, বর্তমানে সেটিকে প্রতাপেশ্বরের মন্দির বলা হয়। শ্রীযজ্ঞেশ্বর চৌধুরী বলেছেন যে বর্ধমানের রাজকুমার প্রতাপচাঁদের নামে তাঁর জ্যেষ্ঠাপত্নী প্যারীকুমারী দেবী ১৭৭১ শকাব্দে (১৮৪৯ খ্রীঃ) এই মন্দির নির্মাণ করেন।[২৪] কিন্তু প্যারীকুমারী যে মহারাজাধীশ প্রতাপচন্দ্রের মহিষী একথা উল্লেখ থাকলেও প্যারীকুমারী যে প্রতাপচাঁদের নামে মন্দির প্রতিষ্ঠা করছেন, এমন কথা কিন্তু মন্দিরের প্রতিষ্ঠা-

লিপিতে নেই। প্রতিষ্ঠালিপির অনুসরণে যদি বলতেই হয় তবে মন্দিরটিকে 'প্যারীকুমারী মঠ' বলতে হয়।

শৈলেন্দ্রনাথ রক্ষিত তাঁর 'বর্ধমানের লোকসংস্কৃতি' নামক প্রবন্ধে জলেশ্বর মন্দিরের টেরাকোটা কাজের যে চিত্ররূপ উদ্ধৃত করেছে[২৫], সেই ক্রন্দনরতা বালিকাকে একমাত্র প্যারীকুমারী মঠের দক্ষিণদিকের দেওয়ালে কিছুটা ভগ্ন অবস্থায় দেখা যায়। এ থেকে বলা যায় শৈলেন্দ্রনাথ রক্ষিত প্যারীকুমারীর মঠটিকেই জলেশ্বর মন্দির নামে আখ্যাত করেছেন। আবার ১৩৭৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত শ্রীঅনুকুলচন্দ্র সেন ও শ্রীনারায়ণ চৌধুরী তাঁদের 'বর্ধমান পরিচিতি' নামক গ্রন্থে যে চিত্রাবলি সন্নিবেশ করেছেন তাতেও প্যারীকুমারীর মঠটিকেই জলেশ্বর মন্দির নামেই চিহ্নিত করেছেন।[২৬] অবশ্য কেউ কেউ বলেন যে নবকৈলাস মন্দিরের পশ্চিম গায়ের মন্দিরটিই জলেশ্বর মন্দির। কিন্তু আবার কেউ কেউ বলেন যে ওটি নীলকণ্ঠেশ্বরের মন্দির—নীলের দিনে এঁর পূজা হয়। আর প্যারীকুমারীর মঠটিকে বলেন জলেশ্বর মন্দির। শিবচতুর্দশীতে এই শিবের মাথায় ঘড়া ঘড়া জল ঢালা হয়। যাইহোক, পূর্বেই বলেছি যে নবকৈলাস মন্দিরের পশ্চিম গায়ের মন্দিরটি নবকৈলাস মন্দিরেরই অন্তর্গত ১০৯ সংখ্যক মন্দির। আর পূর্বসূরীদের অনুসরণে প্যারীকুমারীর মঠটিকে জলেশ্বরের মন্দির নামেই অভিহিত করেছি।

রাজবাড়ির মাঠে রাসকুঞ্জের গায়েই টেরাকোটায় সমৃদ্ধ উড়িষ্যারীতির এই শিখর মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত। এর প্রতিষ্ঠাফলকে লেখা রয়েছে :

সংসারার্ণবতারনৈক তটিনী তীরে মুরারয়ের্মুদে
শাকে ভেশানগা গভেশ বিমিতে তারেশকায়াদদৎ।
শ্রীরাধেশ সুবেশ রাসরসিকানন্দস্য দাসী
মহারাজাধীশ প্রতাপচন্দ্র মাহষী প্যারীকুমারী মঠম্॥

নীচে বাংলা লিপিতে লেখা রয়েছে :

শাকে সপ্তদশ শত একাত্ত প্রমাণে অম্বিকায় অমরবাহিনী সন্নিধানে
শ্রীরাধাবল্লভ রাস রসিক সুন্দর শ্যামাঙ্গ ত্রিভঙ্গ অঙ্গ বিশ্বমনোহর
তাঁহার কিঙ্করী প্যারীকুমারী প্রধানা মহেন্দ্র প্রতাপচন্দ্র নরেন্দ্র অঙ্গনা
মহাস্থানে করি মহামন্দির নির্মাণ হরিপ্রীতে হরসিতে হরে দিলা দান।
শকাব্দা ১৭৭১ সন ১২৫৬ সাল

এই দেয়ুল সোনামুখী নিবাসী শ্রীরামহরি মিস্ত্রীর নির্মিত।

এই মন্দির শিখর দেউল রীতির হলেও এই রীতির ঐতিহ্যগত নিয়ম এখানে পূর্ণমাত্রায় অনুসৃত হয় নি। এটি শিখর দেউলের প্রাচীন রীতির পরিবর্তিত ও সরলীকৃত রূপ।

এটি পূর্বমুখী। পূর্বদিকেই রয়েছে দরজা। আর তিনদিকে রয়েছে তিন কৃত্রিম দরজা। এর আয়তন ১৫´× ১৫´। উচ্চতা প্রায় ৪৫´। এর চারদিকেই রয়েছে ছোট পরিসরের ঢাকা বারান্দা। এর গর্ভগৃহ গম্বুজের উপর স্থাপিত। গর্ভগৃহে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গের (কৃষ্ণকায়) উচ্চতা প্রায় ৪½´।

মন্দিরের প্রবেশ পথের মাথায় রয়েছে রামসীতার অভিষেক। নীচে বাদ্যবন্দনা। গর্ভগৃহে প্রবেশ পথের খিলান শীর্ষে 'বা-রিলিফ' পদ্ধতিতে খোদিত শিবদুর্গা। পশ্চিমদিকের কৃত্রিম দ্বারের মাথায় 'বা-রিলিফ' পদ্ধতিতে খোদিত কীর্তনদলসহ গৌর-নিতাই-এর মূর্তি। আর উত্তরদিকের কৃত্রিম দ্বারের মাথায় 'বা-রিলিফ' পদ্ধতিতে লঙ্কাযুদ্ধ। যুদ্ধে সিংহবাহিনী দুর্গার আবির্ভাব। রাবণের পাশে দুই নগ্না নারীমূর্তি। অন্যদিকে বানর সৈন্য। নীচে রণবাদ্য। আর দক্ষিণদিকের কৃত্রিম দ্বারের মাথায় রাধাকৃষ্ণ ও ললিতা বিশাখা। তাছাড়া মন্দিরটিতে টেরাকোটা কাজের মধ্যে রয়েছে দলবদ্ধ বিদেশিনী, বাতায়নবর্তিনী, গণেশ, সাপুড়ে, বীণাবাদিনী, মৎস্যকন্যা, ক্রন্দনরতা বালিকা, সুবেশা মহিলা, মৎস্যাবতার, সখীদ্বয়ের মাঝে শ্রীকৃষ্ণ, পদাতিক যোদ্ধা, মাথার উপর সিংহের মুখ বিশিষ্ট বর্শা হাতে যোদ্ধা, ছিন্নমস্তা নারী—হাতে কর্তিত মুণ্ড, বালগোপাল, ষড়ভুজ কৃষ্ণ, ষড়ভুজা কালী, সাধক, মনসা, অশ্বারোহী যোদ্ধা, তীরন্দাজ যোদ্ধা, হস্তীসেনা, জগন্নাথ, মহিষমর্দিনী ইত্যাদি।

এই মন্দিরের গর্ভগৃহটি গম্বুজের উপর স্থাপিত। এটি রাজা মহতাব চাঁদের শাসনকালেই প্রতিষ্ঠিত।

নূতন সমাজবাড়ি

নূতন সমাজবাড়িটি বর্তমানে মহিষমর্দিনী হাই স্কুলে রূপান্তরিত। এটি রাজবাড়ির পাশেই। এখানে আনন্দকুমারী, প্যারীকুমারী, নারায়ণী দেবী, আফতাবচাঁদ, বিনোদেয়ী দেবী, ও মহতাবচন্দ্রের সমাজ রক্ষিত ছিল।

মহতাব চাঁদ মারা যান ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে বিহারের ভাগলপুরে। সেখানে

পারলৌকিক ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হলেও শ্রাদ্ধাদি বর্ধমানেই হয়। কালনায় তাঁর সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে। লিপিতে আছে :

ভুজযুগ সাগর শশিম শকেশ্বর
বৎসর লব্ধ বিভূতিঃ।
পাজ্য পদংপ্রতি পথ্য পিতা মতি
বর্দ্ধিত কীর্তি বিভূতিঃ॥
শশিখ বসু ক্ষিতি র্মিত শক ভূপতি
হায়ন বাহুল মাসি।
নবম দিনে নৃপ মৌলি মুকুট রূপ
মহতাব্ চন্দ গুণরাশি॥
ভাগলপুর পুর পুরতো ভাস্বর
সুবত্তটিনী ধৃত মূর্তি।
ব্রহ্মপদং পর মাপ পরাৎপর
মাপ গত পার্থিব মূর্তি॥

এর পরের অংশ :

যো লেভে ঢেকুনীনং মদনপরিমিতং শ্রীলভিক্টোরিয়াঃ
সম্রাজো মানমূচ্চৈর্বর নরবরগং বঙ্গরাজৈরলভ্যং।
যো ভুক্তাশেষ ভোগান সময়বশগতঃ সোহস্য কঙ্কালমালী॥
নির্মিতে মন্দিরে তস্য কঙ্কালং স্থাপিত ময়া।
মাতুরাদেশাতঃ শ্রীমদ্ আফ্তাব চন্দ ভ্রাতৃবর্ম্মণা॥

অর্থাৎ এই সমাধি মন্দিরটি রাজা আফতাব চাঁদ তাঁর মায়ের আদেশে নির্মাণ করেন। এটি উচ্চ ভিত্তিবেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত দালান রীতির স্থাপত্য। এর পাশেই একটি উন্মুক্ত চত্বরে বেদীর উপর একটি সূর্য ঘড়ি ছিল বলে শোনা যায়।

লক্ষ্মীবাড়ি

জলেশ্বর মন্দিরের পিছনেই রয়েছে গজলক্ষ্মীর মন্দির। এই মন্দিরটি মূলতঃ হরগৌরী পরিবারিত মন্দির। পাঁচকুঠরী বিশিষ্ট দালানরীতির এই পূর্বমুখী ভগ্নপ্রায় মন্দিরটির দক্ষিণদিক থেকে ১ম প্রকোষ্ঠে রয়েছেন গণপতি। সুউচ্চ বেদীর উপর হাঁটুমোড়া অবস্থায় শ্বেতপাথরের ১½ ফুটের মতো মূর্তি। এর বৌদর সম্মুখস্থ গায়ে রয়েছে প্রতিষ্ঠা লিপি। লিপির পাঠ :

অভয়দাতা শ্রীগণপতি
দাস শ্রীঅভয় চন্দ্র মহতাব ভ্রাতৃ-বর্ম্মা
সং বঙ্গাব্দ চৈত্র ১৩২৬

এই গণপতির প্রকোষ্ঠের পরের প্রকোষ্ঠটি ছিল গজলক্ষ্মীর। ইনি বর্তমানে ৩য় প্রকোষ্ঠে স্থানান্তরিত। তাই শূন্য বেদী। বেদীতে প্রতিষ্ঠালিপি নেই। এর মূর্তিটি চতুর্ভুজা। নিম্ন দুই হস্তে বরাভয়। উর্ধ্ব দুই হস্তে দুই মৃণালসহ পদ্মের উপর দুই হস্তী। এর মূর্তি ১ ফুটের মতো পিতলের।

মাঝের প্রকোষ্ঠে উচ্চ বেদীর উপর পদ্মাসনে বসে আছেন শিবদুর্গা। ১ ফুটের মতো প্রস্তর মূর্তি। নিম্নের বেদীতে শ্বেত প্রস্তর ফলক লেখা রয়েছে :

বিজয়-শক্তি শ্রীরাধাগৌরী-রাধারাধ্য শ্রীবিজয়-শংকর
দাস শ্রীবিজয়চন্দ্র মহতাব ভ্রাতৃ-বর্ম্মা
দাসী শ্রীরাধারানী দেবী
সঃ বঙ্গাব্দ চৈত্র ১৩২৬

চতুর্থ প্রকোষ্ঠে বেদীর উপব রয়েছেন বীণাবাদনরতা সরস্বতীর ২½ ফুটের মতো দারু মূর্তি। এর বেদীতে কোন প্রতিষ্ঠালিপি নেই।

শেষের প্রকোষ্ঠে স্কন্দদেবের অর্থাৎ কার্ত্তিকেয়ের মূর্তি ছিল। বর্তমানে তা মাঝের প্রকোষ্ঠে স্থানান্তরিত। ২ ফুটের মতো এঁর মূর্তি। ময়ূরবাহন ষড়ানন। এঁর প্রতিষ্ঠালিপিতে লেখা রয়েছে :

কীর্ত্ত্যদয় শ্রীস্কন্দদেব
দাস শ্রীউদয়চন্দ্র মহতাব ভ্রাতৃ-বর্ম্মা
সঃ বঙ্গাব্দ চৈত্র ১৩২৬

সময়ের দিক থেকে মন্দিরটি বিজয়চাঁদ মহতাবের রাজত্বকালে নির্মিত হয়েছিল। বর্তমানে এই মন্দিরটি প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত।

পাথুরিয়া মহলের রামসীতা মন্দির

পাথুরিয়া মহল ঘাটের পাশেই রয়েছে রামসীতার মন্দির। দালান রীতির এই মন্দিরটি বর্তমানে জীর্ণ। প্রতিষ্ঠালিপিও নেই। তাই কে এর প্রতিষ্ঠাতা তা জোর করে বলা যায় না। তবে যতদূর সম্ভব এটি রাজানুকূল্যেই প্রতিষ্ঠিত

হয়। যতদূর মনে হয় রাজপরিবারভুক্ত মানুষজন গঙ্গাস্নান করে এই মন্দিরে পূজা দিতেন। এই মন্দিরে রয়েছে গর্ভগৃহ, এবং ত্রিখিলানযুক্ত খোলা বারান্দা। এই বারান্দার দক্ষিণ কোণে পূর্বমুখী একটি খুপরী তৈরী করে তাতে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ১ ফুটের মতো একটি কৃষ্ণকায় শিবলিঙ্গ। পশ্চিমমুখী এই মন্দিরটির গর্ভগৃহে রয়েছে রাম সীতার মূর্তি। তাছাড়া জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা, দশরথ, হনুমান, রাধাকৃষ্ণের মতো বহু দেবদেবীর মূর্তি রয়েছে।

এখানে এই 'রাজবৃত্তের সংস্কৃতির' ক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন থাকে, সেটি হলো—অনেক ক্ষেত্রেই কেন বিষ্ণু মন্দিরের অঙ্গরূপে শিব মন্দিরকে প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে? বা বিষ্ণুর পূজার ক্ষেত্রে কেন শিবকে স্থান করে দেওয়া হচ্ছে, যেমন স্থান দেওয়া হয়েছে লালজী মন্দিরে? এক্ষেত্রে বলা যায়, হরিভক্তিবিলাসে শিবতত্ত্ব ও কৃষ্ণতত্ত্বের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। যেখানে "শ্রীকৃষ্ণকে দেখা যায় নিজের হাতে কালীপূজো করতে; রাসলীলায় প্রবেশ করেন মহাদেব"[২৭] সেখানে কৃষ্ণলীলার দ্রষ্টা হিসাবে বিষ্ণুমন্দিরের অঙ্গরূপে শিবমন্দিরকে প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে, বা বিষ্ণুব পূজার ক্ষেত্রে শিবকে স্থান দেওয়া হচ্ছে। তাছাড়া ব্রহ্ম-সংহিতা, বায়ুপুরাণ, ডঃ গোপীনাথ প্রণীত 'তান্ত্রিক সাধনা ও সিদ্ধান্ত' প্রভৃতি গ্রন্থের অনুসরণে ডঃ অমর প্রসাদ ভট্টাচার্য বলেছেন যে সদাশিব শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ না হলেও তিনি স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিলাসমূর্তি ও তাঁ হতে অভিন্ন।[২৮] এই তত্ত্বের দিক থেকেও বৈষ্ণব পরিমণ্ডলে শিবকে স্থান করে দেওয়া হচ্ছে। আর এইসব তত্ত্বের অনুসরণেই প্যারীকুমারী 'হরিপ্রিতে হরসিতে হরে দিলা দান।'

তথ্যপঞ্জী

১। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম/অপরার্ধ), শ্রীসুকুমার সেন, ইস্টার্ন পাবলিশার্স, ২য় সং ১৯৬৫, পৃঃ ৫

২। কৌশিকী, শারদীয় ১৩৯৫, পৃঃ ১৫-২১

৩। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (১ম খণ্ড), বিনয় ঘোষ, প্রকাশ ভবন, ৩য় মুদ্রণ ১৯৮৯, পৃঃ ১১৯-২০

৪। বর্ধমান রাজ, আবদুল গণি খান, ফার্মা কেএলএম, ২য় প্রকাশ ১৯৮৮, পৃঃ ১০

৫। দেশ, ২৭শে পৌষ ১৩৯২, পৃঃ ৪৪

৬। বর্ধমান রাজ, আবদুল গণি খান, ফার্মা কেএলএম, ২য় প্রকাশ ১৯৮৮, পৃঃ ১, ৩

৭। দীনবন্ধু রচনাবলী, সম্পাঃ—ক্ষেত্রগুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, ৪র্থ মুদ্রণ ১৯৯২, পৃঃ ৩৬৮-৬৯

৮। বর্ধমান রাজ, আবদুল গণি খান, ফার্মা কেএলএম, ২য় প্রকাশ ১৯৮৮, পৃঃ ৮

৯। অম্বুকণ্ঠ, আশ্বিন ১৩৯৬, পৃঃ ১১২-১৩

১০। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (১ম ভাগ), ৺অক্ষয় কুমার দত্ত, করুণা প্রকাশনী, ১ম করুণা সং ১৩৯৪, পৃঃ ১৯০-৯৭

১১। বেতার জগৎ, ২৬-৩১ আগষ্ট ১৯৮০, পৃঃ৭১-৭৬

১২। দেবভাষা, ২১শে অক্টোবর ১৯৯৩, পৃঃ ৩২

১৩। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (১ম), বিনয় ঘোষ, প্রকাশ ভবন, ৩য় মুদ্রণ ১৯৮৯, পৃঃ ৩৪৪

১৪। অম্বুকণ্ঠ, আশ্বিন ১৩৯৬, পৃঃ ১১২-১৩

১৫। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (১ম), ৺অক্ষয় কুমার দত্ত, করুণা প্রকাশনী, ১ম করুণা সং ১৩৯৪, পৃঃ ১৮৯

১৬। শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস (১ম খণ্ড), শ্রীসনাতন গোস্বামী, সম্পাঃ-হরিদাস গোস্বামী, আনন্দ এজেন্সী, ১৩৭৯, পৃঃ ৩৭৬

১৭। বর্ধমান রাজ, আবদুল গণি খান, ফার্মা কেএলএম, ২য় প্রকাশ ১৯৮৮, পৃঃ ৬২

১৮। কৌশিকী, জানুয়ারী ১৯৯৫, পৃঃ ১৯৩

১৯। তদেব, পৃঃ ১৮৭

২০। তদেব, পৃঃ ১৮৬-৮৭

২১। শ্রীসুদর্শন, শ্রাবণ ১৪০০, পৃঃ ৫০-৫২

২১(ক)। বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি (৩য় খণ্ড), যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, পুস্তক বিপণি, ১ম প্রকাশ ১৯৯৪, পৃঃ ১২৭

২২। মহাতীর্থ একান্নপীঠের সন্ধানে, নিগূঢ়ানন্দ, শরৎ পাবলিশিং, ৩য় পরিমার্জিত ও পরিবর্দ্ধিত সং ১৩৯১, পৃঃ ৬৬

২৩। বর্ধমান রাজ, আবদুল গণি খান, ফার্মা কেএলএম, ২য় প্রকাশ ১৯৮৮, পৃঃ ৫৯

২৪। কৌশিকী, জানুয়ারী ১৯৯৫, পৃঃ ১৮৭

২৫। দেশ, সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭২, পৃঃ ৯৭

২৬। বর্ধমান পরিচিতি, শ্রীঅনুকূলচন্দ্র সেন ও শ্রীনারায়ণ চৌধুরী, বুক সিণ্ডিকেট, ১ম প্রকাশ ১৩৭৩, পৃঃ—চিত্র পরিচিতি অংশ

২৭। মহাতীর্থ একান্নপীঠের সন্ধানে, নিগূঢ়ানন্দ, শরৎ পাবলিশিং, ৩য় পরিমার্জিত ও পবিবর্দ্ধিত সং ১৩৯১, পৃঃ ৩৫

২৮। শ্রীসুদর্শন, শ্রাবণ ১৪০০, পৃঃ ৫৫

পরিবার কেন্দ্রিক সংস্কৃতি

রাজবৃত্তের সংস্কৃতি যেমন ক্রমান্বয়ে লোকবৃত্তের সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত হয়, তেমনি পরিবার কেন্দ্রিক সংস্কৃতি অনেক ক্ষেত্রে লোকবৃত্তের সংস্কৃতিতে পরিণত হয়।

অম্বিকা কালনার যে সকল পরিবার কেন্দ্রিক সংস্কৃতি লোকবৃত্তের সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে তাদের মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটিকে আলোচনার বৃত্তের মধ্যে রাখছি।

মাজী বাড়ির
শ্যামচন্দ্রের মন্দির

হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ের কাছেই রাস্তার বিপরীত দিকে রয়েছে মাজী বাড়ি। এই মাজী বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন শ্যামচন্দ্র। শ্রীমতী রাণী দেবীর সংগ্রহ থেকে লিখিত 'মাইজী ও তাঁর শ্যামচাঁদ' নামক প্রবন্ধ থেকে এই মাজী বাড়ির শ্যামচাঁদের ইতিহাস জানা যায়। এতে বলা হয়েছে যে প্রবল প্রতাপশালী বর্ধমান রাজ কীর্তিচাঁদ মহতাবের মাতা গেছেন ভাগীরথীর পুণ্যস্নানে। হঠাৎ তাঁর নজর পড়লো গঙ্গাতীরে বসে থাকা এক উদাসিনা বিদেশিনীর দিকে। মনে তাঁর করুণার সঙ্গে সঙ্গে কৌতুহল দেখা দিল। তিনি তাঁর সহচরীকে পাঠালেন বিদেশিনীকে আনবার জন্য। সহচরী বিদেশিনীকে নিয়ে এলে রাজমাতা কৌতুহলবশতঃ জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কেমন করে এখানে এলে? বিদেশিনী উত্তরে বললেন—সংসারে আমার এক বাল্যবিধবা মেয়ে ছাড়া কেউ নেই। মানসিক শান্তির আশায় তীর্থ দর্শনে বেরিয়েছি। চৈতন্যের লীলাভূমিগুলি দর্শনার্থে এখানে এসে পৌচেছি। রাজমাতা সাদরে বিদেশিনীকে গ্রহণ করলেন। বললেন, তুমি আমার সন্তানের রাজ্যে অতিথি। এসো আমার সঙ্গে। কিন্তু তোমায় কি বলে ডাকবো? তোমার পরিচয়ই বা কি? বিদেশিনী জানালেন, তিনি এক সম্ভ্রান্ত ঘরেরই গৃহবধূ, এবং ব্রাহ্মণকন্যা। পদবী তাঁর ওঝা। তীর্থদর্শনে তিনি মিথিলা

থেকে এসেছেন। তৎকালীন প্রথামতো এক ঘর মৈথিলী ব্রাহ্মণকে নিজ রাজত্বে বসতি স্থাপনার্থে রাজমাতা বিদেশিনীকে আগ্রহের সঙ্গে তাঁর প্রাসাদে নিয়ে গেলেন সখিত্বে বরণ করে। তাঁর রক্ষণা-বেক্ষণের ভার গ্রহণ করলেন। এই সখিত্বের বন্ধন দৃঢ় করবার জন্য রাজমাতা এবং ওঝানী বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হলেন। এই মাইজী বাড়ির গৃহদেবতা শ্যামচাঁদ হলেন ওঝানীর পুত্র আর রাধারানী হলেন রাজমাতার কন্যা। ওঝানীর পুত্র শ্যামচাঁদ বিয়ে করলেন মহতাব বংশের কন্যা রাধারানীকে। সেইসূত্রে বর্ধমান মহারাজের প্রতিষ্ঠিত লালজী মহারাজ শ্যামচাঁদের শ্বশুরমশাই এবং সেই সম্পর্কেই আজও প্রতি বৎসর শ্যামচাঁদ রাসপূর্ণিমা ও দোল পূর্ণিমায় শ্বশুরবাড়ী অর্থাৎ কালনার রাজবাড়ীতে নিমন্ত্রিত হন এবং সস্ত্রীক নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যান। কিংবদন্তী আছে—প্রথমদিকে এক এবং দেড় আঙ্গুল সমান রাধারানী ও শ্যামচাঁদের মূর্তি ছিল। তার প্রমাণস্বরূপ রাধারানীর ছোট মূর্তিটি শ্যামচাঁদ মন্দিরের মঙ্গলচণ্ডীর সিংহাসনের কাছে আজও বর্তমান। ঐ ছোট মূর্তিদ্বয়ের পূজা হতো বর্তমান শ্যামচাঁদ মন্দিরের উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত পঞ্চরত্ন মন্দিরে। এই মন্দিরের বিগ্রহ সাজাতে সাজাতে ওঝানীর কন্যা রাধু একদিন বললেন—মাগো, কি ঠাকুরই করেছ! পোষাকেই সব ঢাকা পড়ে যায়। লোকে ঠাকুর দেখবে কেমন করে? এমন ব্যবস্থা করতে পার না যাতে লোকে ঠাকুর দেখতে পায়? ওঝানী উপলব্ধি করলেন, মেয়ের কথাটা ঠিকই। তাঁর মনে একটা অভিপ্রায় জাগলো। তিনি তাঁর সখী রাজমাতার কাছে গেলেন এবং তাঁর অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন। রাজাকেও অসুবিধার কথাগুলি বললেন। সব শুনে রাজা কীর্তিচাঁদ মহতাব হেসে বললেন 'মাইজী এবং মাতাঠাকুরানী ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, এটাই তাঁর কাছে যথেষ্ট'।—রাজা কীর্তিচাঁদের কথা শুনে রাজমাতা গর্বভরে সখীর দিকে তাকালেন। মাইজী বললেন, বাবা আমি সেকথা জানি বলেই তোমার কাছে ছুটে এসেছি। আমার ব্যাটা শ্যামচাঁদ বৃন্দাবন থেকে আসবে এত সহজ কথা নয়। বৃন্দাবন অনেক দূর এবং পথঘাটও বিপদসঙ্কুল। তাছাড়া দেবমূর্তি আনা সৎব্রাহ্মণ ছাড়া হবে না। এছাড়া তার কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলাও আছে।—রাজমাতা সখীকে অভয় দিয়ে বললেন, তোমার কোন চিন্তা নেই সখি। নিয়মমতো সমস্ত ব্যবস্থা হবে। তুমি নির্ভাবনায় থাক।—সখীর কাছে আশ্বাস পেয়ে মাইজী ফিরে এলেন বাড়িতে। তবুও তাঁর কি দুর্ভাবনা যায়? আসবার

সময় তিনি রাজাকে বলে এসেছেন, আমার ছেলে শ্যামচাঁদের মূর্তি দেখে মনপ্রাণ যেন ভরে ওঠে বাবা। এমনই ভাবযুক্ত যেন হয়।—রাজা উত্তরে শুধু বলেছিলেন, তুমি ভেবো না মাইজী। বাড়ি যাও।—রাজা কীর্তিচাঁদ মহতাব কথিত মাইজী সম্বোধনের জন্য শ্যামচাঁদের সেবাইতদের বসতবাটী আজও 'মাইজীর বাড়ি' নামে খ্যাত। রাজা কীর্তিচাঁদ মহারাজ তাঁর কথা রাখলেন। মাইজীর মানসপুত্র শ্যামচাঁদের কষ্টি পাথরের মূর্তিটি বৃন্দাবন থেকে এনে দিলেন। রাজমাতা বললেন—সখি, তোমার ছেলেটিকে দেখে মনে হচ্ছে ছুটে গিয়ে কোলে তুলে নিয়ে ওকে আদর করি।—মাইজী পুত্রগর্বে মূর্তিটি কোলে তুলে নিলেন। রাজমাতা বললেন—তাহলে আমার মেয়েকেও বড় সড় করে আনতে হবে, তা না হলে তোমার ছেলের পাশে আমার মেয়েকে মানাবে কেন? এই কারণে বর্তমান রাধারানীর মূর্তিটি নবদ্বীপ থেকে আনানো হয়েছিল। কিন্তু বড় যুগল মূর্তির জন্য এখন বড মন্দির চাই। তৈরী হল পঞ্চরত্ন মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে বড় মন্দির বাংলার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে আটচালা গঠনে। পঞ্চরত্ন মন্দিরটি নির্মিত কবে তার নির্দিষ্ট সন তারিখ পাওয়া যায় না। তবে অন্যান্য মন্দিরগুলি অপেক্ষা প্রাচীন এটি দেখলে বোঝা যায়। বর্তমান বড় মন্দিরটির সন তারিখ নাট মন্দিরের বহির্ভাগের অংশটির পশ্চাতে থাকার জন্য সঠিক বলা না গেলেও বহির্ভাগের সন তারিখ লিখবার অংশটিতে লেখা আছে বঙ্গাব্দ ১১৬১ সনে এই মন্দির নির্মিত। তবে অনুমান করা যায় বর্হিভাগের অংশটি অপেক্ষা পশ্চাতের অংশটি আরো আগে নির্মিত হয়েছিল।[১]—এখানে মন্দিরটির সম্বন্ধে এই যে প্রতিবেদন, এই প্রতিবেদন কতখানি যুক্তিনির্ভর তা বিচার বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে ওঝানীর পুত্র শ্যামচাঁদ বিয়ে করলেন মহতাব বংশের কন্যা রাধারানীকে। সেই সূত্রে বর্ধমান মহারাজের প্রতিষ্ঠিত লালজী মহারাজ শ্যামচাঁদের শ্বশুরমশাই। আর তা যদি হয় তবে এটা নিশ্চিত যে লালজী মন্দির প্রতিষ্ঠার পরেই মাইজীর সাথে রাজমাতার সাক্ষাৎকার সংঘটিত হয়। আর লালজী মন্দিরের প্রতিষ্ঠা ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে। এরপরে মাইজী বাড়ির শ্যামচাঁদের বৃহৎ মন্দিরটির প্রতিষ্ঠা। এর প্রতিষ্ঠাকাল ১৬৭৭ শকাব্দ অর্থাৎ ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দ। সুতরাং এক্ষেত্রে মাইজী বাড়ির বৃন্দাবন থেকে শ্যামচাঁদের আনয়নের বা বৃহৎ মন্দিরটির নির্মাণের কাহিনীর সাথে রাজা

কীর্তিচন্দ্রকে যুক্ত করা যায় না। কারণ এই মন্দির নির্মাণের ১৫ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে কীর্তিচন্দ্র ইহলোক ত্যাগ করেন। তাছাড়া, কীর্তিচন্দ্রের ক্ষেত্রে 'মহতাব' উপাধি যুক্ত করাটাও অনৈতিহাসিক।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে বর্তমান বড় মন্দিরটির সন তারিখ নাট মন্দিরের বহির্ভাগের অংশটির পশ্চাতে থাকার জন্য সঠিক বলা না গেলেও বহির্ভাগের সন তারিখ লিখবার অংশটিতে লেখা আছে যে বঙ্গাব্দ ১১৬১ সনে এই মন্দির নির্মিত। তবে অনুমান করা যায় বহির্ভাগের অংশটি অপেক্ষা পশ্চাতের অংশটি আরো আগে নির্মিত হয়েছিল। আর তা যদি হয় তবে বলা যায়, ১১৬১ বঙ্গাব্দটি (১৭৫৫ খ্রীঃ) নাট মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাকাল, মূল মন্দিরটির নয়। কিন্তু নাটমন্দিরের প্রবেশদ্বারের খিলানশীর্ষে যে প্রতিষ্ঠালিপি রয়েছে, তার পাঠ হলো :

শ্রীল শ্রীসামচন্দ্রস্য মন্দির স্থ
মনোহর / মুন্যশ্ব রস চন্দ্রে / গণি
তে শক বৎসরে / পতিষ্ঠ স্থর
কন্যা বন্যা চক্রবর্তিব মাতা
ভ্রুস্থর পত্নী কোশলাখ্য কু
লোজ্জ্বলা ১৬৭৭ সন ১১৬১

এ থেকে এটাই নিশ্চিত করে বলা যায় যে এই প্রতিষ্ঠা লিপিটি মূল মন্দিরেরই, তাই প্রতিষ্ঠালিপিতে বলা হয়েছে 'শ্রীল শ্রী সামচন্দ্রস্য মন্দির স্থমনোহর'। অবশ্য এক্ষেত্রে প্রশ্ন থাকে—তবে কেন মূল মন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপি নাট মন্দিরে লাগানো হচ্ছে? এর উত্তরে বলা যায় যে নাট মন্দিরটি পরে নির্মিত হয়েছিল। তাতে মূল মন্দিরটির সন তারিখ নাট মন্দিরের ছাদের অংশবিশেষেব দ্বারা ঢাকা পড়ে যাওয়ার জন্য নাট মন্দিরে মূল মন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপি নূতন করে বসানো হয়েছিল। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে পঞ্চরত্ন মন্দিরটি নির্মিত কবে তার নির্দ্দিষ্ট সন তারিখ পাওয়া যায় না। তবে অন্যান্য মন্দিরগুলি অপেক্ষা প্রাচীন, এটি দেখলে তা বোঝা যায়। এখন মূল মন্দিরটির প্রতিষ্ঠার পূর্বে যদি মাইজীর ক্ষুদ্র শ্যামচাঁদ পঞ্চরত্ন মন্দিরে থাকেন, তবে পঞ্চরত্ন মন্দিরটি অবশ্যই বৃহৎ মন্দিরটির চেয়ে প্রাচীন। আর তা যদি হয় তবে মন্দিরটি লালজী

মন্দিরটির নির্মাণের অব্যবহিত পরে, এবং বৃহৎ মন্দিরটি প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পূর্বেই নির্মিত হয়েছিল বলা যেতে পারে।

যাইহোক, শ্যামচন্দ্রের মন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপি অনুসারে বলা যায়, মূল মন্দিরটি রাজা তিলকচাঁদের রাজত্বকালে (১৭৪৪-৭১ খ্রীঃ) নির্মিত হয়েছিল। সেক্ষেত্রে মন্দির প্রতিষ্ঠার সাথে যুক্ত রাজা তিলকচাঁদই, কীর্তিচাঁদ নন, এবং সেই সূত্রে রাজমাতা রাজা কীর্তিচাঁদের মাতা ব্রজসুন্দরী নন। এখানে রাজমাতা বলতে মিত্রসেন রায়ের বা চিত্রসেন রায়ের পত্নী হতে পারেন।

প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায়, মন্দিরটি রাজানুকূল্যে প্রতিষ্ঠা করেন কোশলা দেবী। অর্থাৎ মাইজী হলেন কোশলাদেবী, এবং তাঁর কন্যা সুরকন্যা (ব্রাহ্মণতনয়া) বন্যা চক্রবর্তী।

পূর্বমুখী এই মন্দিরটি উচ্চ ভিত্তিবেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত। এর আয়তন ২১½´× বারান্দা সহ ২০½´। এর উত্তর ও দক্ষিণদিকের পূর্বপ্রান্তকে ৩´ করে কমিয়ে নাট মন্দিরের সৃষ্টি করা হয়েছে। যার আয়তন ১৫´× ৪´। এর সামনে তিনটি খিলান দরজা এবং ২ পাশে দুটি খিলান দরজা। এটি চারচালার স্থাপত্য। তবে একটি চাল মূল মন্দিরে গোঁজা। তাই এর তিনটি চাল দৃষ্ট হয়।

মূল মন্দিরটি আটচাল বিশিষ্ট স্থাপত্য। ২৫ ফুটের উপর চার চাল। তারপর কিছুটা উঠে গিয়ে আর চার চাল। শীর্ষসমেত এর উচ্চতা প্রায় ৫০´। এর গর্ভগৃহে পৃথক কক্ষ নেই। পূর্বমুখী একটিই দরজা। উত্তর ও দক্ষিণে দুই জানালা। এর গর্ভগৃহের উত্তর-পশ্চিম কোণ দিয়ে দোতলায় সিঁড়ি উঠে গেছে। ওখানে বর্তমানে ঝুলনের পুতুল থাকে। এতে বিশেষ কোন টেরাকোটার বা ফুলকারি কাজ নেই। তবে উচ্চে রয়েছে একটি হনুমানের মূর্তি। আর গর্ভগৃহের প্রবেশের মাথায় রঙিন ফ্রেশকোর কাজ। রামচন্দ্রের বানর সৈন্যের অঙ্কন। মাথায় ইঁটের খোপে গণেশ মূর্তি।

মূল মন্দিরের ঈশান কোণে সমতালিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পঞ্চরত্ন মন্দির। এর আয়তন ৮´× ৮´, উচ্চতা প্রায় ১৫ ফুটের মতো।

এই মাইজী বাড়ির শ্যামচাঁদ মন্দিরের অঙ্গরূপে রয়েছে দালান রীতির ঝুলন-কক্ষ। এর সাথে সংলগ্ন বৃহৎ নাটমন্দির। নাটমন্দিরের পশ্চিম গায়ে দুই শিব মন্দিরের মাঝে রয়েছে দোলমঞ্চ। এটি ৫´ উচ্চ ভিত্তি বেদীর উপর

প্রতিষ্ঠিত। এটি উড়িষ্যা রীতির শিখর মন্দির। ৩টি খোলা খিলান দরজা ভিত্তিবেদীর উপর থেকে দরজার মাথা পর্যন্ত ৪ কোণে ৫টি করে পল তোলা, এবং দরজার মাথা পর্যন্ত ফুলকারি কাজ। শিখরে আমলক শিলা। শিখর পর্যন্ত এর উচ্চতা প্রায় ৩৫´।

এই মাজী বাড়ির শ্যামচাঁদ কষ্টিপাথরের ১০´´র মতো, আর রাধারানী ৬ ইঞ্চির মতো অষ্টধাতুর।

মাইজী মৈথিলী ব্রাহ্মণ যুগলকিশোর পাণ্ডেকে দত্তক নেন। এই যুগলকিশোরের দৌহিত্র ঈশ্বরচন্দ্র ঝা (ওঝা)। এঁর কন্যা গিরিজা সুন্দরীর সাথে বিবাহ হয় বরদাকান্ত ঠাকুরের। এঁরই বংশধগণ শ্যামচাঁদের বর্তমান সেবাইত।

বছরে ৪ বার বিগ্রহকে স্নান করানো হয়। এখানকার প্রধান উৎসব ঝুলন। তাছাড়া, রথ, রাস, দোল ও অন্নকূট উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

শ্যামচাঁদের ১৫ ফুটের মতো রথটি রয়েছে মাইজী বাড়ির দক্ষিণে। রথযাত্রার দিন টান হয়ে বড রাস্তায় যায়। উল্টোরথের দিন পূর্বস্থানে ফিরিয়ে আনা হয়।

সম্পর্কের দিক থেকে যেহেতু শ্যামচাঁদ রাজবাড়ির জামাই, সেহেতু আজও প্রতিবৎসর শ্যামচাঁদ রাস ও দোল পূর্ণিমায় কালনার রাজবাড়িতে (লালজী বাড়ি) নিমন্ত্রিত হন, এবং সস্ত্রীক নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যান, এবং যথাসময়েই ফিবে আসেন। এর সংস্কৃতি পারিবারিক হলেও কালনার প্রত্নতত্ত্ব ও সংস্কৃতির ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।

গোপালজীর মন্দির

সিদ্ধেশ্বরী মোড়ের কাছেই গোপাল মন্দির। এটি কালনার তৃতীয় পঁচিশ রত্ন মন্দির। এর প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায়, মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাকাল ১৬৮৮ (১৭৬৬ খ্রীঃ) শকাব্দ। অর্থাৎ এটি রাজা তিলকচন্দ্রের রাজত্বকালে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠালিপিতে আছে :

শুভমস্তু শকাব্দাঃ ১৬৮৮

শকাব্দে শর ভাজ্যরি-রাত্রিপ-কলাকোত্রির মূর্ত্যাঙ্গ
ভূসংখ্যে বাহুজ বংশভূর্বিমলধিঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সুধীঃ।
প্রসাদম্ প্রদদৌ বিধিয়া পরয়া ভক্ত্যাপরব্রহ্মণে
গোপালায় সমস্ত বাংময়—পথাপ্রীতায় বিশ্বাত্মনে॥

অর্থাৎ ১৬৮৮ শকাব্দে (১৭৬৬ খ্রীঃ) বাহুজ বংশভূ (ক্ষত্রিয় বংশজাত) শুদ্ধবুদ্ধিসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নামক এক সুধী গোপালের নিমিত্ত এই মন্দির নির্মাণ করেন। সুতরাং এ থেকে বলা যায় যে এটি রাজবৃত্তের মন্দির নয়। এর নির্মাণের ক্ষেত্রে রাজানুকূল্য থাকলেও থাকতে পারে, বা প্রতিষ্ঠাতার সাথে রাজ পরিবারের আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু রাজবৃত্তের সম্পর্ক যুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করে বলা যায় না বলে এটিকে পরিবার কেন্দ্রিক সংস্কৃতি বলে চিহ্নিত করেছি।

এই মন্দিরটি পূর্বমুখী, এবং উচ্চ ভিত্তিবেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত। এরই সাথে সংলগ্ন দোচাল বিশিষ্ট নাটমন্দির। নাটমন্দিরের পরের অংশটি তিন খিলানের খোলা দ্বার বিশিষ্ট ঢাকা বারান্দা।

কিছুপার্থক্য থাকলেও মন্দিরটির গঠনের সাথে লালজী মন্দিরের গঠনগত মিল রয়েছে। এই মন্দিরের পশ্চিমদিকের দেওয়াল ১৭´। তার দক্ষিণ প্রান্ত থেকে ৯০° কোণ করে পূর্বদিকে ৩½´ বাড়ানো, তার প্রান্ত থেকে দক্ষিণদিকে ৩´ বাড়ানো, তার প্রান্ত থেকে পূর্বদিকে ৩½´ বাড়ানো, তার প্রান্ত থেকে দক্ষিণ দিকে ৩´ বাড়ানো। সেখান থেকে পূর্বমুখী ১৭´। তার পূর্ব প্রান্ত থেকে ৯০° কোণ করে ৩½´ উত্তরে বাড়ানো, তার প্রান্ত থেকে ৩´ পূর্বে বাড়ানো, তার প্রান্ত থেকে ৩½´ উত্তরে বাড়ানো, তার প্রান্ত থেকে ৩´ পূর্বে বাড়ানো। অন্যদিকে উত্তর দিকের দেওয়াল সমভাবে পর্যায়ক্রমে পশ্চিম ও উত্তরদিকে বাড়ানো। আর দুইদিকের পূর্বদিকস্থ বাড়ানো অংশে জগমোহন ও নাটমন্দির। এই নাটমন্দির কৃষ্ণচন্দ্রজীর নাটমন্দির, এবং লালজীর মন্দির সংলগ্ন নাটমন্দিরের চেয়ে আকারে বড়। তবে লালজীর পৃথক নাটমন্দিরের চেয়ে আকারে ছোট, এবং এটি দোচালা রীতির।

মূল মন্দিরটির প্রথম তলের ছাদের চারকোণে যে খাঁজের সৃষ্টি হয়েছে তাতে তিনটি করে (দুটি চূড়া সমমাপের এগোনো, মাঝেরটা একটু পিছানো) মোট ১২টি চূড়া স্থাপিত। এরপর বেড় কমিয়ে খানিকটা উপরে অষ্ট কোণাকৃতি ২য় তল সৃষ্টি করা হয়েছে। তার ছাদে ৮ কোণে ৮টি চূড়া। এরপর বেড় কমিয়ে ২য় তলের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম উচ্চতায় ৩য় তলের সৃষ্টি করা হয়েছে। তার ছাদের ৪ কোণে ৪টি, মাঝে একটি বড় চূড়া, অর্থাৎ চূড়াগুলির বিন্যাস হচ্ছে ১২+৮+৪+১। একুনে পঁচিশ চূড়া। এই চূড়াগুলি চারকোণা ও

তাদের ছাদ উঁচু নিচু কার্নিসের বিন্যাসে কিছুটা পীঢ়া শিখরের অনুরূপ।

এই মন্দিরের ত্রিখিলান দালানের ছাদ ধনুকাকৃতি 'ভল্ট'-এর উপর, এবং গর্ভগৃহের ছাদ কোণে লহরযুক্ত গম্বুজের উপর স্থাপিত।

জগমোহনের খিলানের শীর্ষে রঙিন ফ্রেসকোয় অনন্ত শয্যাশায়ী বিষ্ণু। তাছাড়া বেশ কিছু পৌরাণিক ছবি, এবং ফুলকারি কাজ।

মন্দিরের যে খাঁজ থেকে নাটমন্দিরের আরম্ভ তার বাইরের দুপাশে কিছু টেরাকোটার কাজ কার্নিস পর্যন্ত উঠে গেছে। যেমন চতুর্ভুজ নারায়ণ, ঢাকি ইত্যাদি।

দেওয়াল গাত্রগুলিতেও ফুলকারি কাজ। তাছাড়া চার কোণের চারটি পল কার্নিস পর্যন্ত উঠে গেছে টেরাকোটার কাজ নিয়ে—যার মধ্যে রয়েছে শিকার চিত্র, মৃত্যুলতা ইত্যাদি।

গর্ভগৃহে রয়েছে ১ই ফুটের মতো গোপাল, এবং ২´ এবং ১ই ফুটের মতো কৃষ্ণ ও রাধার মূর্তি।

সদর দ্বারের ভিতর দ্বারের দুপাশে ঠিক দুই দ্বারীর মতো আটচাল বিশিষ্ট পশ্চিমমুখী দুই শিবমন্দির। যেহেতু সদাশিব, পঞ্চানন ও রুদ্র বিষ্ণুর গুণাবতার রূপ অংশ, যেহেতু ব্রহ্মসংহিতা, বায়ুপুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে সদাশিবকে কৃষ্ণের বিলাসমূর্তি ও তাঁহা হতে অভিন্ন বলা হয়েছে।[২] তাই শিবকে গোপাল বাড়ির মধ্যেই স্থান করে দেওয়া হয়েছে। তবে তিনি যেহেতু কৃষ্ণের স্বরূপ নন, তাই তাঁদের স্বতন্ত্র ভাবেই রাখা হয়েছে।

মন্দিরের উত্তর ও দক্ষিণে মন্দিরের মুখোমুখি রয়েছে সারিবদ্ধ প্রকোষ্ঠ। এগুলি এককালের আবাস, ভাঁড়ার ও রন্ধনশালা।

এখানে যে রথের টান হতো তার নিদর্শন ভগ্নরথ। তাছাড়া মন্দিরের বাইরে উত্তর গায়ে রয়েছে রাসমঞ্চ। উচ্চতা প্রায় ১৫´। ৩ ফুট উচ্চ ভিত্তিবেদীর উপর অষ্ট কোণাকৃতি উঠে আটটি উন্মুক্ত দরজা সৃষ্টি করেছে। তার উপরে বেড় কমে অষ্ট কোণাকৃতি উঠে আটটি উন্মুক্ত দরজা সৃষ্টি করেছে। তার উপর কিছুটা উঠে গম্বুজাকৃতি শিখর সৃষ্টি করেছে অষ্ট কোণের আদল রেখে।

এই মন্দিরেও নিত্যসেবা চলে। উৎসব অনুষ্ঠানও হয়ে থাকে।

শ্যামরায়পাড়ার শ্যামরায়ের মন্দির

অনন্ত বাসুদেব মন্দিরের পশ্চিমে শ্যামরায় পাড়া। এই পাড়াতেই প্রতিষ্ঠিত শ্যামরায়। আসলে বিগ্রহের নামানুসারেই পাড়াটির নামকরণ হয়েছিল। এটিও একটি পারিবারিক মন্দির। এই মন্দির উত্তরমুখী দালান-রীতির স্থাপত্য। এখানে প্রতিষ্ঠিত ঠাকুরের বেদীতে যে প্রতিষ্ঠালিপি রয়েছে তা হলো—শ্রী শ্রী শ্রী শোজয়তি

স্ববংশ্য স্থাপিত শ্যামরায়স্য জীর্ণ মন্দিরম্।
স্বল্পশিষ্টং সুসংস্কৃত্য কুমারেশোজ দিবংগতঃ॥
কুমারেশ কুমারেনারু কুমার শর্ম্মণঃ।
শেষকৃত্যং কৃতং তস্য পিতুরক্ষায় তৃপ্তয়ে॥

অর্থাৎ কুমারেশ কুমার দিব্যধামে গমন করেন। তাঁর পুত্র নারু কুমার শর্ম্মণ তাঁর পিতার শেষকৃত্য করে পিতার তৃপ্তির জন্য তাঁরই বংশের দ্বারা স্থাপিত জীর্ণ হয়ে যাওয়া শ্যামরায়ের মন্দিরটির সংস্কার করেন। এই মন্দিরে রয়েছেন ২½ ফুটের মতো শ্যামরায়, এবং ১½ ফুটের মতো রাধা। ডানপাশের কক্ষে রাম সীতা, এবং বামপাশের কক্ষে কানাই বলাই, ও জগন্নাথের দারু মূর্তি। বর্তমানে সব মূর্তিই শ্যামরায়ের কক্ষে স্থানান্তরিত। এখানে নাকি পূর্ব ও পশ্চিমমুখী আরও দুটি মন্দির ছিল। আত্মীয়তার সূত্রে এই মন্দিরের বর্তমান সেবাইত বাঘনাপাড়ার গোস্বামী গোষ্ঠীর এক শাখা।

মন্দিরটি প্রাচীন। তবে প্রাচীন মন্দিরটির প্রতিষ্ঠালিপি না থাকার জন্য এটি যে কত প্রাচীন তা জানা যায় না। সাক্ষাৎকারে মন্দিরের একজন সেবাইত শ্রীআনন্দলাল গোস্বামী বলেন যে ৫৫/৬০ বৎসর পূর্বে জীর্ণ মন্দিরটিকে সংস্কার করা হয়। মাঘ মাসে এই মন্দিরের বার্ষিক উৎসব। ২।৩ বৎসর অন্তর ঠাকুরের নবকলেবর করা হয়। জনশ্রুতি, এই শ্যামরায়ও নাকি লালজী বাড়ির জামাই ছিলেন। পূর্বে রাসের সময় শ্যামরায়কে লালজী বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হতো।

সেন বাড়ির শ্যামসুন্দরের মন্দির ও দুর্গা দালান

সেন পাড়ায় সেনেদের পূজামণ্ডপের মধ্যে রয়েছে শ্যামসুন্দরের মন্দির। দুর্গা দালানে রক্ষিত সেন বংশের বংশলতিকা থেকে জানা যায়, এই বংশেরই

শ্যাম সেন শ্যামসুন্দর মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠা ৭।৮ পুরুষের মাথায়, অর্থাৎ ২০০ বৎসরের পূর্বে বা মাথায় রাজা তেজচন্দ্রের আমলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই মন্দিরে ধাতব বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন ১ ফুটের মতো শ্যামসুন্দর, এবং ৬''র মতো রাধা। মন্দিরটি আটচালের স্থাপত্য। উচ্চ ভিত্তিবেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত এর আয়তন ১৩½'×১৩½'। এর উচ্চতা প্রায় ৩২'। ১০ ফুটের উপর ১ম চাল, ১৭ ফুটের উপর ২য় চাল, তার উপর শিখর ৫'। অর্থাৎ এখানে বড় চারচালার উপর একটি ছোট চারচালা স্থাপিত। এর একটি খিলান দরজা রয়েছে। দরজার মাথায় রয়েছে প্রতীক শিব মন্দিরের সজ্জা। দরজার দুপাশে দু সার করে ফুলকারি কাজে ও জ্যামিতিক নক্সা উঠে গেছে। তার পাশে দু সারি করে টেরাকোটার কাজ উঠে গেছে। দরজার মাথার উপরে দু সারি করে ফুলকারি কাজ ও জ্যামেতিক নক্সা। তার উপরে দু সারি টেরাকোটার কাজ। উত্তরমুখী এই মন্দিরে টেরাকোটা কাজের মধ্যে রয়েছে কৃষ্ণ এবং বহু বন্দুকধারী সৈন্যের সজ্জা। এর নীচের প্যানেলে রয়েছে পুতনাবধের মতো কৃষ্ণলীলা চিত্র এবং হরিনাম সংকীর্তনের মতো চিত্র সজ্জা।

এই মন্দিরের পাশেই সুউচ্চ ভিত্তিবেদীর উপর পশ্চিমমুখী সুবৃহৎ দুর্গা দালান। গর্ভগৃহ, দরদালান ও ভিজে রোয়াক নিয়ে এই মন্দির। এই মন্দিরে দরদালানের বাইরে মাথার উপরে ফ্রেশকোর কাজ সমৃদ্ধ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। ডান ও বাম দিকের দুপাশে দশ অবতারের চিত্র।

দুর্গাপূজার সময় এই দালানে এখনও সমারোহের সাথে দুর্গাপূজা হয়। আর শ্যামসুন্দর মন্দিরে নিত্যপূজা হয়। এবং দোল, ঝুলন ও রাসে বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

জয়দুর্গা বাড়ির জয়দুর্গা মন্দির

দাশু পাঁচুর মোড় থেকে পাথুরিয়া ঘাটের দিকে যেতে পথের ডানপাশে পড়ে জয়দুর্গা বাড়ি। এই বাড়ির সম্মুখস্থ দালানরীতির মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন জয়দুর্গা। ইনি দশভূজা। মহিষমর্দিনী। দুপাশে লক্ষ্মী-সরস্বতী। এটি পারিবারিক মন্দির হলেও কালনার জন জীবনে এই মন্দিরের বিশেষ এক স্থান রয়েছে। ১২ বছর অন্তর অন্তর এঁর অঙ্গরাগ হয়। বর্তমানে এই দেবী মুখার্জ্জী পরিবারের। পূর্বে এই দেবী বালির বাজারের চ্যাটার্জ্জী

পরিবারের ছিল। পাঁচ পুরুষ পূর্বে দেবীকে মুখার্জ্জী পরিবারে প্রদত্ত হয়। এই দেবীর ইতিহাস অপেক্ষাকৃত প্রাচীন। তবে ২৫০ বছরের উর্ধ্বে নয়।

সাধনা কালীর মন্দির

সিদ্ধেশ্বরীকে বড় মা বলা হয়। তাঁর সামনেই রাস্তার অন্য পীঠে রয়েছেন সাধনা কালী। এঁকে ছোট মা বলা হয়। ৩ ফুটের মতো শান্ত লাবণ্যময়ী মাতৃমূর্তি। ইনি শ্মশানকালী নামে খ্যাত ছিলেন। এঁর সাধনা করেই শ্রীভূতনাথ অধিকারী সিদ্ধিলাভ করেন। পূর্বে ঘটে পূজা হতো, পরে মূর্তি প্রতিষ্ঠা। যাঁরাই সিদ্ধেশ্বরী বাড়িতে পূজা দিতে আসেন, তাঁরাই এঁর কাছে এসে পূজা দেন।

কমলাকান্তের পৈতৃক ভিটার কালী

বিদ্যাবাগীশ পাড়ায় রয়েছে কমলাকান্তের পৈতৃক ভিটা। আবদুল গণি খান বলেছেন যে মহারাজাধিরাজ ত্রিলোক চাঁদ বাহাদুর সাধক কমলাকান্তের পূর্বপুরুষ রামরাম তর্ক সিদ্ধান্তকে বহু ভূ-সম্পত্তি দান করে প্রতিষ্ঠা করান।[৩] আর তা যদি হয় তবে তিলকচাঁদের রাজত্বকাল যখন ১৭৪৪-৭১খ্রীঃ, এবং কমলাকান্তের জন্ম যখন ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দ, পিতা মহেশ্বর ভট্টাচার্য,[৪] তখন কাল বিচার করে আমরা রামরাম তর্কসিদ্ধান্তকে কমলাকান্তের পিতামহ রূপে চিহ্নিত করতে পারি।

আবদুল গণি খান অম্বিকা কালনাকেই কমলাকান্তের জন্মস্থান রূপে চিহ্নিত করেছেন।[৫] তবে তিনি মানুষ হয়েছিলেন গুসকরা থানার অন্তর্গত চান্না গ্রামে। সেখানেই তিনি সিদ্ধ হন। তারই পার্শ্ববর্তী ওড় গ্রামের ডাঙ্গায় ডাকাত দ্বারা আক্রান্ত হন। গান শুনিয়ে তিনি ডাকাতদের মনে শুভবুদ্ধি জাগ্রত করেন। এরপর রাজা তেজচন্দ্র তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, এবং বর্ধমানের কাঞ্চন নগরে তাঁর সাধন কুটির নির্মাণ করে দেন। সুতরাং কমলাকান্তের পৈতৃক ভিটার কালীর সাথে কমলাকান্তের যোগসূত্র ছিল না। এটি কমলাকান্তের স্মৃতিকে জড়িয়ে সাম্প্রতিক কালের প্রতিষ্ঠা বলেই মনে হয়।

মূর্তিটি ৪ ফুটের মতো। সকাল সন্ধ্যায় নিত্যপূজা, এবং কার্তিকী অমাবস্যায় বাৎসরিক পূজানুষ্ঠান হয়।

বাজপাইদের শিবমন্দির

ছোট দেউড়ি পাড়ায় বাজপাইদের বাড়িতে রয়েছে তিনটি শিবমন্দির। দুটি মাঝারি, এবং মাঝেরটা ক্ষুদ্রাকৃতি। এগুলি আটচালা রীতির স্থাপত্য। এর কোনটিতেই টেরাকোটা সজ্জা নেই। শ্রী যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী বলেছেন যে এই তিনটি আটচালা শিবমন্দির রাজা চিত্রসেন রায়ের আমলের।[৬]

সত্যনাথের দক্ষিণেশ্বরীর মন্দির

সত্যনাথ ছিলেন এক গৃহী যোগী। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্ম। তিনি দুটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, এবং খড়ের ছাউনির মধ্যে কার্তিক মাসে দক্ষিণেশ্বরীর এবং চৈত্রে অন্নপূর্ণা পূজার সূচনা করেন। ১৩৬৭ বঙ্গাব্দে (১৯৬৫ খ্রীঃ) দক্ষিণেশ্বরীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। এখনও এই মন্দিরে নিত্য-পূজা ও বাৎসরিক উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হয়।

মদন গোপাল জীউ-এর মন্দির

কালনার ১০৮ মন্দিরের সন্নিকটে অধিকারী পাড়ায় প্রতিষ্ঠিত রয়েছে মদন গোপালজীর মন্দির। দালানরীতির দক্ষিণমুখী ঠাকুর ঘর। শ্রীমঞ্জু গোস্বামী বলেন যে বর্তমান মন্দিরটির পিছনে পূর্বে বড় মন্দির ছিল, যা ধ্বংস হয়ে গেছে। সেখানে প্রতিষ্ঠিত বঙ্কুবিহারী। কিন্তু সেই বঙ্কুবিহারী আর নেই। এবং বর্তমান বা সাবেক মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকাল জানা যায় নি। জনশ্রুতি— অদ্বৈত বংশীয়া কৃষ্ণার সাথে এই বংশের ছেলের বিবাহ হয়। কৃষ্ণাদেবী ২ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট মদনগোপালের দারুবিগ্রহটি পিতৃগৃহ থেকে নিয়ে এসে প্রতিষ্ঠা করেন। এই মদনগোপাল ছাড়াও মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন রাধারাণী, অদ্বৈত প্রভু, এবং অদ্বৈত-পত্নী সীতাদেবী। এখানে মদনগোপালজীর নিত্যসেবা প্রচলিত আছে। এখানে দোল ও রাসযাত্রা পালিত হয়। বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয় পঞ্চম দোলে। এই দোলকে বলা হয় বুড়াবুড়ির দোল।

সিদ্ধান্ত কালী বাড়ি

দাশু-পাঁচুর মোড়ের সন্নিকটেই সিদ্ধান্ত কালী বাড়ি। অর্বাচীন কালের এক দালানরীতির ঘরে দেবীর পঞ্চমুণ্ডির আসন তথা বেদী। কার্তিক মাসের

অমাবস্যায় সেই বেদীতে দক্ষিণা কালীর মৃন্ময় মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে অনাড়ম্বর ভাবে তাঁর পূজা করা হয়। ঢাক পর্যন্ত বাজানো নাকি নিষিদ্ধ। এই কালীর সম্বন্ধে কালী বাড়ির শ্রীনির্মল ব্যানার্জ্জী ৮.৫.১৯৯৭-এর এক সাক্ষাৎকারে বলেন যে তন্ত্রসাধনার এই পীঠস্থানে কেউ বলেন অম্বরীশ, আবার কেউ বলেন কমলাকান্ত এবং আরও অনেক সাধক সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। সিদ্ধিলাভ করেছিলেন বলেই এই কালীর নাম হয় সিদ্ধান্ত কালী। — এখন এই বক্তব্যকে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে প্রথমেই বলা যেতে পারে যে এই কালীর সাথে অম্বরীশকে যুক্ত করা হয়েছে মহিমা বৃদ্ধির জন্য। তবে সিদ্ধান্ত—এই নাম, এবং এই কালীর সাথে কমলাকান্তের যোগ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। পূর্বেই বলা হয়েছে যে আবদুল গণি খান অম্বিকা কালনাকেই কমলাকান্তের জন্মস্থানরূপে চিহ্নিত করেছেন।[৭] তবে তিনি মানুষ হয়েছিলেন গুসকরা থানার অন্তর্গত চান্না গ্রামে। সেখানেই তিনি সিদ্ধ হন। তারই পার্শ্ববর্তী ওড় গ্রামের ডাঙ্গায় ডাকাতদ্বারা আক্রান্ত হন। গান শুনিয়ে তিনি ডাকাতদের মনে শুভবুদ্ধি জাগ্রত করেন। এরপর রাজা তেজচন্দ্র তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, এবং বর্ধমানের কাঞ্চন নগরে তাঁর সাধন কুটির নির্মাণ করে দেন। সুতরাং সিদ্ধান্ত কালীর কাছে যে তিনি সিদ্ধিলাভ করেছিলেন, তা অযৌক্তিক। তাছাড়া, সিদ্ধিলাভ করেছিলেন বলে কালীর নাম সিদ্ধান্ত আসে নি। এই নামটি রামরাম তর্ক সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠিত কালী বলেই তাঁর উপাধি তর্কসিদ্ধান্তের 'সিদ্ধান্ত' থেকেই কালীর নামটি 'সিদ্ধান্ত কালী' হয়েছে। আর এই রামরাম তর্কসিদ্ধান্ত হলেন সাধক কমলাকান্তের পূর্বপুরুষ। সেই সূত্রেই হয়তো সিদ্ধান্ত কালীর সাথে কমলাকান্তের নামটি জড়িয়ে ফেলা হয়েছে।

আবদুল গণি খান বলেছেন যে মহারাজাধিরাজ ত্রিলোক চাঁদ বাহাদুর সাধক কমলাকান্তের পূর্বপুরুষ রাম রাম তর্কসিদ্ধান্তকে বহু ভূ-সম্পত্তি দান করে প্রতিষ্ঠা করান।[৮]

তিলক চাঁদের রাজত্বকাল ১৭৪৪-৭১ খ্রীষ্টাব্দ। আবদুল গণি খান বলেছেন যে সাধক কবি কমলাকান্তের জন্ম ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে। তার পিতা মহেশ্বর ভট্টাচার্য।[৯] আর তা যদি হয় তবে কালবিচার করে আমরা রাম রাম তর্ক-সিদ্ধান্তকে কমলাকান্তের পিতামহ বলে সনাক্ত করতে পারি, এবং ১৭৪৪ থেকে ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই যে সিদ্ধান্ত কালীর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তা অনুমান

করে নিতে পারি। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রশ্ন থাকে, যদি তাই হয় তবে বিদ্যাবাগিশ-পাড়ায় কমলাকান্তের পৈতৃক ভিটার দাবি উত্থিত হয় কেন? এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে, কমলাকান্তের পিতা মহেশ্বর ভট্টাচার্য বিচ্ছিন্ন হয়ে বিদ্যাবাগিশ-পাড়ায় বসবাস করতে পারেন। আর এই ইঙ্গিত হয়তো সেখানেই রয়েছে, যেখানে কমলাকান্তের বাল্যেই পিতৃবিয়োগ হলে কালনা ত্যাগ করে তাঁর মাতাকে পিতৃগৃহ চান্নাতে কাল কাটাতে হয়। তাই তো কমলাকান্তের বাল্য থেকে যৌবনের মধ্য পর্যন্ত কাটে চান্নায়, বাকি জীবন বর্ধমানের কোটালহাটে। এক্ষেত্রে আর একটি প্রশ্ন থাকে, সিদ্ধান্ত কালী যদি রাম রাম তর্কসিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠিত দেবতা হয়ে থাকেন, তবে সেই দেবী কি করে ব্যানার্জ্জী পরিবারের পারিবারিক দেবী হলেন? এক্ষেত্রে দুটি কারণ থাকতে পারে। এক, ব্যানার্জ্জী পরিবার কর্তৃক রাম রাম তর্কসিদ্ধান্তের সম্পত্তি ক্রয় করার সূত্রে। সেক্ষেত্রে রাম রামের উত্তর পুরুষরা সম্পত্তি বিক্রি করে অন্যত্র উঠে যেতে পারেন। দুই, ব্যানার্জ্জী পরিবার হয়তো দৌহিত্র বা আত্মীয় পরিবার। আর সেই সূত্রেই হয়তো রাম রাম তর্কসিদ্ধান্তের সম্পত্তি এবং দেবী ব্যানার্জ্জী পরিবারের হাতে এসে পড়েন।

তথ্যপঞ্জী

১। লহ প্রণাম '৯৫, স্মৃতি-তীর্থ অম্বিকা কালনা, পৃঃ—২৯-৩১
২। শ্রীসুদর্শন, শ্রাবণ ১৪০০, পৃঃ—৫০-৫১
৩। বর্ধমান রাজ, আবদুল গণি খান, ফার্মা কেএলএম, ২য় প্রকাশ ১৯৮৮, পৃঃ—২৫
৪। তদেব, পৃঃ—২৪
৫। তদেব, পৃঃ—২৪
৬। কৌশিকী, জানুয়ারী ১৯৯৫, পৃঃ—১৯৩
৭। বর্ধমান রাজ, আবদুল গণি খান, ফার্মা কেএলএম, ২য় প্রকাশ ১৯৮৮, পৃঃ—২৪
৮। তদেব, পৃঃ—২৫
৯। তদেব, পৃঃ—২৪

লোকবৃত্তের সংস্কৃতি

যে সংস্কৃতির উৎস মূলে থাকে লোক সাধারণ, যা লোক সাধারণকে আশ্রয় করে পল্লবিত হয়, তাকেই বলে লোকবৃত্তের সংস্কৃতি। তার উদ্ভব ব্যক্তি বা সমষ্টিকে কেন্দ্র করে হতে পারে। যদি ব্যক্তিকে কেন্দ্র করেও তার উদ্ভব হয়, তবে পরিণামে তা সার্বজনীন হয়ে ওঠে। আর এখানেই তার সার্থকতা। এখন কালনার মধ্যে যে পাঁচমিশেলী লোকবৃত্তের সংস্কৃতি রয়েছে, তার স্বরূপ ও গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করে আলোচনার বৃত্তের দিকে এগিয়ে যাওয়া যেতে পারে।

মহিষমর্দিনী পূজা

জনশ্রুতি—পূর্বে দেবী ছিলেন রানাঘাটের পালচৌধুরীদের গৃহদেবী। সেই দেবীর মূল পাটাতন দড়ি ছিঁড়ে কালনার হপ্তা ঘাটে উজিয়ে এসে আটকে যায়। ঈশ্বরীপ্রসাদ নন্দী নামে কালনার এক ধর্মপ্রাণ আড়তদার শুক্লপক্ষের রাতে দেবী কর্তৃক স্বপ্নাদ্দিষ্ট হয়ে দেবীর সেই পাটাতনকে উঠিয়ে এনে দেবীকে প্রতিষ্ঠা করেন। সেই থেকে মহিষমর্দিনী দেবীর পূজা ও মেলার সূত্রপাত।[১] কিন্তু এখন প্রশ্ন, সেই সূত্রপাতের সময়টি কখন?

শ্রীশ্যামল দাস 'এই মহানগর' নামক প্রতিবেদনে নয়ান চাঁদ মল্লিকের প্রসঙ্গে বলেছেন যে নয়ান চাঁদ সওদাগরী ব্যবসা করে শুধু অর্থই রোজগার করেন নি, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের (১৭৬৯ খ্রীঃ) দিনে বাংলার বিভিন্ন স্থানে তিনি স্থাপন করে দিয়েছিলেন ধর্মশালা। অম্বিকা কালনা ও কাশীধামে তাঁর তৈরী মন্দির ও ধর্মশালা তাঁর ঔদার্যের সাক্ষ্য বহন করে।[২] আর তা যদি হয়, তবে যেহেতু সেই ধর্মশালা দেবীর মন্দিরেরই এক অঙ্গ, সেহেতু বলা যায়, ১৭৬৯-৭০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই মহিষমর্দিনী পূজার সূত্রপাত হয়েছিল। কিন্তু তার উর্ধ্বতম কালসীমা কখন?

বাংলা ১০৬৯ (১৬৬২ খ্রীঃ) সনে মহেশচন্দ্র পাল হুগলী জেলার খানাকুল কৃষ্ণনগর থেকে এসে রানাঘাটে বসবাস করেন। তাঁর প্রপৌত্র কৃষ্ণপান্তির রানাঘাটে জন্ম হয় ১১৫৬ (১৭৪৯ খ্রীঃ) সনে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র (রাজত্বকাল

১৭২৮-১৭৮২ খ্রীঃ) তাঁকে 'পালচৌধুরী' উপাধিতে ভূষিত করেন।[৩] এখন দেবীর প্রতিষ্ঠা যদি ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পূর্বে হয়, তবে কৃষ্ণপান্তির বয়স ২০ বছরেরও কম। তখন তিনি যে 'পালচৌধুরী' উপাধি লাভ করছেন, তা সম্ভব হতে নাও পারে বয়সের দিক থেকে। তবে দেবীর প্রতিষ্ঠা ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের (১৭৬৯ খ্রীঃ) অব্যবহিত পূর্বে ঘটলেও পাটাতনটি যেহেতু একই বংশের (পালবংশের), এবং যেহেতু দেবীর প্রতিষ্ঠা কালের সাথে কৃষ্ণপান্তির 'পালচৌধুরী' উপাধিপ্রাপ্তির সময়কালের তারতম্য বেশি না হওয়ায় জনশ্রুতিতে পরবর্তীকালে পাটাতনের সাথে পালচৌধুরী যুক্ত হয়ে গেছে। সুতরাং বলা যায়, দেবী অম্বিকার প্রতিষ্ঠা ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কিছু পূর্বেই ঘটেছিল। তারপর থেকে শ্রাবণের শুক্লা সপ্তমী তিথি বা শ্রাবণী পূর্ণিমা ধরে চার দিনের পূজা, এবং পক্ষকাল ব্যাপী মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। সুতরাং যা ছিল ব্যক্তির, তা ব্যবসায়ীদের হয়ে পরিণামে তা সার্বজনীন হয়ে উঠেছে। তাই দেখা যায়, এই পূজা উপলক্ষে এক মাস পূর্ব থেকেই একমাত্র শহরের মধ্যেই নয়, বরং একটা বিরাট পরিমণ্ডলে উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়ে থাকে। সেই উদ্দীপনা জাতিধর্ম নির্বিশেষের মধ্যে।

পূজায় ও মেলায় দূর দূরান্তরের দেশ দেশান্তরের লক্ষ লক্ষ মানুষের ঢল নামে। শ্রী নবকুমার পাল তাঁর 'মহিষমর্দিনী' প্রবন্ধে বলেছেন যে চৈত্র মাসেই মাতৃ আরাধনার সূচনা। সেক্ষেত্রে অসুবিধা থাকায় বিধান নিয়ে চৈত্র মাসের পরিবর্তে শ্রাবণ মাসে নির্ধারিত হয় পূজার্চ্চনার।[৪]

মেলায় দোকানপাট ছাড়া থাকে নাগরদোলা. পুতুলনাচ, ম্যাজিক, চিড়িয়াখানা, কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল। আট দশ দিন ধরে চলে যাত্রাগান, থিয়েটার। নরনারায়ণের সেবা আর মাথাপিছু এক সরা করে চাল ও ৪টি করে পয়সা দান করা হয় পূজার তিনদিন। নবমীর দিন অসংখ্য ছাগ বলি হয়। যাঁরা মানসিক করেন—মানসিক অনুযায়ী তাঁরা ধূপ পোড়ান, দণ্ডী খাটেন। পূর্বে পূজার শেষে পণ্ডিত বিদায়ের প্রচলন ছিল। শ্রী নবকুমার-পাল বলেছেন যে কাশী, ভাটপাড়া, নবদ্বীপের পণ্ডিতগণকে গীতা আর কাঁসারের বাসন উপঢৌকন ও প্রণামী স্বরূপ দান করা হতো। মন্দিরের দুধারে কাঠের গ্যালারীতে সাজানো থাকত নানা ধরনের কাঁসারের বাসন।[৫]

দেবী মৃন্ময়ী মহিষাসুরমর্দিনী। এঁর মন্দির পশ্চিমমুখী। উচ্চভিত্তি-

বেদীর উপর দালান ও দুই কুঠুরিযুক্ত দালানরীতির স্থাপত্য। ঐ স্থাপত্যের সম্মুখস্থ উপরিভাগে রয়েছে চুন সুরকির একটি সিংহমূর্তি।

পূর্বে বর্ধমানাধিপতির নামেই পূজার সংকল্প করা হতো। যেহেতু কালনা ছিল তাঁরই শাসনাধীন। তা'তে কর মকুব করা হয়।

গঙ্গাপূজা

ব্যবসা-কেন্দ্ররূপে যখন থেকে কালনার শ্রীবৃদ্ধি ঘটে, তখন থেকেই কালনার ব্যবসা কেন্দ্রে উৎকলীয় মুটে মজুরদের অবস্থান। আর তাঁদেরই পরিচালনায় কালনায় গঙ্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লাদশমীতে গঙ্গা-পূজা শুরু হয়। চলে চারদিন। কালনায় এই যে উড়িয়াদের পরিচালনায় গঙ্গাপূজা, এ কিন্তু উড়িয়া সংস্কৃতিরই দান।

শ্রী বারীন রায় তাঁর 'রথযাত্রা' নামক প্রবন্ধে বলেছেন যে দূরে স্বর্গদ্বারের কাছে দেখা যাচ্ছে প্রদীপ জ্বালিয়ে আরতি করছে পুণ্যার্থীর দল। এখানেও ওরা বলে গঙ্গার আরতি। যেমন হুলিয়ারা নানা অদ্ভুত অনুষ্ঠান করে পূজা করে বালির উপর। ছাগ বলি দেয়। এটা তাদের গঙ্গাপূজা।[৬] আর এই যে উড়িয়াদের গঙ্গাপূজার ধারা, এই ধারা কালনায় বহন করে আনে উড়িয়া শ্রমিকরা।

যুগান্তর পত্রিকায় কালনার গঙ্গাপূজা সম্বন্ধে শ্রী সৌমেন পাল বলেছেন যে শেষদিনে প্রতিমা নিয়ে শোভাযাত্রা। রাস্তার দুপাশে অজস্র মানুষ বিসর্জনের শোভাযাত্রা দেখার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। এর বড় আকর্ষণ সঙ্। বড় বড় ঘোড়ার নাচ, গরুর নাচ, রাম রাবণের যুদ্ধ। উড়িয়া শ্রমিকরা বিশালাকৃতি কাঠের ঘোড়া ও গরুর নিচে ঢুকে রাস্তার উপর গরু ও ঘোড়ার নাচ নাচতে থাকে। শোভাযাত্রার আগে বাজনার তালে তালে উড়িয়া শ্রমিকরা লাঠিখেলা দেখায়। শেষে উড়িয়া সঙ্গীত খোলকরতালের সঙ্গে সমবেত কণ্ঠে জেগে ওঠে। আর এর মধ্য দিয়েই জেগে ওঠে জাতীয় সংহতির এক বিচিত্র রূপ।

এই পূজার প্রথম যুগে পাথুরিয়া মহল ও মহিষমর্দিনী তলার ব্যবসায়ী পটির উড়িয়া শ্রমিকদের নেতৃত্ব দিতেন কেদার সর্দার ও নচুবুদ্দিন (নচু) সর্দার। তারা বাঙালী হলেও আজ দুই পটির উড়িয়া শ্রমিকদের পূজা কেদার সর্দার ও নচু সর্দারের পূজা বলে চলে আসছে।

রাজরাজেশ্বরী পূজা

সাউ সরকারের মোড় থেকে পূর্বমুখী রাস্তা ধরে কিছুটা এগিয়ে গেলে বামদিকে পড়বে রাজরাজেশ্বরীতলা। বৈশাখী পূর্ণিমায় মূর্তি গড়ে দেবীর পূজার সূচনা। চারদিনের পূজা। এটি মূলতঃ বারোয়ারী পূজা। পুরুষানুক্রমিকভাবে এই পূজার তত্ত্বাবধান করে আসছেন মন্দিরের পার্শ্বস্থিত ব্যানার্জী পরিবার।

নিগূঢ়ানন্দ বলেছেন যে দশমহাবিদ্যার এক বিদ্যা ষোড়শী। ষোড়শী চিরযৌবনা। সর্বশক্তির শ্রেষ্ঠা। তাই তিনি রাজরাজেশ্বরী।[৭] এঁর মূর্তি কল্পনায় দেখা যায়, শিবের নাভিমূল থেকে উত্থিত পদ্মে পদ্মাসনা চতুর্ভুজা ষোড়শীর মূর্তি। এখানেও সেই একই মূর্তি। মূর্তির দুপাশে জয়া বিজয়া নন্দী ও ভৃঙ্গি। নীচে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ও ইন্দ্র। এগুলি পৃথক পৃথক মূর্তি। মূল মূর্তির পিছনে চালচিত্র থাকে। এর দক্ষিণমুখী মন্দির দালানরীতির।

বর্তমান মন্দিরের বয়স খুব একটা প্রাচীন নয়। এর পাশেই একটি ছোট আটচালা রীতির শিবমন্দির। কৃষ্ণবর্ণের শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। জনশ্রুতি—রাখালরা কচু তুলতে এসে শিবের মাথায় আঘাত করে। সেই আঘাতের চিহ্ন রয়েছে শিবলিঙ্গের মাথায়। রাজা স্বপ্নাদেশ পেয়ে নাকি মন্দির ও শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। এই জনশ্রুতির কথা এক সাক্ষাৎকারে বলেন শিবপ্রসাদ ব্যানার্জী। কিন্তু এই ইতিহাস কত যে প্রাচীন তা তিনি বলতে পারেন নি। তবে এর ইতিহাস ১৫০/২০০ বছরের প্রাচীন বলে মনে হয়।

শাসপুরের শীতলা পূজা

শীতলার স্বরূপ বিচার প্রসঙ্গে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন যে বৌদ্ধ সমাজের হারীতী থেকেই পরবর্তী বাংলা সমাজে লৌকিক দেবী শীতলার উদ্ভব হয়েছে বলে কেউ কেউ মনে করেন। কিন্তু পৌরাণিক জ্বাতাপহারিণীর সাথেই হারীতীর সম্পর্ক, শীতলার সাথে তাঁর কোনও সম্পর্ক নেই। তাছাড়া শীতলা প্রকৃতপক্ষে লৌকিক দেবী, অতএব বৈদিক সাহিত্যে এঁর অনুসন্ধান বৃথা।[৮] তবে এই দেবীর আবির্ভাবের ইতিহাস একেবারে অর্বাচীন কালের নয়। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন যে সেকান্দার লোদী (১৪৮৮-১৫১৬ খ্রীঃ) মথুরার মন্দিরসমূহ ধ্বংস করে হিন্দুদিগকে শীতলা পূজা করতে নিষেধ করেছিলেন।[৯] আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের বিষচিকিৎসা প্রকরণে বসন্ত রোগের অধিষ্ঠাত্রী

দেবী ও রোগপ্রশমনকর্ত্রী বলে শীতলাদেবীর উল্লেখ আছে। এই দেবীর পূজা শুধু বঙ্গদেশেই সীমাবদ্ধ নয়। ভারতের বহু স্থানেই এই শ্রেণীর দেবী পূজা প্রচলিত আছে।[10] তবে শাসপুরের শীতলার ইতিহাস একেবারেই অর্বাচীন কালের।

পূজারী সদানন্দ মুখোপাধ্যায় ২৫. ১২. ১৯৯২-এর এক সাক্ষাৎকারে বর্তমান লেখককে বলেন যে শীতলাদেবীর বর্তমান সেবাইত রতনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতামহ স্বপ্নাদ্দিষ্ট হয়ে ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করেন। আর তা যদি হয় তবে সদানন্দ বাবুর পুত্রকে ধরে ৪ পুরুষ হয়। এবং সেক্ষেত্রে প্রতি পুরুষে ২৫ বা ৩০ বৎসর ধরে বলা যায়, শীতলার প্রতিষ্ঠাকালটি ১০০ বা ১২০ বৎসরের উর্ধ্বে নয়।

মন্দিরটি ছোট এক কুঠুরীর দালানরীতির। মৃন্ময় ঘটেই দেবীর অধিষ্ঠান। দেবীর ঘট ছাড়াও মন্দিরে রয়েছে মনসার ঘট, আর গোলাকার পাথরের চণ্ডীর শিলামূর্তি। প্রতিদিন নিত্যপূজা হয়। বার্ষিক পূজা—কৃষ্ণপক্ষের শীতলা অষ্টমী তিথিতে দোলপূর্ণিমার পর ফাল্গুন বা চৈত্র মাসে। এখানে একটিমাত্র ছাগ বলি হয়। মানতকারীরা বুক চিরে রক্ত দেয়। ওষুধপত্র দেওয়া হয় না। জাতিধর্ম নির্বিশেষে অসংখ্য মানুষের সমাবেশ ঘটে। কয়েকটি বারোয়ারী পূজা আনে। পুরোহিতগণ ডাবের জল, দুধ, গঙ্গাজল ঢালেন। হাজার হাজার ডাব পড়ে। মেলা বসে।

পূর্বে বসন্ত রোগ মহামারীরূপে আত্মপ্রকাশ করত। সেক্ষেত্রে গুটিবসন্তকে প্রতিহত করার মতো শক্তি·চিকিৎসা শাস্ত্রে ছিল না। তাই দৈবী শক্তির দুয়ারে ধর্না দেওয়া। মানুষের বিশ্বাস ছিল, তিনি দেহের অসহ্য জ্বালা যন্ত্রণাকে শীতল করে দেন, তাই তার নাম শীতলা। তাঁকে প্রসন্ন করার জন্য মানুষ শীতলার থানে ছুটে গেছে। বর্তমানে চিকিৎসা পদ্ধতি গুটিবসন্তকে প্রতিহত করেছে। বসন্ত রোগজনিত মহামারীর ভয়কে জয় করেছে। তবু বর্তমান-কালেও একটা অকারণ ভয় থেকেই গেছে। তাছাড়া থেকে গেছে পূজা দেওয়ার অতীত ঐতিহ্য। তাই অন্য থানের মতো শাসপুরের শীতলার থানে এখনও দেবীর বাৎসরিক পূজায় পূজা দেওয়ার জন্য জাতিধর্মনির্বিশেষে অসংখ্য মানুষের ভীড় জমে ওঠে।

জয়চণ্ডী বা পাষাণদেবীর পূজা

মজলিস সাহেবের দীঘির পূর্ব গায়েই মীরের বাগান। সেই বাগানের

একটা ঢিবির উপর ৪½ ফুটের মতো একটি কৃষ্ণবর্ণের পাথরের পাটাতন পড়ে রয়েছে। ইনিই জয়চণ্ডীরূপে পূজিতা হন বৈশাখ মাসের সংক্রান্তি তিথিতে।

পাথরের পাটাতনটি যে ঢিবির উপর পড়ে রয়েছে তাতে আমি পুরানো ইঁটের টুকরো পেয়েছি। তা থেকে আমার মনে হয়েছে ঐ ঢিবির মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে কোন স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষ। আর ঐ পাটাতনটিও ছিল তারই অবশেষ।

এই ঢিবির দুপাশে রয়েছে একটা জমি। সংস্কারকল্পে জমিটি ঢিবির দিকে এগিয়ে যাওয়ার কালেই যতদূর সম্ভব প্রস্তর পাটাতনটি উত্থিত হয় এবং তা দেবীরূপে কল্পিতা ও পূজিতা হয়, তার উপর আরোপিত হয় দু একটা কাহিনী। যেমন, একটি জনশ্রুতি—পাথরটি ছিল এক ব্রাহ্মণ কন্যা। মজলিস সাহেব তাঁকে তাঁর দীঘি থেকে জল নিতে নিষেধ করেন। নিষেধ না শোনায় তাড়া করেন। পড়ে গিয়ে তিনি পাষাণ মূর্তিতে পরিণত হন।

অন্য জনশ্রুতিতে বলা হয়েছে—দস্যুতে তাড়া করলে ব্রাহ্মণকন্যা সতীত্ব রক্ষার জন্য ভগবানের কাছে পাষাণে পরিণত হয়ে যাওয়ার প্রার্থনা জানান। তাতে ব্রাহ্মণকন্যা পাষাণে পরিণত হয়ে যান।

পাষাণ পাটাতনটির উপরের দিকটা উঁচু-নিচু অসমতল। এর একটি অংশে শিল্পীর ছেনির ঘা রয়েছে। এটি স্থাপত্যেরই ব্যবহৃত প্রস্তর খণ্ড। তা ভিতের ক্ষেত্রে বা মেঝেতে ব্যবহৃত হয়েছিল বলেই মনে হয় এর নীচের সমতল অংশকে উপরে রেখে। এর অসমতল অংশে নারীর বক্ষদেশের একটা অস্পষ্ট আদল থাকায় এর উপর ব্রাহ্মণ কন্যার কাহিনী আরোপিত হয়েছে। এক্ষেত্রে কাহিনীর সাথে পূজাবিধির কোন সঙ্গতি নেই। কারণ ব্রাহ্মণ কন্যা দেবীরূপে পূজিতা হতে পারেন, কিন্তু কি করে তিনি জয়চণ্ডীতে রূপান্তরিত হতে পারেন? এক্ষেত্রে হয়তো কষ্টকল্পিত কাহিনীর অনুসরণে বলা যায়, ঐ ব্রাহ্মণ-কন্যা ছিলেন ছদ্মবেশী জয়চণ্ডী। কিন্তু তা যদি হয় তবে তিনি অন্তর্হিতা না হয়ে পাথরে পরিণত হতে যাবেন কেন? যতদূর মনে হয়, এর সাথে জড়িয়ে গেছে ফকির বিদ্রোহের ছায়া। আর তার ইঙ্গিত রয়েছে যখন জনশ্রুতিতে কাহিনী মজলিস সাহেব থেকে মোড় নিয়ে দস্যুর প্রসঙ্গে চলে যায়।

আমরা জানি, ছিয়াত্তরের অব্যবহিত আগে ও পরে বাংলার রঙ্গমঞ্চে মজনু শাহের নেতৃত্বে আবির্ভূত হয়েছিলেন সন্ন্যাসী ও ফকিরের দল। এদের

ইংরেজদের কাগজপত্রে 'দস্যু' আখ্যায় অভিহিত করা হয়েছে। ওয়ারেন হেষ্টিংসের ভাষায়—পেশাদারী ডাকাত বা তীর্থযাত্রার নামে ভিক্ষাবৃত্তি, চুরি ও লুণ্ঠনে অভ্যস্ত দস্যু।[১১]

এদের মধ্যে অনেক কামাতুর ফকির ছিল। তার উদাহরণ ১২২০ বঙ্গাব্দের ১৪ই কার্তিক পঞ্চানন দাস রচিত 'মজনুর কবিতা'। তিনি বলেছেন—

ভাল মানুষের কুলবধূ জঙ্গলে পালায়।
লুটেরা ফকির যত পাছে পাছে ধায়॥
যদি আসি লাগ পায় জঙ্গলের ভিতর।
বাজে আসি ধরে যেন লোটন কৌতর॥
বসন কাড়িয়া লয় চাহে আলিঙ্গন।
যুবতি কাকুতি করি কি বলে বচন॥
দন্তে কুটা করি বাপু ধরি হাত পাও।
অতিথ ফকির তোমরা দুনিয়ার বাপ মাও॥

এম. এ. জব্বার বলেছেন যে ছয় ফকির গোষ্ঠীর এক গোষ্ঠী মীর।[১২] আর প্রস্তর খণ্ডটি যখন মীরের বাগানে রয়েছে, এবং যেখানে মূর্তিটির মধ্যে নারী মূর্তির এক আধটু আদল রয়েছে, সেখানে মানুষের মনে কামাতুর ফকিরদের যে ছায়ারূপ ছিল, সেই স্মৃতিছায়াই মূর্তিটির উপর আরোপিত হয়েছে। আর তা ১০০ বছরের ঊর্ধ্বে হয়েছে বলে মনে হয় না।

এখানে ফকির বিদ্রোহের স্মৃতিরূপ আরোপ করে কাহিনীতে ব্রাহ্মণকন্যার সতীত্ব রক্ষা করে তাকে দেবীত্ব দান করা হয়েছে, এবং কল্পনাকে আরও ঊর্ধ্বগামী করে তাঁকে রূপান্তরিত করা হয়েছে জয়চণ্ডীতে। তবে যাই হোক না কেন, বাৎসরিক পূজায় এখানে পূজার্থীর ভিড় জমে। ছোটখাটো মেলা বসে।

কানাদীঘির চড়ক পূজা

পূর্ণ সিনেমার সন্নিকটে একপেড়ে। সেখানে কানাদীঘির পশ্চিম পাড়ে চৈত্র সংক্রান্তিতে চড়কপূজা অনুষ্ঠিত হয়। বাণ ফোঁড়া হয়। একটা আধ বেলার মেলাও বসে। চড়কগাছ ঘোরে। এখানে হালেই একটা কিলকাকার মন্দির প্রতিষ্ঠা করে শিবদুর্গার মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। চড়কের সময় কানাদীঘি ও যোগীপাড়ার কলোনীর শিবপূজাকে কেন্দ্র করে সং-এর মাধ্যমে শিবদুর্গা-সংক্রান্ত নৃত্যাভিনয় করা হয়।

সরস্বতী পূজা, কালী পূজা ইত্যাদি

লোকবৃত্তের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কালনার সরস্বতী পূজা, মনসার ঝাঁপান, কালীপূজা, দুর্গাপূজা, বিশ্বকর্মা পূজা এবং একান্তই হাল আমলের শনিপূজার ভূমিকা বিশেষভাবে স্মরণীয়। আর এ সবের মধ্য দিয়েই বয়ে চলেছে কালনার সংস্কৃতি।

দেবী আনন্দময়ী

কালনা চকবাজারের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে এক উত্তরমুখী মন্দিরে রয়েছেন দেবী আনন্দময়ী। অষ্টাদশ শতকের কোন এক সময় যে এর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, তা অনুমান করে নেওয়া যায়। এঁর নিত্যপূজা হয়ে থাকে। শ্রীতরুণ ভট্টাচার্য এই দেবীর প্রসঙ্গে বলেছেন যে শায়িত শিবের বস্তিদেশে উপবিষ্টা কালী। দেবীমূর্তি কুল-কুণ্ডলিনীরূপে প্রকাশিতা। এই মূর্তি বিপরীত তুরীতুয়া নামে খ্যাতা।[১৩] কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির শবশিবা প্রস্তর মূর্তির কথা স্মরণ করতে পারতাম। শ্রীসুধীর চক্রবর্তী বলেছেন যে শবরূপী শিবের উপরে স্থাপিত শয়ান মহাকালের সঙ্গে বিপরীত রতাতুরা মহাকালী।[১৪] কিন্তু মূর্তিটি আসলে শায়িত শিবের নাভিপদ্মে উপবিষ্টা কাষ্ঠনির্মিত চতুর্ভূজা দেবীর'। এই কালীমূর্তির সাথে হুগলীর সুখাড়িয়ার আনন্দময়ীর সাদৃশ্য রয়েছে। তবে বসার ভঙ্গীতে যা একটু পার্থক্য। তিনি তুরীয় আনন্দের জন্যই আনন্দময়ী বা তুরীতুয়া।

কার্তিক লড়াই

কার্তিক পূজা অনুষ্ঠিত হয় কার্তিক মাসের সংক্রান্তির দিন। ডঃ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের মতে কার্তিক ঠাকুর আদিতে ছিলেন কৃষি ও প্রজননের দেবতা।[১৫] কার্তিক পূজার পরদিন কার্তিকগুলিকে পথে বার করে ঠাকুর দেখানোর যে প্রতিযোগিতা, তাকে বলা হয় 'কার্তিকের লড়াই'। কাটোয়ার এই 'কার্তিকের লড়াই' এক উল্লেখযোগ্য লোক-উৎসব। এই উৎসবের উৎস সন্ধান করতে গিয়ে 'সাপ্তাহিক কাটোয়া পত্রিকা'র ১৯৭২-এর ৭ম বর্ষ ৪৬/৪৭ সংখ্যায় প্রকাশিত 'কাটোয়ার কার্তিক লড়াইয়ের আদি উৎস' নিবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র ঘোষ লিখেছেন যে কাটোয়ার আড়ম্বরপূর্ণ এই কার্তিকপূজার সূতিকাগার এখনকার রক্ষিতালয়-

গুলি। এক্ষেত্রে ডঃ সুধীর চক্রবর্তী বলেছেন যে বিশেষভাবে গঙ্গাতীরবর্তী অঞ্চলেই এই পূজার প্রসার নিঃসন্দেহে ব্যবসাদার, সওদাগর এবং তাদের ব্যসনসঙ্গিনী বারবনিতাদের সংযোগের স্মারক।[১৬] তবে এই উৎসব শেষপর্যন্ত সওদাগর ও বারবনিতাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নি। তা লোক উৎসবে পরিণত হয়েছে। সেক্ষেত্রে কাটোয়াই ছিল এর উৎস। এই উৎস থেকেই এই উৎসবের ঢেউ কালনা মহকুমার কাটোয়ার সন্নিহিত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল বলে মনে হয়। শ্রীযজ্ঞেশ্বর চৌধুরী তাঁর বর্ধমান: ইতিহাস ও সংস্কৃতি (৩য় খণ্ড) গ্রন্থে বলেছেন যে নবদ্বীপের রাস ও কাটোয়ার কার্তিক পূজার অনুকরণে কার্তিক মাসের সংক্রান্তির দিন বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি গড়ে পূজা হয় এবং পরের দিন বিরাট বিরাট মূর্তিগুলিকে গরুর গাড়ীর চাকার উপর বসিয়ে গ্রাম প্রদক্ষিণ করা হয়। পূর্বস্থলী ও তার নিকটবর্তী চুপি, কাষ্ঠশালী ও পলাশপুলি গ্রামে কার্তিক পূজা হয়।

তথ্যপঞ্জী

১। ব্যতিক্রম, শীত সংখ্যা ১৩৯৫, পৃঃ ৮২-৮৬

২। ওভারল্যাণ্ড, ২৫শে অক্টোবর ১৯৯২, পৃঃ—১১

৩। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, ডঃ অলোক কুমার চক্রবর্তী, প্রগ্রেসিভ বুক ফোরাম, ১ম প্রকাশ ১৯৮৯, পৃঃ ২১১-১২

৪। ব্যতিক্রম, শীতসংখ্যা ১৩৯৫, পৃঃ ৮৯-৯০

৫। তদেব, পৃঃ—৯১-৯২

৬। দেশ, ১৩৯৪-এর শারদীয়ার পরের কোন সংখ্যা, পৃঃ -- ৬৬

৭। মহাতীর্থ একান্নপীঠের সন্ধানে, নিগূঢ়ানন্দ, শরৎ পাবলিশিং, ১ম প্রকাশ ১৩৮৫, পৃঃ ৯৬-৯৭

৮। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, এ. মুখার্জী, ৬ষ্ঠ সং ১৯৭৫, পৃঃ ৮৮৬-৮৮

৯। তদেব, পৃঃ—৮৮৫

১০। **The Cult of the Goddess of Small pox in West. Bengal, Asutosh Bhattacharyya, Quarterly Journal of the Mythic Society, XLIII (1995), pp. 55-56**

১১। আঠারো শতকের বাংলা পুঁথিতে ইতিহাস প্রসঙ্গ, ডঃ অণিমা মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যলোক, ১ম প্রকাশ ১৯৮৭, পৃঃ—২০০

১২। বালান্দায় প্রাচীন সভ্যতার প্রবাহ ও গোরাই গাজী, এম. এ. জব্বার, বালান্দা প্রত্নসংগ্রহশালা, ১ম সং ১৩৯১, পৃঃ—৯

১৩। কালনার ইতিহাস, তরুণ ভট্টাচার্য, মাতৃকা প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ ১৯৯৬, পৃঃ—গ

১৪। পশ্চিমবঙ্গের মেলা ও মহোৎসব, সুধীর চক্রবর্তী, ১ম প্রকাশ ১৯৯৬, পুস্তক বিপণি, পৃঃ—১০৬

১৫। বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি (৩য় খণ্ড), যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, পুস্তক বিপণি, ১ম প্রকাশ ১৯৯৪, পৃঃ—১১৭

১৬। পশ্চিমবঙ্গের মেলা ও মহোৎসব, সুধীর চক্রবর্তী, পুস্তক বিপণি, ১ম প্রকাশ ১৯৯৬, পৃঃ—৪৯

গির্জা, মঠ ও আশ্রমিক সংস্কৃতি

উনিশ শতকে কালনায় একটি গির্জা প্রতিষ্ঠিত হয়। তাছাড়া, বিশ শতকে কালনায় আর একটি গির্জা, একটি বৌদ্ধ মঠ, এবং কয়েকটি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐসব গির্জা (প্রথমটি বাদে), মঠ ও আশ্রমে নিত্যসেবা, ভাণ্ডারা ও উৎসব ক্রিয়াদি চলে। আর এসবের মধ্য দিয়েও বয়ে চলে কালনার সংস্কৃতি।

গির্জা

১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে চার্চ মিশনারি সোসাইটি কালনার হাঁসপুকুর অঞ্চলে এক গির্জা স্থাপন করেন। সেটি অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার অভাবে বন্ধ হয়ে যায়। এরপর ফ্রি-চার্চ অফ স্কটল্যাণ্ড-এর প্রটেস্ট্যাণ্ট মিশনারিরা এখানেই একটি হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও একটি গির্জা তৈরী করেন। সেইসূত্রে এখানে আসেন পাদ্রি কুরি ও ডিয়ার। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে আসেন পাদ্রি আলেকজাণ্ডার। এরপর আসেন সাহিত্যিক রেভারেণ্ড লালবিহারী দে। কিন্তু অতীতের ঐতিহ্যপূর্ণ মিশন হাউসের হলঘর, এবং হাসপাতালটি (পুরানো) ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। মিশন রোডের উপর প্রাথমিক বিদ্যালয়টি কোনমতে অস্তিত্ব রক্ষা করছে।[১] তবে Sacred Heart Church-এর উদ্যোগে ১৯৬৭-তে নূতন করে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার শুরু হয়। মিশন কর্তৃপক্ষ তেঁতুলতলার অদূরে পানেদের কলবাড়ির পাশে একটি নূতন গির্জা তৈরী করেন। প্রতি বছর ২৪শে ডিসেম্বর রাত্রে এঁরা একটি শোভাযাত্রা বার করেন, এবং নগর পরিক্রমা করেন যীশুখ্রীষ্টের জন্মলীলার অভিনয় সহকারে। ২৫শে ডিসেম্বর সাড়ম্বরে বড়দিনের উৎসব পালিত হয়। একটি ছোট মেলাও বসে। এই উৎসব জাতি-ধর্মনির্বিশেষের হয়ে ওঠে।

জ্ঞানানন্দ মঠ

জ্ঞানানন্দ মঠের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ নিত্য গৌরাবানন্দ অবধূত। ১২৬১ সালের ১৩ই চৈত্র বাসন্তী অষ্টমী তিথিতে ২৪ পরগণার পাণিহাটিতে তাঁর জন্ম।

তিনি ১৩৩৩-৩৪ সালে নেপপাড়ায় (নৃপপল্লী) জ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন।[২] তাঁর প্রতিষ্ঠিত আশ্রমে দোলপূর্ণিমা, গুরু পূর্ণিমা ও জন্মাষ্টমীতে উৎসব হয়। পৌষ মাসের কৃষ্ণা সপ্তমীতে হয় বাৎসরিক ভাণ্ডারা। এতে বহু সাধুসন্ত এবং বহু ভক্তের সমাবেশ হয়।

যোগানন্দের ঝুপড়ি

তেঁতুলতলা থেকে বাজারমুখী রাস্তা ধরে এগোলে বারুই পাড়ার বারোয়ারী তলার পূর্বেই পড়বে যোগানন্দের ঝুপড়ি। শ্রীঅনিল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যে ১৩৩২ সালের ৪ঠা আশ্বিন যোগানন্দ মহারাজ আশ্রমটি প্রতিষ্ঠা করেন।[৩] এখানে কালীমা প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু বর্তমানে আশ্রমটি হীনপ্রভ।

আনন্দ আশ্রম

জ্ঞানানন্দ সরস্বতীর বাল্যনাম ছিল বিষ্ণুপ্রিয়া। ইনি নেপালের এক রাজ্যের রাজা ধীরসিং সামসের জং বাহাদুর রাণার কন্যা। আবাল্য সন্ন্যাসিনী এই সাধিকা ১৩৪০ সালের ১৪ই আষাঢ় পঞ্চমী তিথিতে ছোট দেউড়ি পাড়ায় আনন্দ আশ্রম এবং জ্ঞানেশ্বর মহাদেবের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৩৫৩ সালের ৩০শে ফাল্গুন তাঁর প্রয়াণ হয়।[৪] কিন্তু এখনও তাঁর আশ্রমে উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

ভবাপাগলার আশ্রম

কালনার হাঁসপুকুর অঞ্চলে ভবাপাগলার আশ্রম। তিনি ছিলেন কবি ও কালী সাধক। ঢাকা জেলার আমতা গ্রাম থেকে পাথরের কালী-মূর্তি নিয়ে এখানে আসেন। এখানে প্রায় ৪০/৪৫ বছর পূর্বে ভবানী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর প্রয়াণের পর তাঁর স্বনির্মিত সমাধিক্ষেত্রে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। আজও তাঁর আশ্রমে তাঁর ভবানীর পূজা করা হয়, এবং তাঁর জন্মতিথি উপলক্ষে উৎসব অনুষ্ঠানাদি করা হয়।

নিগমানন্দ সারস্বত আশ্রম

বকুলতলা থেকে কিছুটা এগিয়ে গেলেই নিগমানন্দ সারস্বত আশ্রম। শ্রীঅনিল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যে আনুমানিক ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে এসেছিলেন নিগমানন্দ পরমহংস। তিনি উঠেছিলেন কালনার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সচ্চিদানন্দ সাহার

বাড়িতে।[৫] তাঁরই স্মৃতিতে প্রতিষ্ঠিত হয় নিগমানন্দ সারস্বত আশ্রম। তাঁর জন্মদিনে এখানে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

উড়ুলোমি গৌড়ীয় আশ্রম

পাথুরিয়া মহলের ঘাট পেরিয়ে সরিষাপটীতে গঙ্গার তীরে পরিব্রাজক ভুবনমোহন দাস ব্রহ্মচারী তাঁর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দে। উড়ুলোমি ঋষির নামানুসারে এই আশ্রমের নামকরণ করা হয় উড়ুলোমি গৌড়ীয় আশ্রম। এই আশ্রমের দ্বিতলের একটি কক্ষে শ্রীগোদ্রুমবিহারী রাধাগোবিন্দ জীউ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। এখানে ভাদ্রমাসের জন্মাষ্টমীতে দশদিনব্যাপী, এবং মাঘী ত্রয়োদশীতে দশদিনব্যাপী উৎসব হয়।[৬]

এছাড়া সীতারাম দাস ওঙ্কার নাথের আশ্রম, বৈদ্যপুর মোড়ে প্রতিষ্ঠিত অনুকূলচন্দ্রের আশ্রম, ভারত সেবাশ্রম অনুমোদিত ১৩৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হিন্দু মিলন মন্দির, বৌদ্ধমঠ ইত্যাদি মঠ আশ্রমের উৎসব অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে কালনার সংস্কৃতি বহমানা।

তথ্যপঞ্জী

১। কৌশিকী, জানুয়ারী ১৯৯৫, পৃঃ—১৯৫-৯৬

২। তীর্থক্ষেত্র কালনা, অনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও দিলিপ বসু, কালনা, ১ম প্রকাশ ১৩৯৯, পৃঃ—১৮

৩। তদেব, পৃঃ—১৭

৪। তদেব, পৃঃ—১৭

৫। তদেব, পৃঃ—৫৩

৬। তদেব, পৃঃ—২৬

কালনার মসজিদ ও মন্দির প্রতিষ্ঠার ক্রমিক সময়পঞ্জী

	মসজিদ বা মন্দিরের নাম	প্রতিষ্ঠাতা	সময়	কার রাজত্বকাল
১।	মজলিস সাহেবের মসজিদ	মজলিস সাহেব	১৪৯০ খ্রীঃ	মাহমুদ শাহের
২।	দাঁতন কাঠি তলার মসজিদ	উলুগ মসনদ খান	১৫৩৩ খ্রীঃ	সুলতান আলাউদ্দিন ফিরোজশাহের
৩।	সরওয়ার খান মসজিদ	সর্ওয়ার খান	১৫৫৯ খ্রীঃ	সুলতান গিয়াস্-উদ্দিন বহাদুর শাহের
৪।	লালজী মন্দির	ব্রজকিশোরী	১৭৩৯ খ্রীঃ	রাজা কীর্তিচন্দ্রের
৫।	সিদ্ধেশ্বরীর মন্দির	রাজা চিত্রসেন	১৭৩৯ খ্রীঃ	রাজা কীর্তিচন্দ্রের
৬।	সিদ্ধেশ্বরী বাড়ির রামদেবের শিবমন্দির	রামদেব নাগ	১৭৪৬ খ্রীঃ	রাজা ত্রিলোকচন্দ্রের
৭।	কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দির	লক্ষ্মীদেবী	১৭৫১ খ্রীঃ	রাজা ত্রিলোকচন্দ্রের
৮।	জগন্নাথ ঘাটের জোড়া মন্দির	ছন্দকুমারী ও ইন্দ্রকুমারী	১৭৫৩ খ্রীঃ	রাজা ত্রিলোকচন্দ্রের
৯।	অনন্ত বাসুদেবের মন্দির	ব্রজকিশোরী	১৭৫৪ খ্রীঃ	রাজা ত্রিলোকচন্দ্রের
১০।	মাইজী বাড়ির শ্যামচন্দ্রের মন্দির	কোশলা দেবী	১৭৫৫ খ্রীঃ	রাজা ত্রিলোকচন্দ্রের
১১।	গিরি গোবর্দ্ধন মন্দির	রাজা ত্রিলোকচন্দ্র	১৭৫৯ খ্রীঃ	রাজা ত্রিলোকচন্দ্রের
১২।	রূপেশ্বর শিব মন্দির	রূপকুমারী	১৭৬১ খ্রীঃ	রাজা ত্রিলোকচন্দ্রের
১৩।	বিষণকুমারীর শিব মন্দির	বিষণকুমারী	১৭৬৩ খ্রীঃ	রাজা ত্রিলোকচন্দ্রের
১৪।	সিদ্ধেশ্বরী বাড়ির লক্ষ্মীদেবীর শিবমন্দির	লক্ষ্মীদেবী	১৭৬৩ খ্রীঃ	রাজা ত্রিলোকচন্দ্রের

মসজিদ বা মন্দিরের নাম	প্রতিষ্ঠাতা	সময়	কার রাজত্বকাল
১৫। কাশীনাথ মন্দির	তুলসীদেবী	১৭৬৫ খ্রীঃ	রাজা ত্রিলোকচন্দ্রের
১৬। গোপালজীর মন্দির	শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র	১৭৬৬ খ্রীঃ	রাজা ত্রিলোকচন্দ্রের
১৭। রামেশ্বর শিবমন্দির	বিষণকুমারী	১৭৮৩ খ্রীঃ	রাজা তেজচন্দ্রের
১৮। নব-কৈলাস (১০৮) মন্দির	রাজা তেজচন্দ্র	১৮১০ খ্রীঃ	রাজা তেজচন্দ্র
১৯। তেজচন্দ্রের সমাধি মন্দির	মহতাব চাঁদ	১৮৩২ খ্রীঃ	রাজা মহতাবের
২০। গঙ্গাদেবীর শিব মন্দির	গঙ্গাদেবী	১৮৪২ খ্রীঃ	রাজা মহতাবের
২১। দেবকী দেবীর শিব মন্দির	দেবকীদেবী	১৮৪৫ খ্রীঃ	রাজা মহতাবের
২২। জেলেপাড়ার মসজিদ	খয়েরউল্লা	১৮৪৫ খ্রীঃ	রাজা মহতাবের
২৩। জলেশ্বর (প্রতাপেশ্বর) মন্দির	প্যারীকুমারী	১৮৬১ খ্রীঃ	রাজা মহতাবের
২৪। কমলকুমারীর সমাধি মন্দির	পরাণচন্দ্র	১৮৬১ খ্রীঃ	রাজা মহতাবের
২৫। রাজা মহতাব চন্দ্রের সমাধি মন্দির	আফতাব চাঁদ	১৮৮১ খ্রীঃ	রাজা আফতাব চাঁদের
২৬। লক্ষ্মী (গজলক্ষ্মী) মন্দির	রাধারাণীদেবী	১৯১৯ খ্রীঃ	রাজা বিজয়চাঁদের

দেবী সিদ্ধেশ্বরী, কালনা।

কৃষ্ণচন্দ্রজী, কালনা।

লালজী বাড়িতে অবস্থিত গিরি গোবর্দ্ধন মন্দিরের একাংশ।

লালজী, কালনা।
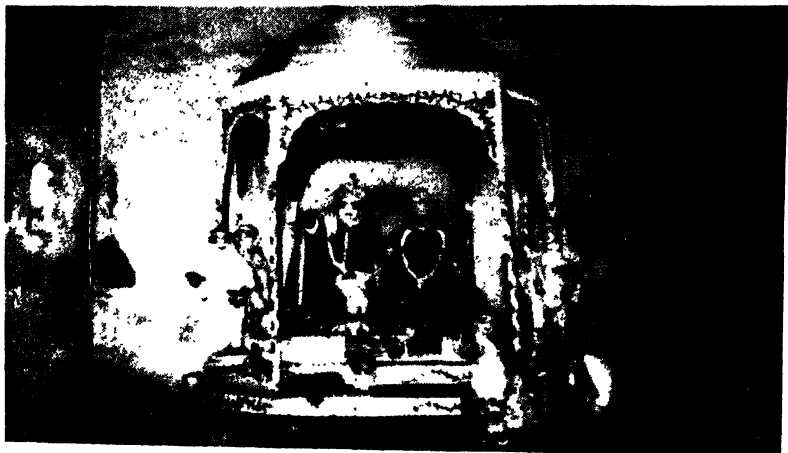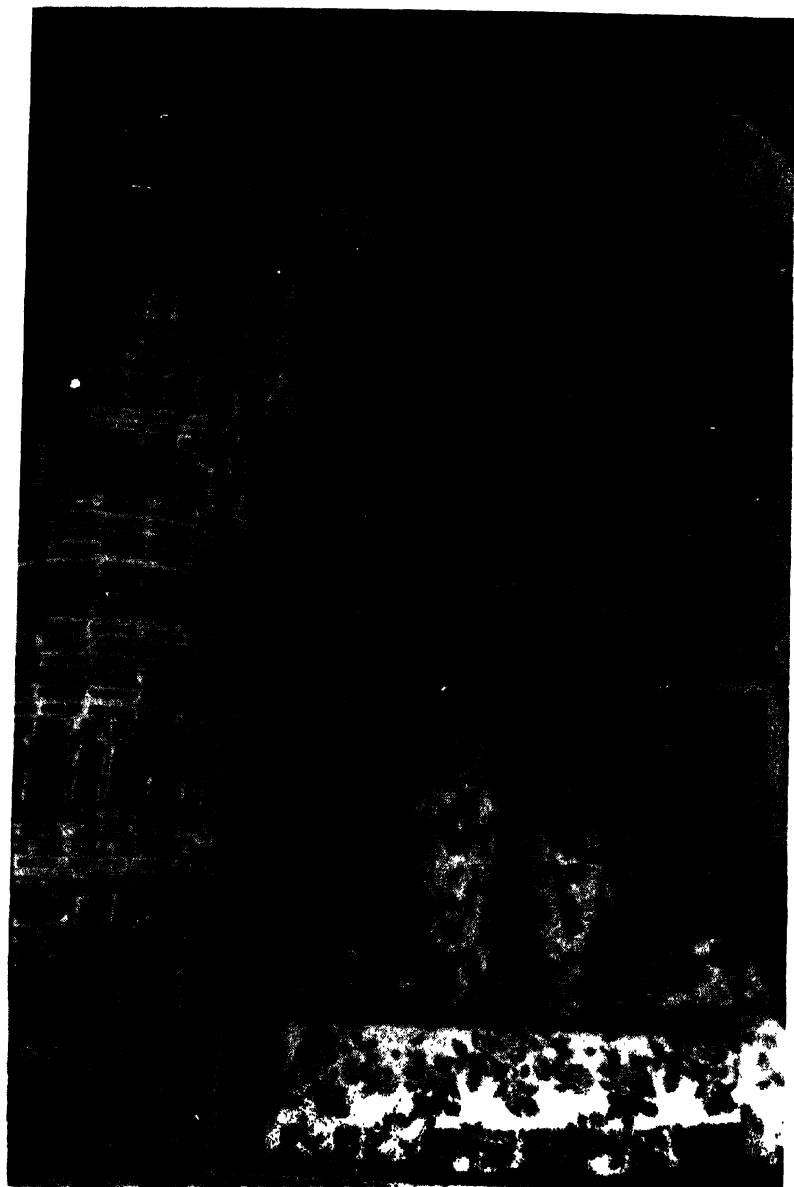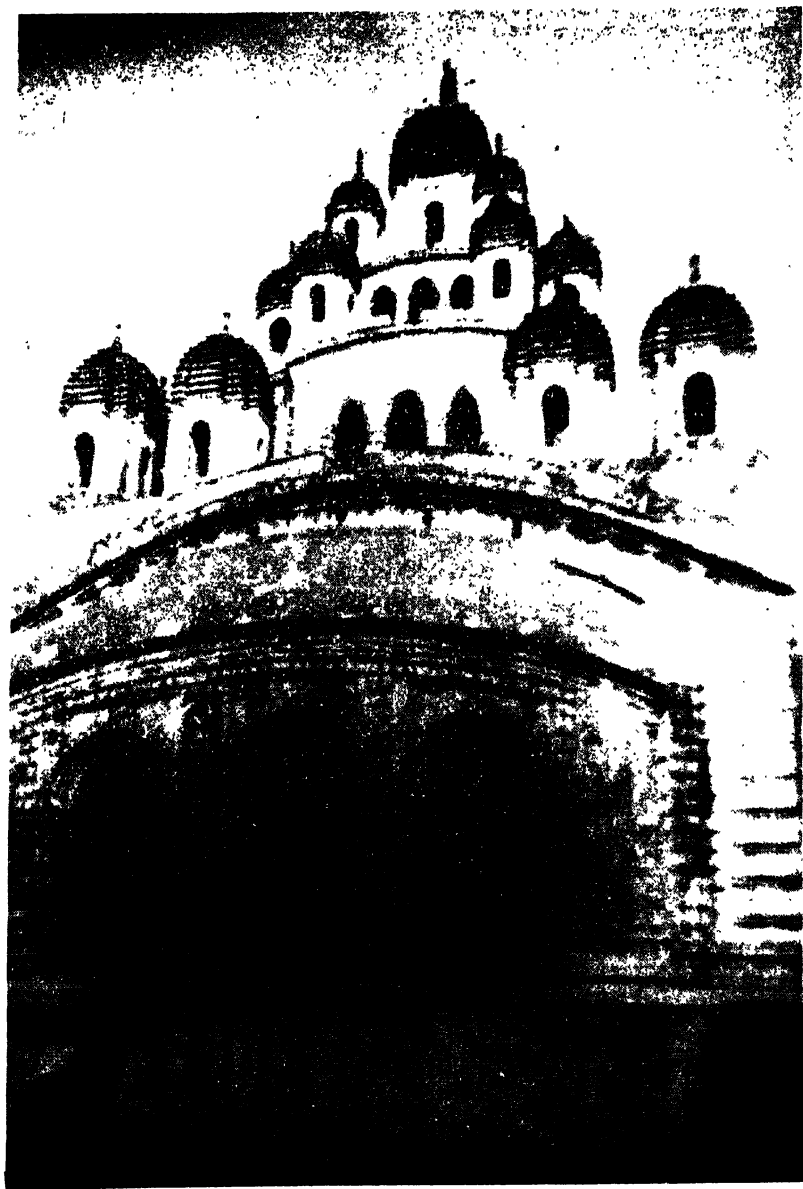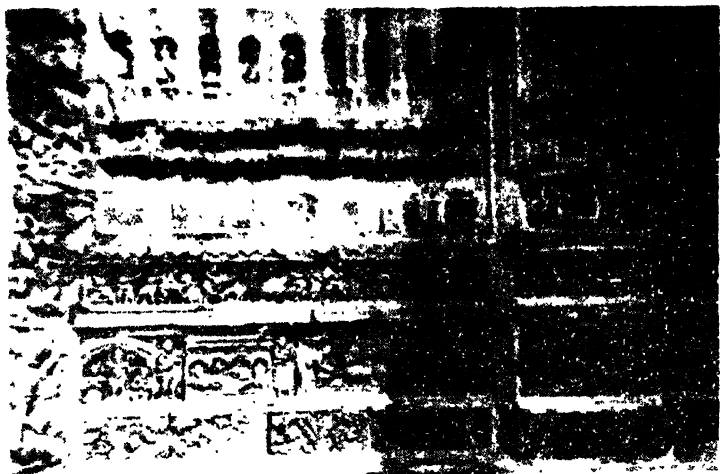
কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দির, কালনা।

কালনার কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দির গাত্রে টেরাকোটার কাজ।

কালনার শাসপুরে অবস্থিত ধ্বংসোন্মুখ বড় মসজিদ।

কালনার জলেশ্বর মন্দির।
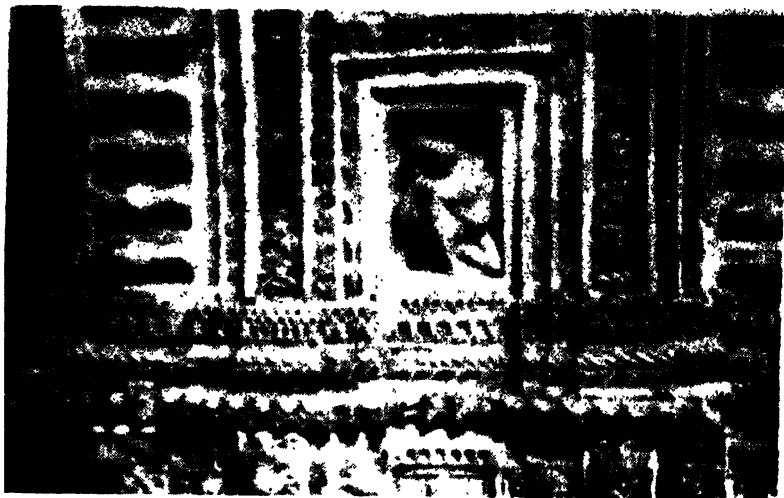
কালনার জলেশ্বর মন্দিরের টেরাকোটায় ক্রন্দনরতা বালিকা।
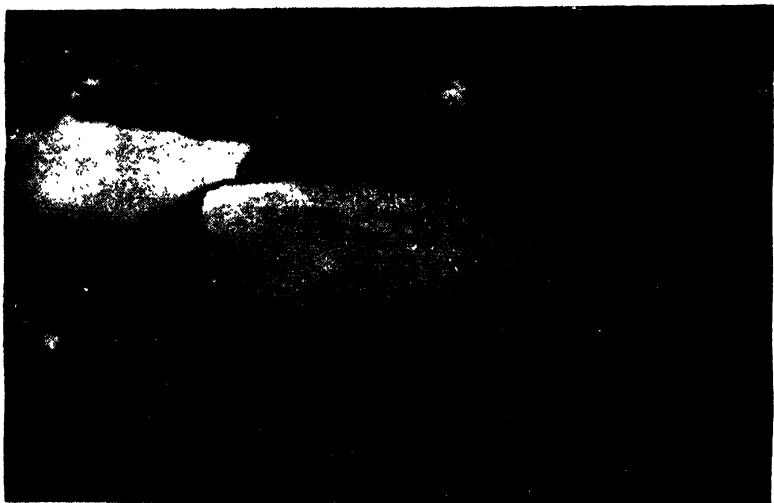
কালনার শাসপুরের বড় মসজিদে পাথরের গায়ে অঙ্কিত তৃণ ভক্ষণরত হরিণ।
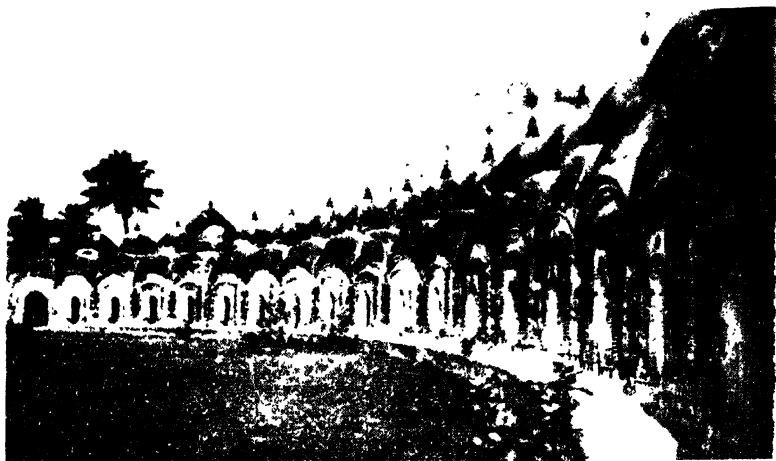
কালনার ১০৮ মন্দিরের একাংশ।
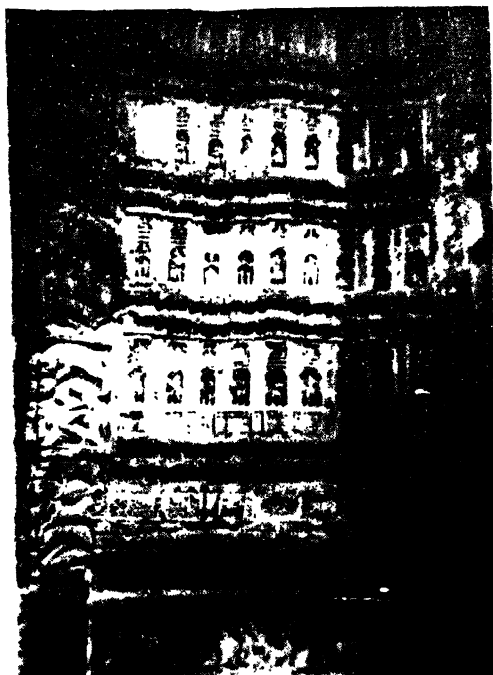
কালনার লালজী মন্দিরের টেরাকোটার কাজ।

গ্রাম খণ্ড

প্রত্নতত্ত্ব ও সংস্কৃতির ইতিবৃত্ত ঃ কালনা মহকুমার কিছু গ্রাম সমীক্ষা

সর্বমঙ্গলা

সর্পপূজা তথা মনসা পূজার ঐতিহ্য অতি প্রাচীন। ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন "মনসা-কাহিনীর সূত্রপাত বৈদিক যুগে, এবং পূর্বভারতে বৈদিক যুগ শেষ হইবার আগেই তিনি বাস্তুদেবতায় বা গ্রাম দেবীতে পরিণত হইয়াছিলেন।"[১] তবে পঞ্চদশ শতকে যখন মনসামঙ্গল পরিণত ও পরিপূর্ণ কাব্যরূপ লাভ করেছে, এবং চতুর্দশ শতকে সমাজে যখন ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের প্রতিষ্ঠা ঘটেছে, তখন থেকেই সর্পপূজা তথা মনসাপূজার চর্চা ও চর্যা বিস্তৃততর হয়। কাহিনীর সূত্রে লোকসমাজে মনসার নানা নাম ছড়িয়ে পড়তে থাকে, যার কিছু প্রাচীন ঐতিহ্যানুসারী, কিছু কবিদের নিজস্ব সৃষ্টি, এবং কিছু লোককথার দ্বারা সৃষ্ট। আর ঐসব নামেই মনসাদেবী লোকসমাজে পূজিতা হয়ে থাকেন। তাঁর বিচিত্র নামের তালিকা মনসামঙ্গল কাব্যসমূহে রয়েছে। শ্রী কামিনীকুমার রায় বলেছেন যে বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন তিথিতে ও তারিখে পূর্ণাঙ্গ মূর্তিতে, ঘটে, পটে, প্রস্তরখণ্ডে, মাটির ঢিবিতে, মনসাগাছে, মনসা মেড়ে ইত্যাদি নানা রূপে মনসার পূজা হয়। শুধু মনসা নামেই নয়—বহু বিচিত্র নামে ইনি পূজিতা হন। যেমন—বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমানে কমলা ; বাঁকুড়ায় কানাই চণ্ডী, কানী, কালিমা ; মুর্শিদাবাদ, হুগলী, মেদিনীপুরে কেতকা ; দিনাজপুরে গাছপূজা ; বীরভূমে চিন্তামণি ; চব্বিশ পরগণায় চেঙ্গ মুড়ি কানি ; বাঁকুড়া, বর্ধমান, হুগলী, মেদিনীপুর, দিনাজপুরে জগৎগৌরী ; বীরভূমে জগৎমাতা, জরৎকারু, দিদি ঠাকরুণ, ডুলেরামা, পদ্মবাহিনী, পাতালকুমারী, বগা, বসন্তকুমারী, মঙ্গলচণ্ডী, মরকী বা মারাই, শিবানী, হংসবাহিনী ; বর্ধমানে জগাতী, ঝঙ্কেশ্বরী, আসা, পীতাম্বরী, বনকুমারী, ব্রহ্মাণী ; বর্ধমান, দিনাজপুরে নাগমাতা, বাসুলী ; জলপাইগুড়ি, কোচবিহারে ভাদই ব্রত ; হাওড়া, চব্বিশ পরগণায় রান্নাপূজা ; বাঁকুড়া, বীরভূমে শাকম্ভরী ; হাওড়া, বীরভূমে শীতলা ; জলপাইগুড়ি, কোচবিহার,

মালদহ, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট, ঢাকায় শ্রাবণী ব্রত ; আর সর্বত্র পদ্মা, পদ্মাবতী, মনসা, বিষহরী।[২] এখানে এই যে বিচিত্র নাম, এই নামের মধ্যে আর একটি নাম সর্বমঙ্গলা। উড়িষ্যার কবি সরল দাস তাঁর চণ্ডীপুরাণ ও বিলঙ্ক রামায়ণে সর্বমঙ্গলাকে কালীর সঙ্গে অভিন্ন রূপে কল্পনা করেছেন। কবি রামদাস আদক তাঁর অনাদিমঙ্গলে চণ্ডীকেই সর্বমঙ্গলা বলেছেন।[৩] তন্ত্রবিভূতির উত্তরবঙ্গের পুঁথিতে মনসার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে 'নাট নাটেশ্বরী বন্দো সর্বমঙ্গলা'। আর এই সর্বমঙ্গলা নামেই মনসা সর্বমঙ্গলা গ্রামে পূজিতা হন।

কালনা স্টেশন। তার সংলগ্ন একটি মাঠ। সেই মাঠের এক প্রান্তে স্টেশনের মুখোমুখী গ্রামটি। বেহুলা নদীর তীরে অবস্থিত। এই সর্বমঙ্গলা গ্রামের পূর্ব প্রান্তে একটি পুরাতন বৃহৎ তেঁতুল গাছের তলায় গ্রামদেবী সর্বমঙ্গলার অধিষ্ঠান। দেবীর ঘটে পূজা। ঘটটি সিজবৃক্ষের তলায় স্থাপিত। ভাদ্র মাসের শুক্ল পক্ষের মঙ্গলবারে গ্রামের মেয়েরা পালনি করে দেবীর থানে চিঁড়ে মুড়কি ভিজিয়ে খায়। আবার চৈত্র মাসের দোল্তাপক্ষের মঙ্গলবারে চরুই পাক (<চরু=বৈদিক যজ্ঞের পায়সান্ন) রূপে গৃহবধূরা কাঁচা দুধ ও গুড় মিশিয়ে খায়। এ থেকে বলা যায়, এই পালনি প্রকৃতপক্ষে মেয়েদের ব্রতপালন ছাড়া আর কিছুই নয়। দেবী ভাগবতে স্পষ্টই বলা হয়েছে মঙ্গলা 'যোষিতানাম ইষ্টদেবতাম্'। সেই নারীগণ কর্তৃক পূজিতা মঙ্গলাই কোথাও মঙ্গলচণ্ডী, কোথাও কালী, কোথাও বা মনসা রূপে পূজিতা হচ্ছেন। আর এর ইতিহাস সুপ্রাচীন।

ভাদ্র সংক্রান্তিতে এঁর বার্ষিক পূজা। এটি বৈকালের একদিনের পূজা। পূজাতে পাঁঠা বলি হয়। এখনও খাগরাকুল ও রাহাৎপুর থেকে ঝাঁপান আসে। ইনি একমাত্র সর্প বিষেরই নিয়ন্ত্রা নন, সর্ববিষয়েই সকলের ইষ্ট সাধন করেন বলেই ইনি সর্বমঙ্গলা। আর দেবীর নামেই গ্রামের নাম।

এই গ্রামেই নৃসিংহ চতুর্দশীতে (বুদ্ধ পূর্ণিমার পূর্ব দিন) শীতলাদেবীর বার্ষিক পূজা হয়। এখানের এই দেবীর উদ্ভবের ইতিহাস বেশি দিনের নয়। ছোট্ট গোলাকার শিলাটি বছর ১৪ পূর্বে ঝাঁট দেবার সময় শ্রীরণজিৎ মণ্ডল প্রাপ্ত হন। ঘরের ভিত কাটতে গিয়ে আরও দুটি পান গণপতি মঙ্গল। তিনটিই ছোট বড় গোলাকার শিলা। একটি চতুর্ভুর্জ আকৃতির শিলা। এগুলির আবিষ্কারের স্থানটি, যা বর্তমান মন্দিরের স্থান, সেটি ছিল জঙ্গলময়। এগুলির সাথে সর্বমঙ্গলার যোগ থাকা অসম্ভব নয়।

গ্রামটির পশ্চিম প্রান্তে রয়েছে একটি মাঝারি আকৃতির আটচালা মন্দিরের ভগ্ন নিদর্শন। শিবহীন হলেও শিব মন্দির নামে পরিচিত। জনশ্রুতি— মানুষের জ্বালাতনে শিব মাটির তলায় চলে গেছেন।

শিব মন্দিরটির মুখোমুখী রয়েছেন পঞ্চানন। একটা প্রাচীন মূল ক্ষয়ে যাওয়া বট গাছের নীচে রয়েছে বহু ছোট বড় আকারের গোলাকার শিলা। এছাড়া রয়েছে বেশ কয়েকটি চতুষ্কোণ আকৃতির শিলা। পৌনে ১′ লম্বা এবং ½′ চওড়া একটি চতুষ্কোণাকৃতি শিলা রয়েছে। এর এক কোণ ভগ্ন, এবং মধ্য অংশটি খাল।—এটি একটি ভগ্নাবশেষ। এ ছাড়া আরও কিছু পাথরের ভগ্নাবশেষ আছে। যতদূর মনে হয়, পঞ্চাননের শিলাখণ্ডের সাথেই মিশে রয়েছে খণ্ড বিখণ্ড হয়ে যাওয়া শিবলিঙ্গের ভগ্নাবশেষ।

এখানে মনসা পূজার দিনেই (ভাদ্র সংক্রান্তি) পঞ্চাননের বার্ষিক পূজা হয়।

তথ্যপঞ্জী

১। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড / পূর্বার্ধ), শ্রীসুকুমার সেন, ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, ৪র্থ সং ১৯৬৩, পৃঃ—১৮৩
২। লৌকিক শব্দকোষ (২য় খণ্ড), শ্রীকামিনীকুমার রায়, লোক ভারতী, ১ম প্রকাশ ১৩৭৭, পৃঃ ২২২-২৩।
৩। অনাদি-মঙ্গল বা শ্রীধর্মপুরাণ, কবি রামদাস আদক, সম্পাঃ—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ মঙ্গল, পৃঃ—১

নারিকেলডাঙ্গা

কালনা থানার অন্তর্গত বৈদ্যপুরের সন্নিহিত একটি গ্রাম। এটি কালনা ২য় নং ব্লকের অধীন। এখানে রয়েছেন জগৎগৌরী, যা মনসারই আর এক নাম। এখানে এঁর ঐতিহ্য কয়েক শতাব্দীর।

ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যে কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্যটি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে রচিত হয়েছিল বলে মনে হয়।[১] ঐ কাব্যে

মনসার থানরূপে নারিকেলডাঙ্গার উল্লেখ আছে। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যে ক্ষেমানন্দের প্রায় এক শত বৎসর পূর্বে মুকুন্দরাম অভয়ামঙ্গল (চণ্ডীমঙ্গল) কাব্য রচনা করেছিলেন।[২] আর তা যদি হয় তবে মুকুন্দরামের কাব্য রচনাকাল ষোড়শ শতকের শেষ ভাগ। ঐ কাব্যও বিষহরীর বিশ্রামস্থানরূপে নারিকেলডাঙ্গার উল্লেখ করে বলা হয়েছে 'পথের বিশ্রাম শুন নারিকেল ডাঙ্গা।'[৩] সুতরাং এ তথ্য থেকে বলা যায়, এই কাব্য রচনার বেশ কিছু পূর্বেই নারিকেলডাঙ্গায় জগৎগৌরীর প্রতিষ্ঠা ছিল।

ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগকেই বিপ্রদাসের কাব্যরচনাকালরূপে চিহ্নিত করেছেন।[৪] অন্যদিকে ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন যে গৌণ সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে বিপ্রদাসকে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দশকের কবি বলতে হয়েছে। নতুবা মুখ্য সাক্ষ্য অনুসরণ করলে তাকে অষ্টাদশ শতকের লোক বলতে হয়।[৫] এখানে কাল নিরূপণের ক্ষেত্রে সংশয় থাকার জন্য মুকুন্দরামের কাব্যে নারিকেলডাঙ্গার প্রথম উল্লেখ ধরে জগৎগৌরীর প্রতিষ্ঠাকালরূপে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ বা ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভকে আমরা অনুমান করে নিতে পারি।

এখানে মনসাকে স্বপ্নতত্ত্বের মাধ্যমেই পাওয়া গেছে। সেক্ষেত্রে ঠাকুরবাড়ির সেবাইত জগৎদুল্লভ ভট্টাচার্য বলেন যে তাঁর শোনা কথা: বড্ডিপুরের মেজ নন্দী বাড়ির এক বালবিধবাকে মা মনসা স্বপ্ন দেন যে তিনি বেহুলা নদীর অনতিদূরে কচুদহে রয়েছেন। তাঁকে যেন দহ থেকে তোলা হয়। স্বপ্নানুসারে সেই প্রস্তর মূর্তি তুলে নিয়ে বড্ডিপুরের চণ্ডীমণ্ডপে রেখে পূজার ব্যবস্থা করা হয়। তিনদিন পরে মনসা স্বপ্নে দেখা দিয়ে তাঁকে নারিকেলডাঙ্গার ব্রাহ্মণ বাড়িতে রেখে দিয়ে আসতে বলেন। মাকে বহু প্রাচীন একটা স্তূপে বসিয়ে দিয়ে যান। সেই প্রসঙ্গে জগৎদুল্লভবাবু বলেন—যে স্তূপে পঞ্চমুণ্ডির আসন ছিল, সেই স্তূপের উপরই প্রতিষ্ঠিত বর্তমানের মন্দিরটি। তবে এই জনশ্রুতিরও রকমফের রয়েছে। সেক্ষেত্রে নারিকেলডাঙ্গারই শ্রীপাঁচুগোপাল সাঁতরা মনসার উৎপত্তি সম্বন্ধে বলেন যে পাতিলপাড়ার এক কলু যাচ্ছিল তেল নিয়ে। দেবী মনসা একটি মেয়ের বেশ ধরে তাকে তেল দিতে বলেন। কলু মাপা তেল বলে দিতে পারেন না। সেই রাতে মা মনসা কলুকে স্বপ্ন দেন—আমি কচুদহে আছি। আমায় তোল। সেই কলু মীরহাট থেকে জেলে এনে মাকে তোলেন। কিন্তু

কলু নিজে পূজা করতে পারবে না বলে নারিকেলডাঙ্গার ব্রাহ্মণবাড়িতে মনসাকে দিয়ে যান।

সেবাইত শ্রীজগৎদুল্লভবাবু বলেন যে তাঁর শোনা কথা—কালাপাহাড় নাকি বহু ঠাকুর কচুদহে ফেলে দেন। এই কচুদহ যা সম্পূর্ণ বুজে যাওয়া, তার পাশেই একটি বৃহৎ ধ্বংসস্তূপের উপর বর্তমানের মন্দির বার্ষিক উৎসবের স্থানে। এখানে এই যে জনশ্রুতি এবং বৃহৎ ধ্বংসস্তূপ, এ থেকে হয়তো অনুমান করা যায়, কালাপাহাড় মন্দিরটি বিধ্বস্ত করে মনসার মূর্তিকে কচুদহে ফেলে দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন দেখতে হবে, এই অনুমান কতটা যুক্তিগ্রাহ্য? তমলুকের বর্গভীমার প্রসঙ্গে শ্রীযুধিষ্ঠির জানা লিখেছেন যে কালাপাহাড ১৫৬৭-৬৮ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যা বিজয় বাসনায় তমলুকে উপস্থিত হয়েছিলেন।[৬] আর এই সময়টিই হলো কালাপাহাড়ের বাংলায় মন্দির ধ্বংসেরও সময়। আর মুকুন্দরামের কাব্য রচনাকাল ষোড়শ শতকের শেষভাগ। তখনও তিনি নারিকেলডাঙ্গার বিষহরিকে স্মরণ করেছেন। এ থেকে স্পষ্টই অনুমান করা যায়, কালাপাহাড়ের হাতে মন্দির বিধ্বস্ত হয় নি। তাঁর হাতে কিছু মন্দির যে বিধ্বস্ত না হয়েছে তা নয়। তবে সমস্ত দেবমন্দিরের ধ্বংসের ইতিহাসে কালাপাহাড়ের নামটি যুক্ত করা যুক্তিযুক্ত নয়।

ধর্মমঙ্গলের নিরঞ্জনের উষ্মায় বলা হয়েছে 'দেউল দেহারা ভাঙ্গে গোহাড়ের ঘায়'।—এ থেকে ডঃ সুকুমার সেন বলেন যে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দিল্লীর বাদশাহ ফিরোজ-শাহা তোগলক উড়িষ্যা ও বাঙ্গালা যে বিদ্যুৎগতি অভিযান চালিয়েছিলেন তাঁরই স্মৃতি এই 'জালানি কালিমা'র দাগ কেটেছে।[৭] কিন্তু সময়ের দিক থেকে এর সাথে নারিকেলডাঙ্গার ধ্বংসের ইতিহাসকে যুক্ত করা যায় না।

কালনা মহকুমার দেউল দেহারার, এমন কি শাসপুরের মসজিদগুলির ধ্বংসের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে মনে হয় ওগুলি একই কারণে এবং সময়ের অল্পবিস্তর তারতম্যে ধ্বংস হচ্ছে। এখন দেখতে হবে, ধ্বংসের কি সেই কারণ?

রামদাস আদকের কাব্য রচনাকাল ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দ। এই সময়েও তিনি তাঁর কাব্যের দিগবন্দনায় বলেছেন 'নারিকেল ডাঙ্গায় বন্দো মনসাকুমারী।'[৮]—এ থেকে বলা যায়, সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেও নারিকেলডাঙ্গার জগৎগৌরীর অস্তিত্ব সগৌরবে বিদ্যমান এক্ষেত্রে প্রশ্ন থাকে, ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী

কোন সময়ে কি কোন মুস্লিম অভিযানকারীর দ্বারা নারিকেলডাঙ্গার মন্দির বিধ্বস্ত হয়েছিল ? এক্ষেত্রে বলা যায়, যদি তাই হতো তবে শাসপুরের মসজিদগুলি কেনই বা বিধ্বস্ত হলো ? তবে কি হিন্দুরা বিধ্বস্ত করেছিল ? কিন্তু হিন্দুদের দ্বারা কোন মসজিদ যে বিধ্বস্ত হয়েছিল, তার কোন ইতিহাস নেই।

এক্ষেত্রে ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দটিকে স্মরণ করতে পারি। এই সালেই বর্গীদের আগমণ ঘটছে। ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রতি বছর তারা বাংলায় এসেছে। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তরবারির জোরে গ্রাম নগর লুণ্ঠন করা, দেশে সন্ত্রাস সৃষ্টি করা, যাতে বাংলার নবাব চৌথ দানে রাজি হয়। তারা বিহার অতিক্রম করে পাঞ্চেতের ভিতর দিয়ে বর্ধমানে প্রবেশ করেছে। চলার পথে হত্যা ও লুণ্ঠন চালিয়েছে। প্রাণভয়ে ভীত বিভিন্ন জাতির সমস্ত মানুষ পালিয়ে যেতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। গঙ্গারাম তাঁর মহারাষ্ট্র পুরাণের বর্ণনায় লিখেছেন—

তবে সব বরগি গ্রাম লুটিতে লাগিল।
যত গ্রামের লোক সব পলাইল ॥
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পলাএ পুথির ভার লইয়া।
সোনার বাইনা পলাএ কত নিক্তি হড়পি লইয়া ॥

*　　*　　*　　*

গোশাঞি মোহন্ত জত চৌপালাএ চড়িয়া।
বোচকা বুচকি লয় জত বাহুকে করিয়া ॥

*　　*　　*　　*

সেক সৈইয়দ মোগল পাঠান জত গ্রামে ছিল।
বরগির নাম সুইনা সব পলাইল ॥

—বর্গীরা এই সব পালিয়ে যাওয়া মানুষেরও যার কাছে যা পেয়েছে সব কেড়ে নিয়ে তাদের সর্বস্বান্ত করে গ্রামে ঢুকেছে। গঙ্গারাম বলেছেন—

বাঙ্গালা চৌআরি জত বিষ্ণু মোণ্ডব।
ছোট বড় ঘর আদি পোড়াইয়া সব ॥
এই মতে জত সব গ্রাম পোড়াইয়া।
চতুর্দিকে বরগি বেড়াএ লুটীয়া ॥

সেক্ষেত্রে বর্ধমানের রাজাও পালিয়ে যাচ্ছেন। এমনকি নবাবও নিরাপত্তার অভাব অনুভব করছেন।

বর্গীর আক্রমণে কোন কোন গ্রাম যে বিধ্বস্ত ও ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছিল তার বর্ণনাও পাওয়া যাচ্ছে। বর্ণনায় বলা হয়েছে—

সমুদ্রগড জান্নগর আর নদীয়া।

মাহাতাপুর সুনন্টপুর থইল পোড়াএ গিয়া ॥

ডঃ অণিমা মুখোপাধ্যায় বলেছেন যে কাটোয়া ও বর্ধমানের দক্ষিণাঞ্চল লোকাভাবে গভীর জঙ্গলে পরিণত হতে লাগল। হুগলীতেও বর্গীদের একটি প্রধান ঘাঁটি স্থাপিত হওয়ায় ভাগীরথীর পশ্চিমপাড়ের মানুষ নিরাপত্তার আশায় কলকাতায় ইংরেজদের আশ্রয়ে এসে বাস করতে লাগলো।[৯] তিনি আরও বলেছেন যে গঙ্গারামের 'মহারাষ্ট্র পুরাণে' বর্গীর হাঙ্গামার যে ভয়াবহ বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে তা সমগ্র রাঢ়-বঙ্গ সম্পর্কেই সত্য। বস্তুতঃ নারীপুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ কেউই রক্ষা পায়নি তাদের নৃশংস উৎপীড়ন ও অত্যাচারের হাত থেকে। বিভিন্ন সময়ে তাদের যাতায়াতের পথের দু'ধারে ঘোড়ার পিঠে যতদূর যাওয়া যায় সর্বত্রই চলেছিল তাদের হানাদারি। বর্গীদের উৎপাতে রাজনগর থেকে মুর্শিদাবাদ বা বর্ধমানগামী পথের দুপাশের গ্রাম ও জনজীবন একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। লুন্ঠিত ও ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছিল অজয়-ময়ূরাক্ষীর তীরবর্তী বহু সমৃদ্ধ হাট বাজার গঞ্জ। পিতৃপুরুষের ভিটে মাটি ছেড়ে মানুষ যে যেদিকে পারে পালিয়েছে নিরাপদ আশ্রয়ের আশায়। কৃষকরা ছন্নছাড়া পলাতক বলে চাষের খেত পড়ে থেকেছে অনাবাদী হয়ে। স্তব্ধ হয়ে গেছে তাঁতির তাঁত। কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ পদ্ধতিতে গ্রামবাসী প্রাণে বাঁচলেও ক্রমশঃ নিঃস্ব হয়ে উঠতে থাকে। লোক আর সম্পদ ক্ষয়ের ছাপ পড়ে চাষে, শিল্পে আর ভঙ্গুর অর্থনীতিতে। দেশ ক্রমশঃ অবক্ষয়ের পথেই এগিয়ে চলে। বর্গীদের হাঙ্গামার ফলে এক বিশাল অঞ্চল এমনভাবে বিধ্বস্ত হয়েছিল যে কৃষিক্ষেত্র আর লোকালয় একাকার হয়ে শ্মশান ভূমিতে পরিণত হয়েছিল, তার প্রত্যক্ষ ফল পড়েছিল বাংলার অর্থনীতির উপর।[১০] এই ধসে পড়া অর্থনীতির উপর আর এক চরম আঘাত এসে পড়ল ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে। সেই আঘাত হানলো ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। এর জন্য "বীরভূম ও বর্ধমানে মৃত্যুর সংখ্যা এবং রায়তদের গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার সংখ্যা ছিল অত্যন্ত বেশি। গ্রামের পর গ্রাম এই মন্বন্তরের কবলে পড়ে জনশূন্য হয়ে গিয়েছিল। এমনকি শহরেও এক চতুর্থাংশ মানুষও ছিল না।"[১১] মন্বন্তরের বছরের বীরভূম জেলার বর্ণনা দিতে গিয়ে

জেলার সুপারভাইজার হিগিনস একে 'বন্ধ্যা জনমানবহীন' দেশ বলে উল্লেখ করেছেন। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী পরিসংখ্যান অনুযায়ী বীরভূমের গ্রামের সংখ্যা ছিল ৬০০০, সেখানে ১৭৭১-৭২ খ্রীষ্টাব্দে তা থেকে ১,৫০০ টি গ্রামের নাম মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল।

দুর্ভিক্ষের পরেও গ্রাম ত্যাগের হিড়িক বন্ধ হয় নি। কারণ যারা গ্রামে থাকত তাদের গ্রামত্যাগীদের জমির জন্য 'নাজাই' কর দিতে হত। মন্বন্তরের পরবর্তী সময়েও গ্রামত্যাগের এই ক্রমবর্ধমান প্রাবল্যের ফলে চাষীর অভাব সর্বত্র ব্যাপক, গভীর ও প্রতিকারহীন আকার ধারণ করতে থাকে। জমি অকর্ষিত হয়ে পড়ে রইল বছরের পর বছর। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিশ তাঁর দীর্ঘ তিন বছরের সতর্ক অনুসন্ধানের শেষে জানালেন যে বাংলায় কোম্পানীর রাজ্য-সীমানার এক তৃতীয়াংশ অঞ্চল 'a jungle inhabited only by wild beast.'[১২] আর এর পরিণতি হিসাবে গ্রামীণ অর্থনীতি একেবারে গুঁড়িয়ে গেল। এর ফলে দেশজুড়ে অবাধে চুরি ডাকাতি চলতে লাগলো। এদের সঙ্গে যোগ দিল না খেতে পাওয়া মানুষের দল। সেক্ষেত্রে চাষীরা যেমন দারিদ্র্যের কবলগ্রস্ত হয়েছিল, তেমনি পুরানো সম্ভ্রান্ত পরিবার-গুলিও ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। জনসংখ্যা এবং অনাবাদি জমির পরিমাণ হ্রাস পাবার ফলে জমিদার এবং ইজারদার শ্রেণীভুক্ত ধনীরা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। হান্টারের মতে বাংলার পুরানো জমিদার শ্রেণীর পতন শুরু হয়েছিল ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই।

দুর্ভিক্ষের শেষদিকে বর্ধমানের রাজা মৃত্যুবরণ করেন উত্তরাধিকারীর হাতে এক শূন্য রাজকোষ তুলে দিয়ে। নিঃসম্বল পুত্র পারিবারিক সোনার থালা বাসন গলিয়ে, এবং ব্যবসায়ীদের কাছে ও সরকারের কাছে ঋণ করে পিতার পারত্রিক কর্ম সম্পাদন করেন।[১৩] অন্যদিকে বীরভূমের রাজা বাদি-উজ-জামান খাঁকে রাজস্ব বাকির দায়ে বন্দি করা হয়। আর এই যে বাংলার প্রেক্ষাপট, এর মধ্যেই কালনা মহকুমার মন্দিরাদি ধ্বংসের কারণ ও সময়ের সূচনা কালকে খুঁজে নিতে পারা যায়।

আমরা জানি, বর্গীর হাঙ্গামা চলেছিল ১৭৪২ থেকে ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। এই নয় বছরের মধ্যে কালনায় একটি মাত্র মন্দির প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, যা সিদ্ধেশ্বরী বাড়িতে ১৭৪৭ খ্রীষ্টাব্দে রামদেব নাগ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির। কৃষ্ণচন্দ্রের

মন্দিরটি বর্ধমানের রাজাদের দ্বারা ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দ প্রতিষ্ঠিত, যা বর্গীর হাঙ্গামা চুকে যাওয়ার অব্যবহিত পরেই। এছাড়া ১৭৫১ থেকে ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে নির্মিত হচ্ছে জগন্নাথ ঘাটের মন্দির, অনন্ত বাসুদেবের মন্দির, লালজী মন্দির, রূপেশ্বরের মন্দির ও গোপালজীর মন্দির। কিন্তু ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁরা আর কোন মন্দির নির্মাণ করছেন না। এমনকি বর্ধমানেও নয়। এক্ষেত্রে বলা যায়, ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে ঘটে গেছে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। তখন বর্ধমানের রাজকোষ প্রায় শূন্য। বলতে গেলে উনবিংশ শতক না পড়া পর্যন্ত তাঁরা আর্থিক সঙ্কটকে কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। তাই ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কালনা ও বর্ধমানে মাত্র ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে বামেশ্বর (কালনায়), এবং ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমানের নবাবহাটের ১০৮ মন্দিরকে প্রতিষ্ঠা হতে দেখা যায়। এ রকম ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের পক্ষে মন্দিরাদি রক্ষা বা নির্মাণ করা ছিল কল্পনার বাইরে।

বৃহত্তর জমিদারীর সত্ব থাকার জন্য হয়তো কিছু মন্দির নির্মাণ করা সম্ভব হচ্ছে, যদিও মীরকাসেমের স্থিরীকৃত ৩১, ৭৫, ৪০৬ সিক্কা রাজস্ব দেবার সঙ্গতি মহারাজ তিলকচন্দ্রের ছিল না, বকেয়া রাজস্ব বাবদ এগার লাখ টাকা পরিশোধের জন্য কিস্তিবন্দি করতে হচ্ছে। সেক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের পক্ষে মন্দিরাদি রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই আমরা কালনা মহকুমার মন্দিরাদি ধ্বংসের সূচনারূপে বর্গীর হাঙ্গামার কালটিকে সনাক্ত করতে পারি।

বর্গীর হাঙ্গামার ফলে ব্রাহ্মণরা পালিয়ে যাচ্ছেন, পালিয়ে যাচ্ছেন গোসাঞী মোহন্তরা। বিষ্ণুমণ্ডপ পোড়ান হচ্ছে। বহু গ্রাম ও জনজীবন নিশ্চিহ্ন হচ্ছে। দুমুঠো অন্ন জোগাড় করতে সাধারণ মানুষ অসহায়। এমনতর ক্ষেত্রে মন্দির সমূহ অবহেলার বস্তু হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বিশেষ করে ব্রাহ্মণ, গোঁসাই, মোহন্তগণ পালিয়ে যাচ্ছেন, বা মারা যাচ্ছেন, সেখানে মন্দিরাদি পরিত্যক্ত হচ্ছে। এর পরে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর গ্রামীণ অর্থনীতিকে একেবারে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিল। সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলিও ধ্বংস হয়ে গেল। গ্রাম ত্যাগের হিড়িক বন্ধ হলো না। লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যুর ঢলে মন্দিরের সেবাইতদের যে মৃত্যু হচ্ছে না, তা নয়। এমতাবস্থায় যেখানে মন্বন্তরে গ্রামের পর গ্রাম লোকবসতি শূন্য হয়ে যাওয়ায় জঙ্গলে পরিণত হচ্ছে, সেখানে মন্দিরাদিকে যে জঙ্গলে গ্রাস করবে তা কল্পনা করা যায়। সেক্ষেত্রে বলা যায়, সংরক্ষণের অভাব এবং গাছের শিকড় এদের

ধ্বংসের পথে নিয়ে গেছে। সেক্ষেত্রে ৬০/৭০ বছরের মধ্যেই সেগুলিকে ধ্বংস বা ধ্বংসপ্রায় করে ফেলেছে।

শাসপুরের দুটি মসজিদ যে জঙ্গলের গ্রাসে ধ্বংস হয়েছে তা ক্ষেত্র পর্যবেক্ষণে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। অন্য মসজিদটি আধা ধ্বংস অবস্থায় সংস্কার করার জন্য টিকে থেকে আবার ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছে। গোপালদাস-পুরের বর্তমান মন্দিরটি যে ধ্বংসস্তূপের উপর প্রতিষ্ঠিত তাও এইভাবেই ধ্বংসের পথে এগিয়ে গেছে। কালনার মহাপ্রভু বাড়ির পুরাতন মন্দিরের যে ধ্বংসাবশেষ তাও যে একইভাবে সংঘটিত হয়েছিল, তা হয়তো বলা যায়।

এক্ষেত্রে প্রশ্ন থাকে, ঠাকুরদেবতাকে কেন পুকুরে বা নদীতে বিসর্জন দেওয়া হচ্ছে? এক্ষেত্রে বলা যায়, বর্গীরা যেখানে বিষ্ণুমণ্ডপ পোড়াচ্ছে, সেখানে ব্রাহ্মণগণের দ্বারা কণ্ঠে শালগ্রাম শিলাকে বিলম্বিত করে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হলেও অপেক্ষাকৃত বড় শিলাখণ্ডকে বহন করে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তাই পবিত্রতা রক্ষার জন্য পুকুরে, নদীতে বা জঙ্গলে তাদের বিসর্জন দিয়েছে। দ্বিতীয়ত, সৈন্যদের ধারণা ছিল যে মন্দিরে ধনসম্পদ লুকানো থাকে। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা মন্দির লুণ্ঠন করেছে। ধনসম্পদ না পেয়ে ক্রোধে দেবদেবীকে বিসর্জন দিয়েছে। সুতরাং বর্গীর হাঙ্গামার পরে নারিকেল ডাঙ্গার বিষহরির মন্দির ৬০/৭০ বছরের মধ্যে প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল তা বলা যায়। এবং বৈদ্যপুরের নন্দীদের পত্তনি প্রাপ্তির (১৮১৯ খ্রীঃ) পরেই কোন সময়ে মনসাদেবীকে উদ্ধার করে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়।

বৃহৎ ধ্বংসস্তূপের উপর ১৩৭২ সালে জনৈক ভক্ত বর্তমানের বড় সাইজের ইঁটের পূর্বমুখী মন্দিরটি নির্মাণ করে দেন। সেই ধ্বংসস্তূপের উপরই দেওয়ালের যে অবশেষ ছিল, সেই পাতলা ইঁটের নিম্নাংশের উপর বর্তমান সাইজের বড় ইঁট দিয়ে দেওয়াল তুলে সংস্কার করা হয়েছে। এই দক্ষিণমুখী ঘরের চাল টিনের। অদূরে রয়েছে চারটি খোলা দ্বার বিশিষ্ট একটি একরত্ন মন্দির। এই মন্দিরে মেলার সময় দেবীকে বসানো হতো। এর চারদিকের বেদী ধ্বংস হয়ে গেছে। তাই এর চারদিকে একটি স্তূপ গড়ে উঠেছে। এ থেকে বোঝা যায় যে পরিত্যক্ত অবস্থায় মন্দিরগুলি ধীরে ধীরে ধ্বংসের পথে এগিয়ে গেছে। এখানেই বার্ষিক পূজা ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

বর্তমান মন্দিরটি ১২৯৯ বঙ্গাব্দে প্রতিষ্ঠিত। প্রতিষ্ঠাতা সেবাইত শ্রীজগৎ-দুর্লভ ভট্টাচার্যের মাতামহ শ্রীদুর্গাদাস ব্যানার্জ্জী।

মনসার মূর্তিটি কষ্টিপাথরের। দেবী সিংহ পৃষ্ঠে স্থাপিত পদ্মাসনে আসীন। বাম হাঁটু মোড়া ও ডান পা ঝোলানো দ্বিভুজা দেবী সপ্ত সর্পবিধৃত ফণাছত্র তলে আসীনা দেবী। বামাঙ্কে ক্ষুদ্র শিশু আস্তিক। তাঁর উচ্চতা ২½ ফুটের মতো। অন্য সিংহাসনে একটি থান ইঁটের মতো চতুষ্কৌণিক আয়তাকার আকৃতি বিশিষ্ট মনসার সঙ্গী নেতার কষ্টিপাথরের মূর্তি। এর একটি অংশ মুখ হয়ে ঝুলে আছে। তাতে কড়ির মতো সাদা দুটি চোখ।

এখানে জগৎ গৌরীর পূজা হয় দশহরার পরে আষাঢ়ের শুক্লাপঞ্চমীতে। এ বার্ষিক পুজা—ঝাঁপান। ঐদিন মনসাকে কচুদহের পরিত্যক্ত মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয় বর্তমান মন্দির থেকে। ফিরিয়ে আনা হয় রাত্রে। সহস্র ছাগবলি হয়।

মনসার নাভি থেকে বস্তু (ময়লা) ওঠে। ঐ বস্তু এবং ধূলফুল রোগ আরোগ্যের জন্য দেওয়া হয়। মেয়েদের নাড়িঘটিত রোগ এবং চর্মরোগের জন্য টোটকা ঔষধ কবচ দেওয়া হয়।

ফাল্গুন মাস থেকে জগৎগৌরীকে সিঙ্গারকোণ, কুলটি, বহরকুলি, আম্বুখাল, তেহাটা, কুতুবপুর, রামনগর, আটকেটে, সারিদপুর, গোপালদাসপুর, মীরহাট, হাসনহাটি, বৈদ্যপুর, বৈঁচি, গোয়াড়া, সিমলাগড় (চাপাটি), স্টেশন পাণ্ডুয়ার অন্তর্গত তিন্না এবং পীনা গ্রামের বারোয়ারী সমূহে নিয়ে যাওয়া হয়। ঐসব বারোয়ারীরাই নিয়ে যায়। ডঃ গোপীকান্ত কোঙার বলেছেন, "কোথাও কোথাও দেবীর বাৎসরিক পূজার সময় মূর্তিটি নিয়ে গ্রামে ঘোরানো হয়। তাকে 'র' ঘোরানো বলে।"[১৪]

বৈঁচি গ্রামের জগৎগৌরীর ঝাঁপান সম্বন্ধে কাজল দাস বলেছেন যে যেভাবে নারকেলডাঙ্গা থেকে বিগ্রহ আনা হয় তা বেশ রোমাঞ্চকর। এখানে গ্রামের বিভিন্ন পাড়ার মনোনীত সদস্য নিয়ে কমিটি তৈরী হয়। তাঁরাই মেলার দিন ঠিক করেন। নারকেল ডাঙ্গা থেকে মাঠ পথে কাঁধে চেপে ছুটতে ছুটতে বিগ্রহ আসে মাইল আটেক পথ রাতের অন্ধকারে। গ্রামবাসীদের কাঁধে কাঁধে প্রতিটি বাড়িতে 'বিগ্রহ' নিয়ে যাওয়া হয় সামান্য প্রণামীর বিনিময়ে। ডগর কাড়া ধামসা মাদল বাজিয়ে হুল্লোড় করতে করতে চলে লোকেরা। তার সঙ্গে

চলে উদ্দাম নৃত্য। দুদিন ধরে কাঁধে কাঁধে ঘুরে বিগ্রহ আসে বাজারের কাছে জগৎগৌরীর নির্দ্দিষ্ট পাকা মন্দিরে, যা বীণাপানি দাঁ কর্তৃক বাংলা ১৩৪৫ সনে নির্মিত। এরপর শুরু হয় গ্রামের প্রতিটি বাড়ির মহিলাদের পূজা দেওয়ার পালা। এরপর ঝাঁপান ও মেলা। এটা হয় জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষের দিকে। কথিত আছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মাঘ মাসে বসন্ত রোগ বৈঁচিগ্রামে মহামারী আকার ধারণ করে। গ্রামের কিছু প্রবীণ ব্যক্তির পরামর্শে জগৎ গৌরীর বিগ্রহ নারিকেলডাঙ্গা থেকে এনে পূজা করা হয়েছিল। এই থেকেই বৈঁচিগ্রামের জগৎগৌরীর পূজার সূচনা।[১৫] এসব থেকে বলা যায়, নারিকেল ডাঙ্গার জগৎগৌরী আঞ্চলিক দেবীতে পরিণত হয়েছে, এবং তার সংস্কৃতি ক্ষুদ্র গণ্ডিকে ছাড়িয়ে বৃহত্তর খাতে প্রবাহিত হয়েছে।

তথ্যপঞ্জী

১। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (৩য় খণ্ড। ১ম পর্ব), ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ২য় সং ১৯৮০, পৃঃ—৮৯

২। তদেব, পৃঃ—৮৭

৩। মুকুন্দরাম বিরচিত কবিকঙ্কণ চণ্ডী, সম্পাঃ—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী, বসুমতী, নূতন সং ১৯৬২, পৃঃ—২৫

৪। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (৩য় খণ্ড। ১ম পর্ব), ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মর্ডান বুক, ২য় সং ১৯৮০, পৃঃ—৮২

৫। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড। পূর্বার্ধ), শ্রীসুকুমার সেন, ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, ৪র্থ সং ১৯৬৩, পৃঃ—৩৭৪

৬। বৃহত্তর তাম্রলিপ্তের ইতিহাস, যুধিষ্ঠির জানা, কলিকাতা পুস্তকালয়, ১ম প্রকাশ ১৩৭১, পৃঃ—১০০

৭। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড। অপরার্ধ), শ্রীসুকুমার সেন, ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, ২য় সং ১৯৬৫, পৃঃ—১৩২

৮। অনাদি মঙ্গল বা শ্রীধর্মপুরাণ, কবি রামদাস আদক বিরচিত, সম্পাঃ শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ মন্দির, পৃঃ—৬

৯। আঠারো শতকের বাংলা পুঁথিতে ইতিহাস প্রসঙ্গ, ডঃ অণিমা মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যলোক, ১ম প্রকাশ ১৯৮৭, পৃঃ—২০

১০। তদেব, পৃঃ ৩৭ —৩৮
১১। তদেব, পৃঃ—৫০
১২। Annals of Rural Bengal, W. W. Hunter, P.—39
১৩। Calender of Persian Correspondence, V. 3, Letter No. 739, P. 199, New Delhi.
১৪। বর্ধমান জেলার মেলা: সমাজতাত্ত্বিক পর্যালোচনা, ডঃ গোপীকান্ত কোঙার, কলেজস্ট্রীট, পৃঃ—৩৯
১৫। জগৎ গৌরীর ঝাঁপান, কাজল দাস, সাপ্তাহিক বর্তমান, ১২ জুন ১৯৯৩, পৃঃ—২৩

নেপাকুলি

কালনা থানার ২নং ব্লকের অন্তর্গত একটি গ্রাম। কালনা থেকে ৩ মাইলের মধ্যে, কালনা-বৈঁচি রাস্তায়।

এখানে মাটির দেওয়ালযুক্ত খড়ের ছাউনি দেওয়া ঘরে দেবীর অবস্থান। এই দেবী মনসাকে চূড়মনি পুকুর সংলগ্ন এক জমি থেকে ভগ্ন অবস্থায় পাওয়া যায়। দুটি টুকরো অবস্থায় ওমরপুরের জনৈক বাগ্দীর লাঙ্গলে ওঠে। তাই প্রথম পূজা ওমরপুর থেকেই আসে।

এখানেও এই দেবীর সাথে পরিত্যক্তের ইতিহাস জড়িত ছিল তা অনুমান করা যায়। এঁর উদ্ধার ও পূজার উৎপত্তি ১৫০ বছরের উর্ধ্বে নয়।

আষাঢ়ের শুক্লাপঞ্চমীতে দেবীর বার্ষিক পূজা। দুটি মাটির ঘটের উপর দুই প্রস্তর খণ্ড। দশহরার দিন ঘটের জল পরিবর্তন করে নূতন জল ভরা হয়। বার্ষিক পূজায় ঝাঁপান আসে নেপাকুলি ছাড়া কদম্বা, মধুবাটি, দত্ত দেড়িয়াটোন এবং ঝোড়োবাটি থেকে। ঐ দিন দেবী আসেন ঝাঁপান তলায়। একটি সাতদিনের মেলাও বসে। জনশ্রুতি—এঁর দুই বোন হলেন নারিকেলডাঙ্গার জগৎগৌরী, এবং ইনছুরার মনসাদেবী।

উদয়পুর

কালনা থানার অন্তর্গত কালনা ২নং ব্লকের একটি গ্রাম উদয়পুর। এটি বৈদ্যপুরের সন্নিকটে। এখানে বাইতি জাতীয় পণ্ডিতদের ঘরে রয়েছেন বেহুলা। রয়েছেন একটি ছোট্ট মন্দিরে। বেহুলা নদীর তীরে।

সিংহাসনে রয়েছে একই ধরনের তিনটি পাষাণমূর্তি। ডান পাশে ১´ উচ্চতার নেতার পাষাণ মূর্তি, বাঁ পাশে পৌণে এক ফুট উচ্চতার মনসার পাষাণ মূর্তি, এবং মাঝে দেড় ফুট উচ্চতার বেহুলার পাষাণ মূর্তি। এই তিন মূর্তিরই চোখ ও ভুরুতে পিতল ও রূপার পাত বসানো। এ ছাড়া কোলঙ্গায় রয়েছে অনেকগুলি ছোট ছোট প্রস্তর মূর্তি। যেমন দুটি প্রস্তর ফলক—বিষ্ণু-পদচিহ্ন, তিনটি বিভিন্ন আকৃতির কচ্ছপাকৃতি ধর্মঠাকুর, একটি যুগনদ্ধ মূর্তি ত্রিপুরসুন্দরী (দুজনের হাতে লীলা কমল), গণেশ মূর্তি, হাতির পীঠে দেবী ইন্দ্রাণী, এবং আরও অনেক মূর্তি। তাই এই ক্ষুদ্র মন্দিরটিকে বলা যায় প্রত্নতত্ত্বের যাদুঘর।

এই বেহুলা দেবীর সম্বন্ধে জনশ্রুতি: বেহুলা নৌকায় ভেসে আসছিলেন। সঙ্গে অন্যান্য দেবদেবী। সকাল হয়ে যায়। সূর্যের উদয় হয় বলে জায়গাটির নাম উদয়পুর। বেহুলা নদীতে ভাসতে ভাসতে এসে লাগে অন্য তীরের বটতলায়—বাজে আনোকায়। সকাল হয়ে যাওয়ায় দেবদেবীরা পাথর হয়ে যায়। ঐ বাজে আনোকাতেই দেবীর মন্দির ছিল। কিন্তু আনোকার আদিবাসীরা কুখাদ্য খেত। এই পাপের ফলে আনোকা ধ্বংস হয়ে যায়, এবং আনোকার বিশেষণরূপে যুক্ত হয় বাজে শব্দটি। তারপর কোন সময় দেবী পণ্ডিতদের কোন পূর্বপুরুষকে স্বপ্নে দেখা দেন। সেই সূত্রেই উদয়পুরে দেবীর প্রতিষ্ঠা।

এখানে এই যে আনোকা—এই গ্রাম নামটির সাথে নৌকার সংযুক্তি অনুমান করা যায়। অর্থাৎ নৌকা ভর্তি অর্থে আনৌকা থেকে আনোকা শব্দটির উৎপত্তি। সেক্ষেত্রে জায়গাটি খারাপ হয়ে যাওয়ায়, বা বজ্রদগ্ধ হওয়ায় তার সাথে বাজে কথাটি যুক্ত হয়েছে।

এখানে তিন দেবীই অশ্বমুখী।

মনসার সম্বন্ধে বিপ্রদাস বলেছেন 'পূর্বেতে গন্ধর্বসুতা ছিলো অবস্থিত।'[১] এবং তিনি ছিলেন নাট-নাটেশ্বরী। ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন যে বেহুলা বিপ্রদাসের কাব্যে নাচনী নয়—সে বিদ্যাধরী—স্বস্থানে ফিরে নিজের প্রতিবেশে এসে স্বভাবতই নৃত্যপর হয়েছেন।[২]

বেহুলা নেতার অনুসরণে সিজুয়া পর্বতে উপস্থিত হয়ে যেখানে—

বিদ্যাধর অপস্বর আছয়ে কুতুহলে
গায়ন্তি নৃত্যন্তি তথা সুচ্ছন্দ সুতালে।—সেখানে

বেহুলা 'সুতাল সুচ্ছন্দে নৃত্য করে অঙ্গভঙ্গ' 'পূর্ব জন্মকৃত ছিল সামান্য বিশেষ ছিল' বলেন।[৩] এখানে এই যে গান্ধর্বী বিদ্যাধরীরা, এরা ছিল অশ্বমুখী। তাই হয়তো তিন দেবীকে অশ্বমুখী রূপে পরিকল্পনা করা হয়েছে।

কেউ কেউ বলেন যে বাশুলী ও বিশালাক্ষী পৃথক। আবার অনেকে বলেন যে বাশুলী ও বিশালাক্ষী অভিন্ন। আবার অনেকে অনুমান করেন যে বাশুলী চণ্ডীরই রূপভেদ।[৪] এবং যেখানে চণ্ডী-মনসা এক দেবী ছিলেন, যেখানে গ্রাম-দেবীরূপে তার নাম 'বিষাইল-আঁখি' এবং ধাম পশ্চিমবঙ্গে চণ্ডী (বিশালাক্ষী) আত্মসাৎ করে ফেলেছেন[৫], সেখানে বলা যায়, বাশুলীর সাথে মনসার একটি যোগসূত্র রয়েছে। তাছাড়া, এই তথ্য সত্য যে নান্নুরের বাশুলী যেমন চণ্ডী, তেমনি বাঁকুড়ায় মনসাও বাশুলীরূপেই পূজিতা হন।[৬] আর পুরীর কেওট সাহী পাড়ায় কেওট শ্রেণী দ্বারা পূজিতা বাশুলীর মুখ অশ্বের মুখের মতো, যাকে বলা হয় 'ঘোড়া মুহ বাশুলী'।[৭] সুতরাং সেদিক থেকে উদয়পুরের মূর্তি পরিকল্পনায় উড়িষ্যাগত প্রভাব থাকতে পারে। আর সেই থাকাটা অসম্ভব নয় যখন উদয়পুর সলংগ্ন বৈদ্যপুরে উড়িষ্যারীতির দেবদেউল রয়েছে।

বিদ্যাপতি 'ব্যাড়ীভক্তিতরঙ্গিনী' নামে একটি মনসাপূজাবিধি গ্রন্থ রচনা করেন। মিথিলা থেকে অপ্রচলিত পুঁথিটি পূর্ববাংলায় স্থানান্তরিত হয়। তাতে বলা হয়েছে যে লক্ষীধর যেহেতু মধুকর নামে একটি নৌকা দিয়েছিল, সেহেতু সুন্দর নৌকা নির্মাণ করে তাতে পূজার ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে যে ভূতনাথের সম্মুখে বিপুলার (বেহুলার) নৃত্য দেখতে যাঁরা সমাগত হয়েছিলেন তাঁদেরও পূজা করার কথা বলা হয়েছে। ব্রহ্মা, মাধব, রুদ্র, সরস্বতী, লক্ষ্মী, পার্বতী, কার্তিক, গণেশ, কালীয়, অষ্টনাগ, জরৎকারু, আস্তিক, মর্ত্যে চন্দ্রধর, তৎপত্নী স্বর্ণরেখা, তৎপুত্র লক্ষীধর, তৎপত্নী

বিপুলা (বেহুলা) ইত্যাদির পূজা করবে।[৮] এখানে যেহেতু বেহুলা (বিপুলা)র পূজা এবং নৌকার প্রসঙ্গ আছে, বহু দেবদেবীর মূর্তি আছে, সেহেতু সুন্দর নৌকা নির্মাণ করে তাতে ভূতনাথের সম্মুখে বেহুলার নৃত্য দেখতে যাঁরা সমাগত হয়েছিলেন, তাঁদেরও পূজা করবে, এমন একটা বিধি বিধান হয়তো বেহুলার পূজা-পরিকল্পনায় থাকতে পারে। অবশ্য তা যদি নাও থাকে তবে বেহুলার যখন পূজা, তখন ভূতনাথের সম্মুখে বেহুলার নৃত্য দেখতে যাঁরা সমবেত হয়েছিলেন তাঁদেরও বেহুলার পূজার ক্ষেত্রে আনা হয়েছে। তাই নানা দেবদেবীর সমাবেশ এখানে। রথের পর পঞ্চমীতে এখানে বেহুলার ঝাঁপান অনুষ্ঠিত হয়। এটি বাংলার সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

তথ্যপঞ্জী

১। Vipradasa's Manasa-Vijaya, By Sukumar Sen, Asiatic Society, Cal. 1953, P. 234.

২। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড। পূর্বার্ধ), ডঃ সুকুমার সেন, ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, ৪র্থ সং ১৯৬৩, পৃঃ—২১৪

৩। Vipradasa's Manasa-Vijaya, By Sukumar Sen, Asiatic Society, Cal. 1953, P. 216.

৪। বাংলার লৌকিক দেবতা, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, দেজ, প্রথম দেজ সং ১৩৮৫, পৃঃ—৬২

৫। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড। পূর্বার্ধ), ডঃ সুকুমার সেন, ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, ৪র্থ সং ১৯৬৩, পৃঃ—১৮৩

৬। লৌকিক শব্দকোষ (২য় খণ্ড), শ্রীকামিনীকুমার রায়, লোকভারতী, ১ম প্রকাশ ১৩৭৭, পৃঃ ২২২-২৩

৭। উড়িষ্যার বাশুলী, শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৩৫ বর্ষ / বাংলার লৌকিক দেবতা, শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, দেজ, প্রথম দেজ সং ১৩৮৫, পৃঃ—৫৯

৮। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, এ. মুখার্জী, ৬ষ্ঠ সং ১৯৭৫, পৃঃ ২১৮-১৯

উপলতি

কালনা থানার অন্তর্গত একটি গ্রাম। এটি বিটরা-দেবীপুর বাসরুটের পাশে। এখানেও উদয়পুরের মতো বেহুলার মন্দির রয়েছে। এখানেও রয়েছে তিনটি প্রস্তর নির্মিত মুখমণ্ডল, যা মনসা, বেহুলা ও নেতার। এঁরা পূজিতা হন এক রজক গৃহে। এই গ্রামে এক পুকুর পাড়ে একটি পাথরের হনুমানজীর মূর্তি রয়েছে। এখানে একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরের নিদর্শন থেকে মনে হয়, ঐ ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরটি আসলে বেহুলা তথা মনসার প্রাচীন মন্দির। সেক্ষেত্রে মনসার দুঃসাধ্য কার্যের সহায়ক রূপে স্বাভাবিক ভাবেই হনুমানজী বাইরেই ছিলেন। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন "অসম্ভব বীরত্ব ও সাহসিকতাপূর্ণ কাজ মাত্রই হনুমানের দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে। সেই সূত্রে হনুমান কখনও মনসার, কখনও ধর্ম ঠাকুরের, কখনও চণ্ডীর দুঃসাধ্য কার্যের সহায়ক।"[১]

তথ্যপঞ্জী

১। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, এ. মুখার্জী, ষষ্ঠ সং ১৯৭৫, পৃঃ—৫৫

জান্নগর (জাহান্নগর)

জাহান্নগর পূর্বস্থলী থানার অন্তর্গত একটি গ্রাম। এটি নবদ্বীপের নিকটস্থ ভাণ্ডারটিকুরি হল্টের গায়েই। ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে এটিকে জহ্নুদ্বীপ নামে অভিহিত করা হয়েছে। জনশ্রুতি—জহ্নুমুনি এখানে গঙ্গাকে এক গণ্ডুসে পান করেন। গঙ্গার কাকুতি মিনতিতে তাঁর দেহের মধ্যে অবরুদ্ধ গঙ্গাকে জানু চিরে বার করে দেন। তাই স্থান নামটি হয় জান্নগর। তবে এই জনশ্রুতি আরোপিত বলেই মনে হয়। যাই হোক, এই গ্রামেই ভাণ্ডারটিকুরি স্টেশনের গায়েই রয়েছে মনসার থান। এখানে মনসার পূজা গাছপূজা নামে পরিচিত। তাছাড়া, এখানে মনসা ব্রহ্মাণী নামেও পূজিতা হন। তাই এই স্থানটি ব্রহ্মাণীতলা নামেও পরিচিত। "জনশ্রুতি যে চাঁদসওদাগর নাকি এখানেই সর্বপ্রথম মনসাপূজা

করেন।”[১] কিন্তু এই জনশ্রুতি যে আরোপিত তা সত্য বলেই মনে হয়। তবে এই জনশ্রুতি প্রমাণ করে যে এই পূজার ঐতিহ্য প্রাচীন।

ডঃ অলোককুমার চক্রবর্তী বলেছেন যে কৃষ্ণচন্দ্র দেবী মনসাকে শাক্তদেবী ব্রহ্মাণীতে রূপান্তরিত করেন।[২] কিন্তু তা যদি সত্য হয় তবে বলা যায়, এই ব্রহ্মাণীর প্রতিষ্ঠা রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের আমলে বা তার পরবর্তীকালে। কিন্তু মনসার 'ব্রহ্মজ্ঞান পাইয়া নাম হইল ব্রহ্মাণী।'[৩] এই 'ব্রহ্মাণী'র মতো অনেক নামেই যে মনসা পরিচিতা হচ্ছেন, তার উল্লেখ বিপ্রদাসের কাব্যেও রয়েছে। আর সেই সেই বিভিন্ন নামেই যেখানে মনসা পূজিতা হচ্ছেন, সেখানে জান্নগরের মনসা যে কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সূত্রে ব্রহ্মাণীতে আখ্যায়িতা হচ্ছেন তা বলা যায় না। তবে এই পূজার নাম 'গাছপূজা' থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে একদা এই জনপদে দেবী বৃক্ষেই পূজিতা হতেন, এবং কালক্রমে মৃৎ মূর্তিতে পূজিতা হতে থাকেন। এক্ষেত্রে বলা যায়, এই জনপদে 'গাছপূজা' রূপে মনসার পূজার ইতিহাস প্রাচীনত্বেরই দাবী রাখে। এখানে শ্রাবণী সংক্রান্তিতে ব্রহ্মাণী দেবীর পূজা উপলক্ষে একটি বৃহৎ মেলা বসে। এই মেলা দীর্ঘকাল ধরেই বসে আসছে। ভোলানাথ চন্দের গ্রন্থেও এই মেলার উল্লেখ আছে। বিবরণীতে বলা হয়েছে **"Brahmanitala, in John-nugger is a spot where human sacrifices were formely offered to an image of Doorga and where a great mela is now annually held in July."**[৪]

এই পূজা ও মেলার বিবরণ রয়েছে ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকার ১৪ই আগস্ট এবং ২৭শে নভেম্বর সংখ্যায়।

আমরা জানি, কোন কোন ক্ষেত্রে উৎসব অনুষ্ঠানাদির সাথে কোন না কোন প্রতিযোগিতা জড়িয়ে থাকে—যেমন বাজি পোড়ানোর লড়াই, কবি বা তরজার লড়াই, পীঠে লড়াই, যা সংস্কৃতিরই অঙ্গ। এখানেও যে একটি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতো, তার উল্লেখ আছে সমাচার দর্পণের ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই আগস্ট সংখ্যায়। সেখানে বলা হয়েছে "তদ্দেশীয় অধ্যাপকেরা আপন ২ ছাত্র সঙ্গে করিয়া সেখানে যান ও অধ্যাপকে ২ ও ছাত্রে ২ বিচার হইয়া জয় পরাজয় নিশ্চিত হয়।"

এই জান্নগরের পশ্চিমে আধক্রোশ দূরে রাক্ষসীপোতা। জনশ্রুতি—এখানে রাজা চন্দ্রসিংহের রাজপুরী ছিল। এখানে একটি রৌপ্যমুদ্রা পাওয়া যায়।

উহার একদিকে 'শ্রীশ্রীচন্দ্রকান্ত সিংহ—নরেন্দ্রস্য' বাংলায় এবং অপরদিকে মৈথিলী অক্ষরে 'শকে ১২৪৩' লিখিত ছিল।[৫] এটি প্রত্নতত্ত্বের ইতিহাসে অতি গুরুত্বপূর্ণ।

তথ্যপঞ্জী

১। নদীয়া-কাহিনী, কুমুদনাথ মল্লিক, সম্পাদক—মোহিত রায়, পুস্তক বিপণি, ৩য় সং ১৯৮৬, পৃঃ-৩৩৯

২। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, ডঃ অলোককুমার চক্রবর্তী, প্রগ্রেসিভ বুক ফোরাম, ১ম প্রকাশ ১৯৮৯, পৃঃ—১৪৫

৩। Vipradasa's Manasa-Vijaya, Edited by : Sukumar Sen, Asiatic Society, Cal. 1953, Pp. 2-3

৪। Travels of a Hindu (Vol. 1), Bholanath Chanda, Pp. 44-45

৫। শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধান (২য়, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড), সঙ্ক : শ্রীহরিদাস দাস, নবদ্বীপ, ২য় সং ৫০১ শ্রীচৈতন্যাব্দ, পৃঃ-১৮৭৩

বৈদ্যপুর

কালনা থানার ২য় ব্লকের অন্তর্গত একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম বৈদ্যপুর। এই গ্রামের মন্দির এবং উৎসব অনুষ্ঠানাদির প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই নন্দীবংশের জমিদারীর আদিপর্বের ইতিহাসকে স্মরণ করতে হয়।

বৈদ্যপুরের শ্রী প্রশান্তকুমার কুণ্ডুর বৈঠকখানায় ফ্রেমের মধ্যে নন্দী বংশের যে কোর্ষিনামা রয়েছে তা থেকে জানা যায়, নন্দীদের আদি নিবাস ছিল কেল্না, দেহুড়া (থানা—মেমারী, জেলা—বর্ধমান)। এই বংশের হারাধন নন্দী (হারা তিলি) গরুর পিঠে ছালা দিয়ে নুন, মুগ, মুসুরী নিয়ে ব্যবসার সূত্রে প্রথম বৈদ্যপুরে আসেন প্রায় বাং ১০৬৫ সনে (১৬৫৮ খ্রীঃ)। তাঁর পুত্র গোবর্দ্ধন নন্দী। তাঁর পুত্র শিশুরাম নন্দী। তাঁর স্ত্রী দ্রৌপদী জনৈক সন্ন্যাসীর নিকট থেকে শ্রীশ্রী৺ রাজরাজেশ্বর জীউকে পান বাং ১১২২ সনে (১৭১৫ খ্রীঃ)।

এঁদেরই তিন পুত্র (ভগীরথ, দুর্লভরাম ও ঠাকুরদাস) বাং ১১৬৪ সনে (১৭৫৭ খ্রীঃ) তঁদের লবণ, সাজিমাটি, চুন ও ধানের কারবার ছড়িয়ে দেন মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বাবুগঞ্জ, রায়গঞ্জ, রাজগঞ্জ, পাটনা, কলিকাতা, ভাঁটি, তমলুক, জঙ্গীপুর, জলেশ্বর, নারায়ণগড, হিজলি, সাহেবগঞ্জ, কালনা প্রভৃতি অঞ্চলে। এঁদের মধ্যে দুর্লভরামের পুত্র প্রথম বাং ১২০২ সনে (১৭৯৫ খ্রীঃ) মালদহের একটি বৃহৎ লাট ক্রয় করে জমিদারীর গোড়াপত্তন করেন। আর নন্দীবংশের সংরক্ষিত একটি ডায়রী থেকে জানা যায় যে নন্দীবংশীয়েরা ১২০৫ সনে (১৭৯৮ খ্রীঃ) ২২শে আশ্বিন বোর্ড অব রেভিনিউ হতে দিনাজপুর ও ইন্দ্রনারায়ণপুর লাট বন্দোবস্ত নেন, এবং তা উত্তরবঙ্গের সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহের অবসানের মুখে।

নন্দীবংশীয়েরা বর্ধমানের রাজাদের কাছ থেকে পত্তনি, দরপত্তনি, এবং সে-পত্তনি লাভ করেন। আর তা জানা যায় নন্দীবংশীয়দের দলিল পরচাদি থেকে।

ইতিহাসের সূত্রে জানা যায়, বর্ধমানরাজ তেজচন্দ্র পত্তনিপ্রথা প্রচলন করেন, এবং ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে সেই পত্তনিপ্রথা আইনের স্বীকৃতি পায়।[১] সুতরাং সেদিক থেকে বলা যায়, ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের পরেই নন্দী বংশীয়েরা বর্ধমানের রাজার কাছ থেকে পত্তনি, দরপত্তনি বা সে-পত্তনি নিচ্ছেন। নন্দীবংশে সংরক্ষিত ডায়রীটি থেকে জানা যায় যে .জোড়মন্দিরের পিছনে ছিল শিশুরামের মেটে বাড়ি। শ্রীপ্রশান্ত কুমার কুণ্ডু জানান যে বর্তমানের বৃহৎ দালানসমূহ কালনার পুরানো সমাজবাড়ি নির্মাণের কালেই নির্মিত হয়।

পুরানো সমাজবাড়িতে দুটি সমাধি মন্দির রয়েছে। বয়সের দিক থেকে প্রথমটি তেজচন্দ্রের সমাধিগৃহ, যার নির্মাণকাল ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দ। এখানে যেহেতু রাজা তেজচন্দ্র এবং তাঁর মহিষী কমলকুমারীর উদ্দেশ্যেই পুরানো সমাজবাড়ি নির্মিত হয়েছিল, সেহেতু বলা যায় ঐ সময়েই বৈদ্যপুরের নন্দীবাড়ির বৃহৎ দালানসমূহের নির্মাণকার্য শুরু হয়। তবে এর পূর্বে কিছু কাজ যে হয়েছিল তার প্রমাণ জোড়া মন্দির, যার নির্মাণকাল ১৭২৪ শকাব্দ (১৮০২ খ্রীঃ)। এর পূর্বে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ব্যবসা সূত্রে নন্দী বংশীয়দের হাতে প্রভূত অর্থ এসেছে। কিন্তু ১৭৪১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বর্গীর হাঙ্গামা, আর ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর।—এই দুইটি অভিঘাত বাংলা তথা বর্ধমানের

অর্থনৈতিক মেরুদণ্ডকে সম্পূর্ণরূপে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। এরপর তো জীবনের অনিশ্চয়তা। তাই ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে গৃহনির্মাণ বা দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা হয়তো সম্ভব হচ্ছে না।

এর পূর্বে একটি মন্দির ছিল। নন্দীবংশীয়দের মতে তা কুণ্ডুবংশীয়দের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এটি জোড়া মন্দিরের কাছে। এই দক্ষিণমুখী মন্দিরটিকে দুই বাড়ির খোপের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ মন্দিরটি যখন পূর্বেই ছিল, তখন এর পূর্ব পশ্চিমদিকের দেওয়ালকে দুদিকের বাড়ির দেওয়ালরূপে ব্যবহার করে সমুখস্থ ভাগকে একই রেখায় রেখে দুই বাড়ির খোপের মধ্যে তাকে রাখা হয়েছে, ঠিক যেন গেঁথে রাখার মতো। এর দৈর্ঘ্য প্রস্থ ৯'×৯'। এর ভিতরে রয়েছে ছোট্ট বেদীর উপর ৩½ ফুটের মতো কৃষ্ণকায় শিবলিঙ্গ। এর টেরাকোটার কাজগুলি জীর্ণ হয়ে গেছে। তার মধ্যে রয়েছে রথারোহী সৈন্য, অশ্বারোহী সৈন্য, কৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা, পুতনাবধ, পক্ষীসজ্জা, দরজার মাথায় মন্দিরসজ্জা। বাকি ফুলকারি কাজ।

জোড়া মন্দিরের মধ্যে একটি নবরত্ন মন্দির। এর দৈর্ঘ্য প্রস্থ ১০´×১০´। উচ্চতা আনুমানিক ৩৫´। বেদীর উপর ৪½ ফুটের মতো কৃষ্ণকায় শিবলিঙ্গ। এর প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায়, এর প্রতিষ্ঠাকাল ১৭২৪ শকাব্দ (১৮০২ খ্রীঃ)। মাতার স্মৃতিরক্ষার্থে জয়দেব নন্দী কর্তৃক স্থাপিত, মিস্ত্রী শ্রীজগন্নাথ। এই মন্দিরের নীচের প্যানেলে রয়েছে যুদ্ধদৃশ্য, পুতনাবধের দৃশ্য। উপরাংশে ফুলকারি কাজ। দরজার মাথায় মন্দির চিত্র। এই জোড়া মন্দিরের অন্যটি আটচালা মন্দির। এর দৈর্ঘ্য প্রস্থ ১০'×১০'। উচ্চতা ২৫ ফুটের মতো। উষ্ট্রসৈন্য, অশ্বারোহী সৈন্য, গণেশ, পক্ষী, দ্বারের মাথায় মন্দির, এবং ফুলকারি কাজ দিয়ে মন্দিরটি অলংকরণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ছোট্ট পীঠের উপর ২ ফুটের মতো কৃষ্ণকায় শিবলিঙ্গ।

শ্রীশ্রীরাজরাজেশ্বর জীউকে বাং ১১২২ সনে (১৭১৫ খ্রীঃ) শ্রীশিশুরাম নন্দীর পত্নী দ্রৌপদী এক সন্ন্যাসীর নিকট থেকে প্রাপ্ত হন। সেই দেবতাই নন্দীবংশীয়দের কুলদেবতারূপে পূজিত হতে থাকেন। এই ঠাকুরপ্রাপ্তি সম্বন্ধে ঠাকুরের পূজারী শ্রীনন্দগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ৩. ১. ১৯৯২ এর এক সাক্ষাৎকারে বর্তমান লেখককে বলেছেন: জনৈক সন্ন্যাসী বৈদ্যপুরে এসেছিলেন। তাঁর কাছে কয়েকটি নারায়ণ শিলা ছিল। তাঁর কাছে একটি শিলা চাওয়া হলে

তিনি তা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। সেদিন রাত্রে ঠাকুর স্বপ্নে দ্রৌপদীকে দেখা দিয়ে বলেন: যে শিলার উপর শ্বেতমাছি বসে থাকবে সেই শিলাটি নিবি।—সেই শিলাটিই নেওয়া হয়েছিল। সন্ন্যাসী শিলাটি দিয়ে বলেছিলেন, ইনি রাজরাজেশ্বর। এঁর পূজা করলে সংসারে তোর সুখ সমৃদ্ধি হবে।—এই জনশ্রুতিকেই একটু অন্যভাবে বললেন শ্রীপ্রশান্তকুমার কুণ্ডু ১৪. ১০. ৯৪ এর সাক্ষাৎকারে। তিনি বললেন: সাধু প্রথমে রাজরাজেশ্বর দিতে চান নি। জটার মধ্যে লুকিয়ে রাখেন। কিন্তু দ্রৌপদীকে ঠাকুর স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেন: আমি সাধুর জটার মধ্যে রয়েছি। অনেক কাকুতি মিনতিতে সন্ন্যাসী রাজরাজেশ্বরকে জটার মধ্য থেকে বার করে দিতে বাধ্য হন।

এই দেবতার স্বরূপ বর্ণনা করে মন্দিরে একটি শ্বেতপাথরের ফলক লাগানো হয়েছে, যা হাল আমলের বাংলা হরফে বাংলা ভাষাতেই লেখা। লেখাটি হলো—

ওঁ

মধ্যম বর্ত্তুল যথা সপ্তচক্র রায়
ছত্র শর তুণ চিহ্ন যদি দৃষ্ট হয়
রাজরাজেশ্বর হয় তাহার আখ্যান
কহিনু সবারে এই শাস্ত্রের প্রমাণ।

ইনি কষ্টিপাথরের নারায়ণ শিলা, যা বর্তমানে অপহৃত। এখন বর্তমানের বৃহৎ গৃহসমূহ যদি কালনার পুরাতন সমাজবাড়ির সমকালে নির্মিত হয়, এবং রাসমঞ্চের নির্মাণকাল বাং ১২৪৩ (১৮৩৬ খ্রীঃ) সাল হয়, তবে এর অন্তর্বর্তী কোন সময়ে বর্তমানের ঠাকুরমন্দির যে নির্মিত হয়েছিল তা অনুমান করা যায়। কারণ, ঠাকুরগৃহ নির্মাণের পরেই যে রাসমঞ্চ নির্মিত হয়েছিল তা নিশ্চিত। রাজরাজেশ্বর মন্দিরের দুটি মহাল। বাহির মহালে দুর্গাদালান। উচ্চভিত্তি বেদীর উপর দালানরীতির মন্দিরে ডাকের সাজের দুর্গা প্রতিমার পূজা হয়ে থাকে দক্ষিণমুখী ঘরে। ভিতর মহালে সুউচ্চ ভিত্তিবেদীর উপর পূর্বমুখী দালানরীতির ঘরে রয়েছেন রাজরাজেশ্বর, যার প্রবেশদ্বার উত্তরমুখী।

নন্দীবংশীয়দের দ্বারা বাং ১২৪৩ (খ্রীঃ ১৮৩৬) সনে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে রাসমঞ্চ। শিল্পী নিত্যানন্দ মিস্ত্রী। এটি এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যময় স্থাপত্য। প্রায় ৫ ফুট উচ্চ বেদীর উপর আটকোণাকৃতি খিলান প্রায় ২০ ফুট উপরে উঠে গিয়ে

ছাদের সৃষ্টি করেছে। তার আটকোণে আটটি চূড়া। প্রতি চূড়ার নীচে একটি করে বৃহদাকার হংসমূর্তি ও একটি বৃহৎ সাইজের ন্যাটার ফলের আকৃতির প্রস্তরখণ্ড। এর পর ১০´ ফুটের মতো উঠিয়ে তার ছাদে ফুলের পাপড়ির মতো করা হয়েছে। তার উপর একটি কোণাকৃতি চূড়া। এটি মূলতঃ নবরত্ন মন্দির। এই মন্দিরের সম্মুখে রয়েছে উড়িষ্যার রেখরীতির একটি ছোট রাসমঞ্চ।

রাসমঞ্চের পাশেই রয়েছে বৃন্দাবনচন্দ্রের সুউচ্চ মন্দির। তিন খিলানযুক্ত খোলা দরজার ঢাকা বারান্দা। এই বারান্দাসহ মন্দিরের দৈর্ঘ্য প্রস্থ ২০´×১৭´। এই দক্ষিণমুখী মন্দিরটির পশ্চিমেও একটি দরজা আছে। ৩´ ফুট উচ্চ ভিত্তি-বেদীর উপর প্রায় ২৫´ ফুট উঠে সামতালিক ক্ষেত্রে ছাদ সৃষ্টি করা হয়েছে। সেই দালানরীতির ছাদের চার কোণে ৪টি চূড়া। ক্ষেত্রকে কমিয়ে ১৫ ফুট উঠে সামতালিক ক্ষেত্রে ছাদের উপর চার কোণে আরও ৪টি চূড়া। এর পর প্রায় ৭´ ফুটের মতো বড় একটি চূড়া। অর্থাৎ চূড়াসজ্জা হচ্ছে ৪+৪+১। উচ্চতা আনুমানিক ৫০ ফুটের মতো। এর সম্মুখভাগে রয়েছে শুধুই ফুলকারি কাজ। আর সম্মুখভাগে দরজার মাথায় কার্নিসের নীচে রয়েছে একটি প্রতিষ্ঠা লিপি। লিপিটি: ৺শিশুরাম নন্দিন:

পুত্রানাং ভগীরথ নন্দি
দুর্ল্লভরাম নন্দি ঠাকুরদাস
নন্দিনাং পরিবারেণ
কৃতো দেবালয় অস্যাম
শ্রীনিত্যানন্দ মিস্ত্রী শ্রীরাম
চন্দ্র মিস্ত্রী শন ১২৫২ শাল

অর্থাৎ মন্দিরটি শিশুরাম নন্দীর তিন পুত্রের পরিবারস্থ সদস্যগণের যৌথ প্রচেষ্টায় ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়েছিল। এর সম্মুখে রয়েছে ৩ খোলা দরজা ×৪ খোলা দরজার সুবৃহৎ নাটমন্দির।

এই মন্দিরের প্রাকারের বাইরে দরজার সম্মুখে রয়েছে একটি ক্ষুদ্র শিব-মন্দির। জরাজীর্ণ। অন্য শিবমন্দিরের মতোই এতেও রয়েছে কিছু টেরাকোটার কাজ।

রাজরাজেশ্বর মন্দির থেকে দক্ষিণমুখে এগিয়েই রয়েছে একটি পঞ্চরত্ন শিবমন্দির। এর দৈর্ঘ্য প্রস্থ ৯´×৯´। উচ্চতা ২০ ফুটের মতো। এতে রয়েছে

ফুলকারি কাজ ও পক্ষীসজ্জা। দরজার দুপাশে দুই হনুমান। এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ২২ ফুটের মতো কৃষ্ণকায় শিবলিঙ্গ।

এ ছাড়া একটি জোড়া শিবমন্দির রয়েছে মুখোমুখী অবস্থায় রথতলা যাবার পথে কারখানার পাশেই। এদের দুটিই আটচালা রীতির। দুটিরই দৈর্ঘ্য প্রস্থ ৯'×৯'। উচ্চতা ১৫ ফুটের মতো। এদের গায়েও কিছু টেরাকোটার কাজ রয়েছে।

বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দিরে যাবার পথেই রয়েছে একটি দুর্গাদালান। এটি রাস-মঞ্চের সমকালের বা তার পরবর্তীকালের।

রথতলায় রয়েছে দারু নির্মিত একটি ৯ চূড়ার রথ। রেভারেণ্ড লঙের বিবরণে একজোড়া রথের বর্ণনা আছে। এর মধ্যে ছোট রথটি নষ্ট হয়ে যায়। শ্রী যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী বলেছেন যে রথ দুটি ১২০৪ সালে (১৭৯৭ খ্রীঃ) নির্মিত।[২] প্রচলিত একটি ছড়া থেকে জানা যায়, পূর্বে বড রথটির ১৩টি চূড়া ছিল। জীর্ণ হওয়ার জন্য ৪টি চূড়াকে বাদ দেওয়া হয়। কারুকার্যশোভিত নয় চূড়ার বর্তমান রথটির দৈর্ঘ্য প্রস্থ ১৪'×১৪'। বাইরের পাটাতনসহ ১৯'×১৯'। ছাব্বিশটি চাকা বিশিষ্ট এই রথের উচ্চতা প্রায় ৬০': এটি রাসমঞ্চ নির্মাণের পূর্বেই নির্মিত হয়েছিল। তবে ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দই যে রথের নির্মাণকাল, সে সম্বন্ধে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না।

রাজরাজেশ্বরের নিত্যসেবা হয়ে থাকে। বার্ষিকী পূজা নেই। তবে প্রতি বছর সরস্বতী পূজার দিন বুড়াবুড়ির (শিশুনাথ দ্রৌপদী) শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে রাজরাজেশ্বরের মন্দিরে। এই বুড়াবুড়ি একই দিনে এক ঘণ্টার ব্যবধানে সরস্বতী পূজার দিন দেহরক্ষা করেন। সেই থেকে তাঁদের বার্ষিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠান ঠাকুর মন্দিরেই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

রাজরাজেশ্বর এবং বৃন্দাবনচন্দ্র বর্তমানে অপহৃত। উভয়ক্ষেত্রেই অন্য ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করে রাজরাজেশ্বর এবং বৃন্দাবনচন্দ্র রূপে পূজা করা হচ্ছে।

রাজরাজেশ্বর রথের সময় রথতলায়, রাসের সময় রাসমঞ্চে এবং পঞ্চম দোলের সময় দোল মন্দিরে যান। দোলের সময় বাজান পুকুরের পাড়ে বারুদ পোড়ান হয়। আর এইসব উৎসবাদির ব্যয় নির্বাহ করে নন্দী বংশীয়দের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ৺রাজরাজেশ্বর এস্টেট। আর এসবের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত বৈদ্যপুরের সংস্কৃতি।

বৈদ্যপুরের উল্লেখযোগ্য প্রত্নিদর্শন হচ্ছে বৈদ্যপুরের দেউল। এই দেউলটির সম্বন্ধে সমীরণ চৌধুরীর সম্পাদিত 'বর্ধমান চর্চা'র ৫নং চিত্রের চিত্র পরিচিতি অংশে বলা হয়েছে, এটি সপ্তরথ পদ্ধতিতে তৈরী একটি রেখ দেউল।

দেউলটি শিখর স্থাপত্যের নিদর্শন। পোড়া পাতলা ইঁটে নির্মিত। উচ্চতা প্রায় ৭০´-৮০´, এবং জগমোহনটির উচ্চতা প্রায় ৫০´-৬০´। এর গর্ভগৃহে প্রবেশের দক্ষিণমুখী দরজা, এবং জগমোহনে প্রবেশের পূর্বমুখী দরজা; আর এমন জগমোহন বিশিষ্ট মন্দির কালনা মহকুমায় একেবারেই বিরল। এই মন্দিরের গঠনরীতি হলো—১৭´ পূর্বে / ৩´ উত্তরে / ১´ পূর্বে / ১´ ৪´´ দক্ষিণে / পূর্বে ১১½´ ফুট—এটি সামনের দিক।

পিছনের দিকে ১৫´ পূর্বে / দক্ষিণে ৩´ ৪´´ / পূর্বে ১´ ২´´ / উত্তরে ৮´´ / পূর্বে ১২´ এবং পূর্ব ও পশ্চিম দিকের প্রস্থ ১৬´ ফুট করে—এইভাবেই বাড়িয়ে কমিয়ে মূল মন্দির ও জগমোহন নির্মাণ করা হয়েছে। এর পশ্চিম ও উত্তর দিকে রয়েছে দুটি নকল দরজা।

দক্ষিণমুখী দরজার বেশ কিছু উর্ধ্বে একটি মাত্র প্যানেলে টেরাকোটার কাজ রয়েছে। যেমন—যুদ্ধরথে দশানন রাবণ, রামচন্দ্র, নৃসিংহ, তীরন্দাজ, ঢালি যোদ্ধা। তাছাড়া, মূল মন্দির ও জগমোহনের দরজার দু'পাশে ও মাথায় ফুলকারি কাজ।

মন্দিরের খিলানগুলিকে সমীপবর্তী করে ক্রমশঃ পরিধি কমিয়ে শিখর রচনা করা হয়েছে।

মূল মন্দিরের দরজার বেশ কিছু উর্ধ্বে এবং প্যানেলের বেশ কিছু নিম্নে রয়েছে প্রতিষ্ঠালিপি।

এই মন্দির সম্বন্ধে শ্রীঅনুকূল চন্দ্র সেন ও শ্রীনারায়ণ চন্দ্র চৌধুরী বলেছেন যে বৈদ্যপুরের পোড়ামাটির মন্দির অনেকের মতে বৌদ্ধদের দেহারা।[৩] তবে তাঁরা দেউল নির্মাণের সময়কাল নির্ণয় করতে পারেন নি। তাঁরা বলেছেন যে এখানে যেটুকু লেখা মন্দিরের দ্বারের উর্ধ্বে পড়া গেছে, তাতে "শুভানন্দ পালেন ...চশকে ভগবৎ পাদসেবার্থং দেবকুল বিনির্মিতং" এটুকু উদ্ধার করা গেছে।[৪] তবে তাঁরা মন্দির নির্মাণের সময়কালকে উদ্ধার করতে পারেন নি। স্থানীয় লোকেরা বলেন, এটি পালযুগে নির্মিত। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রশ্ন থাকে—এটি কি পালযুগেই নির্মিত? এটা কি বৌদ্ধ দেহারা? এখন এটি বৌদ্ধ দেহারা বা

পালযুগে নির্মিত কিনা, তা বিচার করে দেখা যেতে পারে। এক্ষেত্রে প্রথমেই বলা যায়, প্রতিষ্ঠালিপিতে এখনও যা অবশিষ্ট আছে তার নির্ভুল পাঠ গ্রন্থকার-দ্বয় নিতে পারেন নি। তাঁরা যেখানে 'ভগবৎপাদসেবার্থং' ধরেছেন, সেখানে এখনও স্পষ্টই পড়া যায় 'শ্রীকৃষ্ণপাদসেবার্থম্'। সুতরাং এ থেকে স্পষ্টই বলা যায়, মন্দিরটি ছিল কৃষ্ণমন্দির।

লিপিটির প্রথমেই শ্রীরয়েছে, এবং ঐ পংক্তির শেষে রয়েছে 'শকে'। তা থেকে নিশ্চিত করে বলা যায়, মন্দির প্রতিষ্ঠালিপির রীতি অনুযায়ী 'শ্রীশুভমস্তু' এই শব্দের পরে সাঙ্কেতিক শব্দের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠাকালকে ধরা হয়েছিল। এখন সেই সাঙ্কেতিক শব্দগুলি উঠে গেছে। সুতরাং এদিক থেকে নিশ্চিত করে বলা যায় যে মন্দিরটি শুভানন্দ পালের দ্বারা নির্মিত হয় নি। আমি প্রতিষ্ঠালিপির যেটুকু উদ্ধার করেছি, তা হলো—

শ্রীশুভমস্তু···ফ শকে
শ্রীকৃষ্ণপাদসেবার্থম···লক্ষ্মণ মিস্ত্রী
১···

মন্দিরটিকে দেখে একটি প্রাচীন স্থাপত্য বলে মনে হয়। এটি শিখররীতির হলেও এর শিখর রচনার স্বাতন্ত্র রয়েছে। কিন্তু মন্দিরটি যদি পাল বা সেন যুগে নির্মিত হতো তবে তা অমন অক্ষত অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারত না। এক্ষেত্রে শ্রীঅমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য স্মরণীয়। তিনি পাহাড়পুর মহাস্থানগড় প্রসঙ্গে বলেছেন যে ইঁটের মন্দির দীর্ঘস্থায়ী নয় বলে চার পাঁচশ' বছরের বেশী পুরাতন এ-জাতীয় সৌধ বাংলাদেশে আর আছে কিনা সন্দেহ।[৫] দ্বিতীয়তঃ, লিপিটি বাংলা হরফে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। এখন মন্দিরটি যদি পাল বা সেন যুগে নির্মিত হতো, তবে সেই বাংলা হরফ সহজে পাঠ করা সম্ভব হতো না। আর এই লিপি ইঁটের মধ্যে যেভাবে খোদিত তাতে যে পরবর্তীকালে সংস্কারের সময় স্থাপিত হয়েছিল তা বলা যায় না। তৃতীয়তঃ, লক্ষ্মণ মিস্ত্রীর নীচে একটি সাল রয়েছে। তার প্রথম সংখ্যাটি স্পষ্টই ১, অন্যগুলি অস্পষ্ট। এখানে ১ সংখ্যাটি খ্রীষ্টীয় সালের নয়। কারণ, কোন মন্দিরেই খ্রীষ্টীয় সাল থাকে না, বিশেষ করে প্রাচীন মন্দিরসমূহের ক্ষেত্রে। সেক্ষেত্রে সাঙ্কেতিক ভাষায় শকাব্দের উল্লেখ থাকে, আর শেষে থাকে বাংলা সন। এখানেও তাই রয়েছে। এখানে ১ যখন রয়েছে তখন পরের সংখ্যাটি ০, ১, ২, ৩ হতে পারে।

কিন্তু মন্দিরটির প্রাচীনত্ব বিচার করে এর নির্মাণ কাল থেকে বাং ১২০০ বা ১৩০০ সালকে বাদ দেওয়া যায়। সেক্ষেত্রে এঁর নির্মাণকাল ১০০০ থেকে ১১০০ সালের মধ্যে ধরা যেতে পারে, তবে তা হারাধন নন্দীর বৈদ্যপুরে আসার আগেই নির্মিত হয়েছিল। যতদূর মনে হয়, ১ এর পরে শূন্য ছিল, যা অস্পষ্ট হয়ে গেছে। মুর্শিদাবাদের ইতিহাস-এ শ্রীনিখিল রায় বলেছেন যে বৈদ্যবাটি-হুগলী অঞ্চলের জমিদার ছিলেন কিঙ্কর মাধব সেন।[৬] এর প্রসঙ্গে আব্দুল করিম তাঁর **'Murshidquli khan and His Times'** নামক গ্রন্থে (**Page 41**) লিখেছেন যে কিঙ্কর মাধবের সঙ্গে মুর্শিদকুলির বিরোধের কারণ ছিল ব্যক্তিগত আক্রোশ। বিদ্বেষবশতঃ রাজস্ব তছরূপের অজুহাতে কিঙ্কর মাধব সেনকে বন্দী করা হয়, এবং বন্দী অবস্থায় তাকে প্রচুর পরিমাণে মহিষের দুধ ও লবণ আহার করতে বাধ্য করা হয়। ফলে হুগলী প্রত্যাবর্তনের পর তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। সম্ভবতঃ এই ঘটনা ১৭১৮-২২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সংঘটিত হয়।[৭] ১৯৭৪-র 'বর্ধমান সম্মিলনী'-র একটি প্রবন্ধ থেকে জানা যায়, মীরহাট—পাতিলপাড়া—বৈদ্যপুর—নারিকেলডাঙ্গা অঞ্চলটি অতীতে হুগলীর ফৌজদারের রাজস্বসীমার মধ্যে অবস্থিত ছিল। জনশ্রুতি এই যে বৈদ্যপুর অঞ্চলের গড়ের ডাঙ্গায় তাঁর গড়বাড়ি ছিল, এবং পাতিলপাড়ায় কষ্টিপাথরের হরগৌরীর যুগলমূর্তি তাঁর গৃহদেবতারূপে অধিষ্ঠিত ছিল।[৮] এখানে এই যে জনশ্রুতি তা যদি সত্য হয়, তবে বলা যায়, শূন্য দেউলে প্রতিষ্ঠিত দেবতা ছিলেন কিঙ্কর মাধব সেনেদেরই পারিবারিক দেবতা।

আমরা জানি, 'কিঙ্কর' শব্দের আভিধানিক অর্থ সেবক বা দাস। সুতরাং তাঁদের পারিবারিক দেবতা শ্রীকৃষ্ণের (মাধবের) নামের সূত্রেই তাঁর নাম কিঙ্কর মাধব আসছে। এবং এটি তাঁর পিতৃদত্ত নাম বলেই মনে হয়। আর এ থেকে অনুমান করা যায়, মাধব বা শ্রীকৃষ্ণের প্রতিষ্ঠা কিঙ্কর মাধবের জন্মের পূর্ব থেকেই। আর মুর্শিদকুলি খাঁর সাথে তাঁর বিবাদ যদি ১১২৫-৩০ বঙ্গাব্দের মধ্যে সংঘটিত হয়, তবে মন্দির প্রতিষ্ঠার কাল ১০০০ বঙ্গাব্দের শেষ পর্বের কোন সময় হতে পারে। তারপর কিঙ্কর মাধবের ভাগ্যবিপর্যয়, এবং অকাল মৃত্যু হয়তো মন্দিরটিকে অভিভাবকহীন করে। এর উপর দিয়ে বর্গীর হাঙ্গামা ও ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের মতো ঘটনাস্রোত বয়ে যায়। পারিবারিক বিপর্যয়ের সূত্রে ঠাকুর অন্যত্র সরে যায়, বর্গীর হাঙ্গামার সূত্রে, যার দৃষ্টান্ত বর্গীর হাঙ্গামার

ইতিহাসে বিরল নয়। সেক্ষেত্রে বর্গীর হাঙ্গামা, এবং ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের জন্য আর্থিক কাঠামো এমনই বিপর্যস্ত হয় যে মন্দিরটির প্রতি দৃষ্টিপাত করা সম্ভব হয় নি। এমন কি নন্দী বংশীয়দের পক্ষেও না, যেহেতু তাঁরা ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে মন্দির নির্মাণের কথা ভাবতে পারেন নি। যখন ভাবার সময় এসেছে তখন নিজেদের পারিবারিক মন্দির নয় বলে হয়তো নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করেন নি। তবে মন্দিরটির প্রতি যে তাঁদের দৃষ্টি না ছিল তা নয়। যদি না থাকত তবে মন্দিরটির অভিভাবকহীন অবস্থায় টিকে থাকা সম্ভব ছিল না। পরিত্যক্ত হওয়ার সুযোগে মহীরুহেরা শত শত শিকড় চালিয়ে মন্দিরটিকে শুধু জীর্ণ ই নয়, ধ্বংসও করে দিত।

তথ্যপঞ্জী

১। বর্ধমান চর্চা, সম্পাঃ—সমীরণ চৌধুরী, বর্ধমান ১৯৮৯, পৃঃ—২৬

২। বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি (৩য়), শ্রী যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, পুস্তক বিপণি, ১ম প্রকাশ ১৯৯৪, পৃঃ—২৯০

৩। বর্ধমান পরিচিতি, শ্রীঅনুকূলচন্দ্র সেন ও শ্রীনারায়ণচন্দ্র চৌধুরী, বুক সিণ্ডিকেট, ১ম প্রকাশ ১৩৭৩, পৃঃ—৩১০

৪। তদেব, পৃঃ—৩১০

৫। দেশ, সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭২ (হুগলীর মন্দির-ভাস্কর্য, অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়), পৃঃ—৮১

৬। বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি, (২য় খণ্ড) শ্রীযজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, পুস্তক বিপণি, ১ম প্রকাশ ১৯৯১, পৃঃ—১১১

৭। তদেব, পৃঃ—১১১

৮। বর্ধমান সম্মিলনী, ১৯৭৪, পৃঃ—৫৮

রানীবন্দ

কালনা থানার কালনা ১নং ব্লকের অন্তর্গত একটি গ্রাম। এটি কালনা-বর্ধমান বাসরুটের উপর পড়ে। এখানে আষাঢ় মাসের নবমী তিথিতে উল্টো-রথের দিন চণ্ডীর পূজা হয়, এবং সপ্তাহ কালব্যাপী আষাঢ় নবমীর মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই মেলার প্রতিষ্ঠাকাল ১৫০ বছরের উর্ধ্বে নয়।

চণ্ডীর প্রতিষ্ঠাতা অদ্বৈত গোঁসাই নামক এক বৈষ্ণব সাধক। তিনি জঙ্গল সাফ করে আশ্রম প্রতিষ্ঠার সময় চণ্ডীর শিলা কুড়িয়ে পেয়ে তাঁকে প্রতিষ্ঠা করেন, এবং হাট বসান। ঐ স্থানের অধিকার নিয়ে তৈপাড়ার গোস্বামীদের সাথে বৈদ্যপুরের নন্দীদের মামলা বাঁধে। তৈপাড়ার গোস্বামীরা অদ্বৈত গোঁসাইকে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য চাপ দিতে থাকেন। সাক্ষ্য দেওয়ার দিনই তিনি অন্তর্হিত হন। কোন সময়ে ঠাকুরও চুরি হয়ে যায়। পূজক শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্তী সেই শূন্যস্থানে পিতলের চণ্ডীমূর্তি স্থাপন করেন। এই মূর্তি সুউচ্চ গোলাকার বেদীর উপর পশ্চিমমুখী একটি অনুচ্চ আটচালা রীতির মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত।

রানীবন্দ, কাঁকুড়িয়া, গুপ্তিপুর, তৈপাড়া, বেগপুর, ধেড়ে পাড়া থেকে মইয়ের পূজা আসে। পাঁঠাবলি হয়। মন্দিরের পিছনে শূকর বলি দেওয়া হয়। এই দেবী যে পূর্বে অনার্যগোষ্ঠীর দ্বারা পূজিতা হতেন, এ থেকে তা প্রমাণিত হয়। এই চণ্ডী আড়ম্বাই চণ্ডী নামে পরিচিতা। গনতারে এঁর নাকি এক বোন আছে। এই ভগ্নী কল্পনার মধ্যে 'সপ্তভগ্নী' কল্পনার রেশকে আবিষ্কার করা যায়।

মানিকহার (মানকে)

কালনা থানার ১নং ব্লকের অন্তর্গত একটি গ্রাম মানকে (মানিকহার)। এই গ্রামের ধর্মরাজের পূজা অনুষ্ঠিত হয় মেদগাছি সংলগ্ন নপাড়া মৌজায়। তাই এই পূজাকে মানকে নপাড়ার জাত বলা হয়। আমরা জানি, জাত কথাটির মূলে রয়েছে যাত্রা। এখানে মানকে থেকে ধর্মরাজের যাত্রা শুরু হয় নপাড়ার

উদ্দেশ্যে। তাই এই পূজাকে জাতের পূজা বলা হয়। এবং এই পূজাকে কেন্দ্র করে যে মেলা অনুষ্ঠিত হয়, একে জাতের মেলা বলা হয়।

অন্যদিকে, ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন যে "সংজাত" শব্দ এসেছে সংস্কৃত "সাংযাত্রিক" (অর্থ একত্র জলপথযাত্রী) থেকে। ধর্মঠাকুরের আদ্য-পূজা স্থানে নৌকায় করে গিয়ে পূজা ও তপশ্চরণা করতে হত বলে ধর্মঠাকুরের উদ্দেশ্যে বহু মিলিত ও তপশ্চর্যার নাম হয়েছিল সংজাত বা সাংজাত।[১] এই সাংজাত থেকেই ধর্মপূজাকে জাতের পূজা, এবং সেই পূজাকে কেন্দ্র করে যে মেলা তাকে জাতের মেলা বলা হয়।

ধর্মঠাকুরের স্বরূপ উদ্ধারের ক্ষেত্রে বিতর্কের অন্ত নেই। বলতে গেলে ধর্মমঙ্গলের অন্যতম কবি সীতারাম দাসের কথায় বলতে হয় 'জটিল ঠাকুর'। ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন যে জন্মসূত্রে ধর্ম হলেন বৈদিক দেবতা বরুণ। তবে তার সঙ্গে আদিত্য (বৈবস্বত যম সমেত), সোম প্রভৃতি অপর বৈদিক দেবতাও মিশে গেছে।[২] শ্রী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ধর্ম ঠাকুরকে প্রচ্ছন্ন বুদ্ধদেবতা বলে মনে করেছেন।[৩] ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন যে ধর্মঠাকুর সূর্য দেবতার প্রতীক।[৪]

ধর্মঠাকুরের ধ্যান মন্ত্রে ঠাকুরকে হস্তপদবিহীন, নিরাকার ও অরূপ (শূন্য মূর্তি) বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ধ্যান মন্ত্রে বলা হয়েছে—

> যস্যান্তো নাদিমধ্যো ন চ করচরণৌ নাস্তি কায়ো ন নাদঃ।
> নাকারো নৈব রূপং ন চ ভয় মরণে নাস্তি জন্মাদির্যস্য।
> যোগীন্দ্রৈর্ধ্যানগম্যং সকল জনময়ং সর্বলোকৈক নাথং।
> ভক্তানাং কামপূরং সুরনরবরদং চিন্তয়েৎ শূন্যমূর্তিম্॥[৫]

তবে বর্তমান কালের পূজারীগণ এঁকে কোথাও বিষ্ণু, কোথাও শিব, কোথাও যম, আবার কোথাও সূর্য বলে ধ্যান করে থাকেন।[৬] সুতরাং বলা যায়, ব্রহ্ম যেমন এক থেকে বহু হয়েছেন, তেমনি নৈরাকার প্রভু নিরঞ্জন ধর্ম তিনি আদিতে যা হোন না কেন, তিনি বহুর মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করেছেন, এবং বহুরূপেই পূজা গ্রহণ করেছেন। তাঁর নানা নামও। যেমন—যাত্রাসিদ্ধি রায়, ক্ষুদি রায়, বাঁকুড়া রায়, স্বরূপনারায়ণ, বুড়ো রায়, শীতল নারাণ, কাঁকড়া বিছা, দোলু রায়, ফতে সিং, সন্ন্যাসী রায়, বংশী রায়, কালু রায়, কালাচাঁদ, রূপনারাণ, মোহন রায়, শ্যাম রায় ইত্যাদি।

মানকের ধর্মরাজের নাম মানিক রাজ। এই 'মানিক' নাম্নী ধর্ম ঠাকুরের নাম অনুসারেই গ্রামটির নামকরণ (মানিক>মানকে) হয়েছিল বলে অনুমান করা যায়।

মানিক রাজ থাকেন বর্গক্ষত্রীয় ধর্মদাস মালিকের গৃহে। এঁর অবস্থান খড়ের ছাউনিযুক্ত এক কুঠুরীর এক মাটির ঘরে। তবে বাঁকুড়ার মটগোদার ধর্মরাজের মতোই ইনিও থাকেন লোকচক্ষুর অন্তরালে, এক কৌটায়।

যে বাড়িতে ধর্মরাজ থাকেন সেই বাড়িকে বোধক বাড়ি বলা হয়। ঠাকুরের উদ্বোধক বলেই হয়তো এই উপাধি।

ধর্মরাজের বার্ষিক পূজা অনুষ্ঠিত হয় মাঘী অমাবস্যার পরে দ্বিতীয়ায়। একাদশীর দিন থেকে চারপাশের গ্রামগুলি থেকে জাতের ঢেঁড়া দিয়ে চাল সংগ্রহ করা হয়।

মাঘী অমাবস্যায় বোধক বাড়ি থেকে এক মাইল দূরবর্তী মেদগাছি গ্রামে ধর্মরাজকে নিয়ে আসা হয়। সেক্ষেত্রে মেদগাছির সিংহ রায়দের বাড়ির কোন ছেলে ঠাকুর বার করে আনেন, এটাই পুরুষানুক্রমিক প্রথা। ঐ দিন ধর্মরাজকে নিয়ে পূজা দেন সিংহরায়রা এবং গ্রামবাসীরা।

মেদগাছি গ্রামের প্রথমেই রাস্তার উত্তর প্রান্তে দক্ষিণমুখী অবস্থায় রয়েছে —পশ্চিমে যোগাদ্যার বাঁধানো শূন্য বেদী, মাঝে ছোট্ট বাঁধানো খুপরিতে ষষ্ঠী, এবং পূর্বে ধর্মরাজের শূন্য বেদী। এখানে ধর্মরাজকে বোধক বাড়ি থেকে এনে প্রথম পূজা দেওয়া হয়। এদিন আশপাশের গ্রামের অনেক মেয়েরাই ধর্মরাজের পালনি করে।

প্রতিপদের দিন বোধক বাড়ি থেকে ধর্মরাজকে মানকের পণ্ডিত (ডোম) পাড়ায় আনা হয়, এবং পূজা দেওয়া হয়। দ্বিতীয়ার দিন মেদগাছির শেষ-প্রান্তে নপাড়া সন্নিহিত প্রাচীন নিমগাছের তলায় একটি বৃহৎ গোলাকার বেদীতে কাঠের সিংহাসনে ধর্মরাজকে স্থাপন করা হয়, এবং পূজা ও হোমকার্যাদি সম্পন্ন হয়।

ব্রাহ্মণে এ ঠাকুর স্পর্শ করেন না। দ্বিতীয়া থেকে পঞ্চমীর দিন পর্যন্ত পূর্ণমাত্রায় মেলা চলে। পূজার দিন মানকে, মথুরহাটি, নপাড়া, শাঁখাটি, মেদগাছি, ভগবতীতলা থেকে মই সাজিয়ে পূজা আসে। একদিনের পূজা। যে কোন বর্ণের পাঁঠা দিয়ে পূজা দেওয়া হয়।

ধর্মপুকুরে স্নান করলে ধবল ও পদ্মকাঁটা সেরে যায়। এখানে কাগজের ছোট ছোট সাদা ছাতা বিক্রি হয়। অনেকেই সেই ছাতা ও দোলা মানত করে। ধবল ভাল হলে মানত অনুসারে এক ভাঁড় চুন দিতে হয়।

ধর্মঠাকুরের বর্ণনা প্রসঙ্গে রূপরাম চক্রবর্তী বলেছেন—

ধবল অঙ্গের জ্যোতি ধবল মাথার ছাতি

ধবল বরণে বাড়ীঘর।—এ থেকে বলা যায়, ধর্মরাজকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাগজের ছাতা ও চুনের ভাঁড় উৎসর্গ করা হয়। অন্যদিকে, জয়ানন্দের কাব্য থেকে জানা যায়—চুন অর্থে সুধা।[৭] সুতরাং সুধা দানের প্রতিশ্রুতিতে রোগমুক্তির জন্য চুন উৎসর্গ। আবার কোন কোন স্থানে চতুর্দোলায় ধর্মঠাকুরের পাদুকা প্রতীককে স্থাপন, ধর্মঠাকুরের পূজা অনুষ্ঠানের একটি অঙ্গ।[৮] সেদিক থেকে এখানে ধর্মরাজের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য দোলার মানত।

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন যে ধর্মপণ্ডিতগণ লোকের অসুখে-বিসুখে, বিশেষতঃ কুষ্ঠরোগ, নানা চর্মরোগ ও স্ত্রীলোকের বন্ধ্যাত্ব রোগে নানা টোটকা ঔষধ দিয়ে থাকেন।[৯] এখানেও বোধক বাড়িতে ঐ সব রোগের টোটকা ঔষধ দেওয়া হয়।

মেদগাছির সিংহরায়েরাই মেলাস্থানের জায়গাটি দান করেন। পূর্বেই বলেছি, সিংহরায়েরাই বোধক বাড়ি থেকে প্রথম ঠাকুর বার করেন। এ থেকে অনুমান করা যায়, এই ঠাকুরের জাঁকজমকের মূলে রয়েছে মেদগাছির সিংহ-রায়দের প্রভাব। ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন যে ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দের সন্ধিকালে অল্প কিছুকাল মানসিংহ বাঙ্গালার সুবেদার ছিলেন। টোডরমল-মানসিংহের সময় হতে, এবং তার বেশ কিছুকাল আগে থেকেই বাঙ্গলা দেশে পশ্চিমা হিন্দু কারবারীর ও শ্রেষ্ঠীর আগমন হচ্ছিল। এঁদের অনেকে এদেশে স্থায়ী হলেন, এবং কেহ কেহ জমিদারবংশের সূচনা করেন। অনেক নামকাটা সিপাহীও সদসৎ উপায়ে বিত্ত সঞ্চয় করে ভূস্বামী হলেন।[১০] এ থেকে বলা যায়, সপ্তদশ শতকেই মেদগাছির সিংহরায় উপাধিযুক্ত রাজপুত পরিবারের জমিদারত্বের সূচনা। এরপরেই বোধক বাড়িতে যে ধর্মরাজ হীনপ্রভ অবস্থায় দিন কাটাচ্ছিলেন, তাঁকেই তাঁরা জাঁকজমকের মধ্যে স্থাপন করেন।

লোকসমাজে ধর্মরাজের প্রভাব বৃদ্ধির কারণ মূলতঃ দুটি।

প্রথমতঃ—ধর্মরাজ কুষ্ঠ, ধবলের মতো কিছু ব্যাধির নিরাময় করেন, এবং

বন্ধ্যা নারীকে সন্তান দেন। দ্বিতীয়তঃ, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন যে চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়—অনাবৃষ্টির চার মাসই তাঁর পূজা হয়।[১১] তবে যেখানে খনা বলেন—'ধন্য রাজার পুণ্য দেশ। যদি বর্ষে মাঘের শেষ॥'—সেখানে মাঘেও বৃষ্টির প্রত্যাশা থাকে কৃষিবলয়ে। আর সেক্ষেত্রে ধর্মরাজের স্মরণ নিতে হয়। কারণ, চতুর্দশ শতকের জিন প্রভসূরির রত্নবাহপুরকল্প থেকে জানা যায় যে ধর্মরাজ বৃষ্টির নিয়ন্ত্রা। তিনি লিখেছেন, "অদ্যাপি পরমসময়িনো ধর্মরাজ ইতি ব্যপদিশ্য কদাচিদবর্ষতি বর্ষাসু জলধরে ক্ষীরঘটাসহস্রৈর্ভগবন্তং স্নপয়ন্তি সম্পদ্যতে চ তৎক্ষণাদ্ বিশিষ্টা মেঘবৃষ্টিঃ। কন্দর্পা শাসনদেবী কিন্নরশ্চ শাসনযক্ষঃ।"[১২] অর্থাৎ আজ পরম সময়ের ধর্মরাজ এইভাবে আদিষ্ট জলধর কদাচিৎ বর্ষাকালে বর্ষণ করে। কন্দর্পগণ শাসনদেবী কিন্নর শাসন যক্ষ একত্র ক্ষীর ঘটের দ্বারা ভগবানকে স্নান করায়। তৎক্ষণাৎ মেঘ বৃষ্টি হয়। আর এই মেঘ বৃষ্টির জন্য, এবং আধি ব্যাধির প্রতিকারের জন্যই বলা যায়, এখানেও ধর্মরাজের প্রভাব লোকমানসে সঞ্চারিত হয়েছিল।

তথ্যপঞ্জী

১। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড : অপরার্ধ), শ্রীসুকুমার সেন, ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, ২য় সং ১৯৬৫, পৃঃ—১৩১

২। তদেব, পৃঃ—১২৭

৩। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, এ. মুখার্জী, ৬ষ্ঠ সং ১৯৭৫, পৃঃ—৬১৭

৪। তদেব, পৃঃ—৬৪০

৫। বঙ্গসংস্কৃতির এক পর্ব (১ম খণ্ড), নৃসিংহপ্রসাদ ভট্টাচার্য, কালনা, ১ম সং ১৯৯৫, পৃঃ—১২৭

৬। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, এ. মুখার্জী, ৬ষ্ঠ সং ১৯৭৫, পৃঃ—৬২১

৭। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড : পূর্বার্ধ), শ্রীসুকুমার সেন, ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, ৪র্থ সং ১৯৬৩, পৃঃ—৩৭৪

৮। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, এ. মুখার্জী, ৬ষ্ঠ সং ১৯৭৫, পৃঃ—৬৫৬

৯। তদেব, পৃঃ—৬২৮

১০। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড: অপরার্ধ), শ্রীসুকুমার সেন, ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, ২য় সং ১৯৬৫ পৃঃ ১-২

১১। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, এ. মুখার্জী, ৬ষ্ঠ সং ১৯৭৫, পৃঃ—৬৩১

১২। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড: অপরার্ধ), শ্রীসুকুমার সেন, ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, ২য় সং ১৯৬৫, পৃঃ ১২৬

জামালপুর

পূর্বস্থলী থানার অন্তর্গত একটি গ্রাম জামালপুর। পাটুলী রেল স্টেশনে নেমে জামালপুরে যেতে হয়। এখানে ধর্মরাজরূপে অধিষ্ঠিত রয়েছেন বুড়োরাজ। ধর্মরাজের প্রকৃত স্বরূপ যা-ই হোক না কেন, কেউ কেউ তাঁকে বুদ্ধ বলে প্রমাণ করেছেন। ধর্মপুজাবিধানে তাঁকে সূর্যও বলা হয়েছে। কেউ বলেছেন বরুণ, কারও কাব্যে ধর্মরাজ ও নারায়ণ অভিন্ন, কোথাও তিনি যমরাজ রূপে কল্পিত, কোথাও বা শিব। আবার 'ফকির' রূপেও ধর্মের আত্মপ্রকাশ। তিনি আবার সোমও। এদিক থেকে সীতারাম দাসের 'জটিল ঠাকুর' নামটি তাঁর ক্ষেত্রে অধিকতর যথার্থ। ধর্মরাজের এই বহুরূপ ধারণের জন্যই হয়তো একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে: নমস্তে বহুরূপায় যমায় ধর্মরাজায়।[১] তাছাড়া, 'অনাদ্যের পুঁথি'তে তাঁকে আদি অনাদি রূপে স্তুতি করেও বলা হয়েছে—

তুমি চন্দ্র তুমি সূর্য্য তুমি দিবাকর।
তুমি হর তুমি হরি তুমি বৃহস্পতি।[২]

সুতরাং বলা যায়, বহুরূপেই ধর্মরাজের আত্মপ্রকাশ। এখানে শিবরূপে। বুড়োরাজের আবির্ভাব প্রসঙ্গে বিনয় ঘোষ বলেছেন যে যদু ঘোষ নামে স্থানীয় একজন গোপ একদা দেখতে পান যে তাঁর শ্যামলী নামে গাই গরুটি জামালপুরের একস্থানে দাঁড়িয়ে আছে, আর তার বাঁট থেকে ঠিক ফোয়ারার মতো দুধ ঝরে পড়ছে। স্থানীয় বিজ্ঞ ব্যক্তি চাটুজ্যে মশায়ের কাছে তিনি যান রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য। চাটুজ্যে মশায় দেখলেন, একটি পাথরের মাথায় দুধ জমা

হচ্ছে। বলা বাহুল্য, পাথরটি অনাদিলিঙ্গ শিব। সেই রাত্রেই চাটুজ্যেমশায় স্বপ্ন দেখলেন, দেবতার পূজার ব্যবস্থা করতে হবে অনাড়ম্বরে। তাই করা হল। পূজা আরম্ভ হল। * * বৈশাখী পূর্ণিমায় বুড়োরাজের পূজা ও গাজন হয়। শিবের পূজা ও গাজন হয় চৈত্র সংক্রান্তিতে। সমস্ত রাঢ় অঞ্চলে সাধারণত বৈশাখী বুদ্ধ পূর্ণিমায় ধর্মরাজের গাজন হয়। তাহলে বুড়োরাজ কি শিব, না ধর্মরাজ? কেউ কেউ বলেন, আদি পুরোহিত চাটুজ্যেমশাই এই ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন অনাদিলিঙ্গ শিব বলে।[৩] কিন্তু এখন দেখতে হবে এই যুক্তি কতটা গ্রহণযোগ্য? এক্ষেত্রে প্রশ্ন থাকে, চাটুজ্যে মশাই যদি অনাদিদেব শিব বলেই মনে করতেন তবে তিনি তো শিবের নামেই পূজা প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন, তাঁর সাথে ধর্মের সংযোগ স্থাপন করছেন কেন? তবে কি ঐ অনাদিদেব শিবের সাথে ধর্মের ঐতিহ্য যুক্ত ছিল?

এক্ষেত্রে শ্রীযজ্ঞেশ্বর চৌধুরীর উক্তি স্মরণ করা যায়। তিনি বলেছেন যে জামালপুর গ্রামনাম হ'তে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, অতীতে এখানে মুসলমান বসতি ছিল, যদিও একালে একঘরও মুসলমান নাই। গ্রামের পূর্বভাগে জঙ্গলের মধ্যে জীর্ণ দশাগ্রস্ত মসজিদের অস্তিত্ব মুসলমান বসতির প্রত্যক্ষ প্রমাণ।[৪] আর তা যদি হয় তবে বলা যায়, স্থানটি ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায় ছিল। সেক্ষেত্রে একমাত্র মুসলমান বসতিই ছিল না, হিন্দু বসতিও ছিল, তার প্রমাণ বুড়োরাজ। অর্থাৎ বুড়োরাজকে ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থা থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল। এই বুড়োরাজের মন্দির ধ্বংস হয়েছিল হয় মুসলিম আধিপত্য কালে, নয় বর্গীর হাঙ্গামার কালে। এই হাঙ্গামার কালে সমুদ্রগড, জান্নগর প্রভৃতির সাথে নিমদহ গ্রামটিকেও বর্গীরা পুড়িয়ে দিয়েছিল।[৫] সেক্ষেত্রে ব্রাহ্মণাদি ছত্রিশ জাতির সাথে সেক সৈয়দ মোগল পাঠানরাও পালিয়ে গিয়েছিল। আর এই পালিয়ে যাওয়ার ইতিহাস হয়তো রয়েছে নিমদহ সংলগ্ন জামালপুরেও। তারপর ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের অভিশাপ। সুতরাং সেইরকম ক্ষেত্রে পরিত্যক্ত এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত স্থান থেকেই অনাদিদেবকে উদ্ধার করা হয়েছিল। আর এই 'অনাদিদেবের' সাথে ধর্মরাজের স্মৃতি জড়িয়ে ছিল, যার স্মৃতি তৎসংলগ্ন জনমানসে জাগরিত ছিল, তাই চাটুজ্যে মশায়ের পক্ষ থেকে ধর্মরাজের ঐতিহ্যকে ত্যাগ করা সম্ভব হয় নি। যদি হতো তবে বুড়োরাজ একমাত্র শিবরূপেই প্রতিষ্ঠা পেতেন।

বুড়োরাজের নামতত্ত্বের প্রসঙ্গে বিনয় ঘোষ বলেছেন যে বুড়োশিবের 'বুড়ো' আর ধর্মরাজের 'রাজা', দু'য়ে মিলিয়ে 'বুড়োরাজ'।[৬] কিন্তু যেখানে তাঁকে 'অনাদ্যের পুঁথি'তে 'আদি অনাদি' বলা হয়েছে, সেখানে শিব যেমন বুড়ো, তেমনি ধর্মও তো বুড়ো, এবং তিনি তো 'রাজ'। সুতরাং এখানে ধর্মরাজই বুড়োরাজরূপে সূচনাকালেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন তা মনে করা যেতে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রে প্রশ্ন থাকে, তাই যদি হবে তবে এখানে তাঁকে শিবের সাথে মিলানো হয়েছে কেন? এক্ষেত্রে বলা যায়, সাহিত্যেও যখন এই বোধ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে ধর্মই শিব, এবং যেখানে ধর্মকে উদ্দেশ্য করে 'অনাদ্যের পুঁথি'তে বলেছেন 'তুমি হর'[৭], সেখানে জামালপুরের ক্ষেত্রেও ধর্ম ও শিব একাকার হয়ে যেতে পারেন। আর এই সত্যই ধরা পড়েছে জামালপুরের পূজার মন্ত্রে। সেখানে বলা হয়েছে—

নিরঞ্জনং নিরাকারং মহাদেব মহেশ্বরম্।
শরণং পাপখণ্ডনং ধর্মরাজ নমোঽস্তুতে ॥

অর্থাৎ এখানে ধর্মকেই শিবরূপে বা শিবকেই ধর্মরূপে প্রণাম জানানো হয়েছে। অবশ্য পূজার মন্ত্রে ধর্ম ও শিব এক হলেও বুড়োরাজকে যে নৈবেদ্য দেওয়া হয় তার মাঝখানে একটা দাগ কাটা থাকে। অর্থাৎ 'বুড়োরাজে'র মূল নৈবেদ্যটি ২ ভাগ করে ১ ভাগ শিবকে ও অপর অংশ ধর্মরাজের উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হয়। আর এর কারণরূপে জগজ্জীবন ঘোষালের 'মনসামঙ্গল' কাব্যের কয়েকটি চরণ উদ্ধার করা যায়। তাতে অনিল ধর্মকে অভিশাপ দিয়ে জগৎ সৃষ্টি করতে আদেশ দিয়ে বলেছেন—

ব্রহ্মা বিষ্ণু সৃজিবা তবে দেব শূলপানি।
অবশেষে সৃজিবা মনসা কন্যাখানি ॥
মনসার রূপ দেখি হবে অচেতন।
বিভা করি মনসাকে দিবে আলিঙ্গন ॥
লাজ পায়া শরীর ছাড়ি ধর্মমতি।
তুমি হবে মৃতক মনসা হবে সতী ॥
মহেশের অঙ্গেতে করিয়া প্রবেশ।
অর্ধেক হইবে ধর্ম অর্ধেক মহেশ ॥[৮]

আর এই তত্ত্ব থেকেই নৈবেদ্যের ভাগাভাগি এসেছে।

এখানে 'বুড়োরাজে'র আবিষ্কারের সাথে প্রথম যে নাম জড়িত ছিল, তিনি যদু, এবং যেহেতু যদুর বাড়ি ছিল পার্শ্ববর্তী নিমদহ গ্রামে, সেইহেতু সর্বাগ্রে নিমদহের পূজা হয়। বৈশাখী পূর্ণিমা এঁর গাজন অনুষ্ঠিত হয়। বৈশাখী ও মাঘী পূর্ণিমায় বিশেষ উৎসব উপলক্ষে বৃহৎ মেলা বসে। তাছাড়া, মানতকারীরা বারমাসে বারটি শুক্লপক্ষের সোমবার পালন করে থাকেন। যক্ষা, মৃগী, বাত, অম্লশূল প্রভৃতি থেকে মুক্তি, এবং সন্তান কামনায় মানত করা হয়। এঁর গাজনে সন্ন্যাসী হওয়া, দণ্ডখাটা উৎসবের অঙ্গ স্বরূপ। এখানে যেমন হাজার হাজার পাঁঠা বলি হয়, তেমনি হাড়ি ও ডোম জাতির লোকদের শূয়োর বলিও হয়।

পাঁঠা নিয়ে কাড়াকাড়ি ও লাঠালাঠি হয়, তা বিরল দৃষ্টান্ত।

বুড়োরাজ এখানে ইঁট পাথরের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত নন। তিনি বাঁকানো চালের মাটির বড় ঘরে প্রতিষ্ঠিত।

এখানে বুড়োরাজের উৎপত্তির প্রসঙ্গে যে কিংবদন্তী দেখা যায়, সেই রকম কিংবদন্তী তারকেশ্বরের তারকনাথের মতো পশ্চিমবঙ্গের অনেক দেবতার ক্ষেত্রেই দেখা যায়। এখানে বুড়োরাজকে আবিষ্কার করে তাঁর প্রতিষ্ঠা করে তাঁর পূজা পদ্ধতির নবরূপায়ণ করা হয়।

তথ্যপঞ্জী

১। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, এ. মুখার্জী, ষষ্ঠ সং ১৯৭৫, পৃঃ—৬২৩
২। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (৩য় খণ্ড: ১ম পর্ব, সপ্তদশ শতক), ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক, ২য় সং ১৯৮০, পৃঃ—২৫৫
৩। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (১ম), বিনয় ঘোষ প্রকাশ ভবন, ৩য় মুদ্রণ ১৯৮৯, পৃঃ—১৪৩
৪। বর্ধমান: ইতিহাস ও সংস্কৃতি (৩য়), শ্রীযজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, পুস্তক বিপণি, ১ম প্রকাশ ১৯৯৪, পৃঃ—১৫৯
৫। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, ডঃ অলোক কুমার চক্রবর্তী, প্রগ্রেসিভ বুক ফোরাম, ১ম প্রকাশ ১৯৯৮, পৃঃ—২২৭

৬। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (১ম), বিনয় ঘোষ, প্রকাশ ভবন, ৩য় মুদ্রণ, পৃঃ—১৪৩

৭। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (৩য় খণ্ড : ১ম পর্ব, সপ্তদশ শতক), ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক, ২য় সং ১৯৮০, পৃঃ—২৫৫

৮। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, এ. মুখার্জী, ষষ্ঠ সং ১৯৭৫, পৃঃ—৩৭২

আশুরী

মন্তেশ্বর থানার অন্তর্গত বাঁকা নদীর সন্নিহিত একটি গ্রাম। এটি মঙ্গলপুরের পাশের গ্রাম। এই গ্রামে বর্গক্ষত্রীয়দের পাড়ায় রয়েছে ধর্মঠাকুরের থান। জুঝাটির মতোই একটি খেঁজুরতলায় এই থান, তবে মূর্তি নেই। ফাল্গুনী অমাবস্যায় দিদিঠাকরুণের বার্ষিক পূজার দিনই খেঁজুর গাছের তলায় নামে মাত্র ধর্মরাজের পূজা দেওয়া হয়। পাশেই রয়েছে ধর্মগোড়ে নামক একটি ডোবা। এ থেকে মনে হয় অতীতে ধর্মঠাকুরের শিলাখণ্ড (মূর্তি) ছিল। বার্ষিক পূজায় তাঁকে ঐ পুকুরে স্নান করানো হতো। আর ঐ ধর্মঠাকুরের শাসনদেবী তথা কামিন্যা হলেন দিদিঠাকরুণ।

মনসা বীরভূমে দিদিঠাকরুণ রূপে পূজিতা হন। আবার বর্ধমান জেলার ভাটাকুলে চণ্ডীরূপে পূজিতা। এখানে কিন্তু যতদূর সম্ভব তিনি কালীরূপে পূজিতা। এঁর পূজা মাটির বেদীতে ঘটে। ইনি কলা খান না। শসা, শাঁকালু ইত্যাদি এঁর নৈবেদ্য।

বর্গক্ষত্রীয়দের পাড়াতেই রয়েছে গরো ঠাকুর, একটি আঁকর গাছের তলায়। আসলে ইনি গ্রহ (>গরহ>গরো) ঠাকুর।

এই গ্রামেরই বারোয়ারী তলার কাছে ঘোষেদের দোকানের সামনে একটি হাতখানেক লৌহদণ্ড (বর্তমানে অস্তিত্বহীন) একদা রামেশ্বররূপে পূজিত হতেন অন্নপ্রাশন, বিবাহ ও ষষ্ঠী পূজাতে।

মাহিষ্যপাড়ায় রয়েছেন মহাদেব। টিনের ছাউনিযুক্ত মাটির ঘরে রয়েছেন। নারায়ণ শিলার মতো ছোট্ট গোলাকার প্রস্তরখণ্ড। স্বপ্নাদেশে এঁকে বাঁকা

থেকে উদ্ধার করা হয়। চৈত্র সংক্রান্তিতে এঁর গাজন হয়। এই গাজনে ঢাক বাজাতে আসে কোয়ারা-জামনার বায়েনরা, যা পুরুষানুক্রমিক, এবং সেক্ষেত্রে টয়ে বাঁধা ঢাক আবশ্যিক।

এই গ্রামটির বিশেষ এক প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব রয়েছে। আর সেই প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন রয়েছে গড়াই পুকুরের গর্ভে। সেই গর্ভে রয়েছে পোড়া মাটির পাটযুক্ত তিনটি কূয়া। এদের একটিতে রয়েছে মাটির বাসনপত্র, আর একটিতে রয়েছে হাড়।

কাদপুর

কালনা থানার একটি গ্রাম। বাঁকা নদী সন্নিহিত। এখানে এক বর্গ-ক্ষত্রীয়ের বাড়িতে রয়েছেন ধর্মরাজ। ধর্মরাজ ছাড়া রয়েছে ৫/৭টি ছোট ছোট পাথর। ঐগুলি আবরণ দেবতা। এঁর বার্ষিক পূজা মাঘী প্রতিপদে।

বিষহরিডাঙ্গা

বিষহরিডাঙ্গা হলো কালনা থানার অন্তর্গত একটি গ্রাম। এখানে সদগোপ পাড়ায় রয়েছেন এক ধর্মরাজ। মাঘী দ্বিতীয়ায় এঁর পূজা। একটি অপেক্ষাকৃত বড় নুড়ি পাথর ধর্মরাজরূপে পূজিত হন। এঁর সাথে আবরণ দেবতারূপে রয়েছে কিছু প্রস্তরখণ্ড।

শুশুনি

মন্তেশ্বর থানার অন্তর্গত শুশুনিগ্রাম। এটি মালডাঙ্গা থেকে দু'কিলো-মিটার দক্ষিণে। এই গ্রামে রয়েছেন দেবী তারা বা তারাক্ষা। আর তাঁর অবস্থানের জন্য গ্রামটি তারাক্ষা, তারিক্ষি বা তারিক্ষেতলা নামে পরিচিত। জনশ্রুতি—কালাপাহাড়ের ভয়ে মূর্তিটিকে জলে ডুবিয়ে রাখা হয়, এবং কালক্রমে দেবী বিস্মৃতির অন্তরালে চলে যান। তারপর মূর্তিটি গ্রামস্থ একটি পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধারের সময় আবিষ্কৃত হয়।

মূর্তিটির বিবরণ : মূর্তিটি কষ্টিপাথরের পাটার উপর 'বা-রিলিফ' পদ্ধতিতে খোদিত ভাস্কর্য। এই ত্রিনয়নী ও চতুর্ভুজা দেবী মহাপদ্মের পাপড়ির উপর

উপবিষ্টা। দক্ষিণ চরণ ঈষৎ মুড়ে সিংহপৃষ্ঠের উপর ন্যস্ত, এবং বাম চরণটি প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর স্থাপিত। দেবীর কটিদেশ রক্তবস্ত্রে আচ্ছাদিত হলেও উর্দ্ধাংশ উন্মুক্ত। তাঁর দুই পার্শ্বে জয়া ও বিজয়া দণ্ডায়মান অবস্থায়। প্রায় ৭ ফুট উচ্চতার পাটাতনটির চালচিত্রে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মূর্তি ক্ষোদিত আছে। দেবী বামভাগে ঊর্দ্ধবাহু দ্বারা মহাদেবকে বেষ্টন করে স্বীয় অঙ্কে স্থাপনপূর্বক স্তন পান করাচ্ছেন, এবং নিম্নের হস্তটি ঈষৎ উর্ধ্বে উত্থিত। দক্ষিণ ভাগের ঊর্ধ্ব বাহুটি নিম্নে প্রসারিত, এবং গদা ধারণপূর্বক নিম্ন বাহুটি ঈষৎ উর্ধ্বে উত্থিত। এখানে এই যে 'দেবী বামভাগে ঊর্ধ্ববাহু দ্বারা মহাদেবকে বেষ্টন করে স্বীয় অঙ্কে স্থাপনপূর্বক স্তন পান করাচ্ছেন'—দেবীর এই মূর্তিই রয়েছে তারাপীঠের তারা-মায়ের দৃশ্যমান মূর্তিটির (খোলসমূর্তির) অভ্যন্তরে, যা দেবীর আসল মূর্তি। অবশ্য ডঃ অতুল সুর বলেছেন—"অনেকেরই বোধ হয় জানা নেই যে, তারাপীঠে গিয়ে তাঁরা তারা-মায়ের যে মূর্তি দেখেন সেটা মায়ের আসল মূর্তি নয়। আসল মূর্তিটি পাথরের তৈরী। ** পাথরের মূর্তিটি মুণ্ডহীন। মুসলমান আমলে হিন্দুদ্বেষী মুসলমানরা মুণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছিল। দেবী একটি শায়িত মূর্তির উপর উপবিষ্টা।"[১] কিন্তু নিগূঢ়ানন্দ ঐ মূর্তিরই বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে ভেতরে আছে অন্য মূর্তি। সমুদ্র মন্থনজাত গরল পান করে শিব যখন উন্মত্ত তখন তাঁকে স্নিগ্ধ করার জন্য পার্বতী নাকি করিয়েছিলেন স্তনপান। সেই স্তনদান রত পার্বতীর মূর্তি আছে ভেতরে।[২] আর তা যদি হয় তবে দেখা যায়, উভয়ক্ষেত্রেই একই মূর্তি, এবং উভয়ক্ষেত্রে দেবী তারা নামে পরিচিতা।

তারার উপাসনা প্রসঙ্গে ডঃ অতুল সুর বলেছেন যে তারার উপাসনা মহাচীন থেকে আনা হয়েছিল বলে বৌদ্ধ বজ্রযান দেবীকুলে তাঁর নাম দেওয়া হয়েছিল মহাচীন তারা। উগ্রতারা নামেও তাঁকে অভিহিত করা হতো।[৩] অন্যদিকে, বিনয় ঘোষ বলেছেন যে বৌদ্ধদের 'একজটা' নামে এক দেবী আছেন, তিনি উগ্রতারা, মহাচীন তারা নামেও খ্যাতা। তিনি বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবী, এবং বৌদ্ধতন্ত্র থেকে তারা হিন্দুতন্ত্রের আরাধ্য দেবী হয়েছেন।[৪] এখন দেখা যেতে পারে এই মত কতটা গ্রহণযোগ্য? এক্ষেত্রে বলা যায়, তারাপীঠের দেবীকে যখন গভীর জঙ্গলের মধ্য থেকে ভগ্ন অবস্থায় আবিষ্কার করা হয়, তখন তিনি অবশ্যই বিস্মৃতির অন্তরালে ছিলেন। সেক্ষেত্রে 'বশিষ্ঠ মুনি যে দেবীর

নয়নতারা চীনদেশ থেকে এনে তারাপীঠে স্থাপন করেন'—এমন কাহিনী আরোপিত কাহিনী ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং এরকম ক্ষেত্রে বশিষ্ঠের কাহিনীর সূত্র ধরে তারাপীঠের তারা উপাসনা যে মহাচীন থেকে এসেছিল তা বলা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, বৌদ্ধ সাধনমালায় এবং তন্ত্রসারে মহাচীন তারার ধ্যান রয়েছে। সেই ধ্যানে মহাচীন তারার যে রূপকল্পনা রয়েছে, তার সাথে তারাপীঠের আসল মূর্তির এবং শুশুনির মূর্তির কোন মিল নেই। তাছাড়া ঐ দুই মূর্তির মধ্যে 'উগ্রতারা'র উগ্রতা নেই। তৃতীয়তঃ, বংশীদাস তাঁর মনসা-মঙ্গলে বলেছেন—

চক্ষুগুলা খসিয়া যে পড়িল সেখানে,
উগ্রতারা নাম তীর্থ বিখ্যাত ভুবনে।

অন্যদিকে, শিবচরিতের মতেও তারাপীঠ হয়ে দাঁড়াল একান্ন পীঠের একটি পীঠ। কিন্তু হেবজ্রতন্ত্রের চতুষ্পীঠ, কালিকাপুরাণের চতুষ্পীঠ ও সপ্তপীঠ, রুদ্রযামলের প্রধান দশপীঠ, কুলার্ণবতন্ত্রের অষ্টাদশ পীঠ, জ্ঞানার্ণবতন্ত্রের অষ্টপীঠ ও পঞ্চাশৎপীঠ, শঙ্করাচার্যের অষ্টাদশপীঠ, প্রাণতোষণীতন্ত্র ও বাচস্পত্যপীঠ, শাক্তানন্দ তরঙ্গিণীর পঞ্চাশৎ পীঠ—এদের কোথাও তারাপীঠের নাম নেই। তাছাড়া পীঠ নির্ণয়, তন্ত্রচূড়ামণি, দেবী ভাগবত ও কুব্জিকাতন্ত্রের সপ্তম পটলেও তারাপীঠের নাম নেই। চতুষ্পীঠ, সপ্তপীঠ বা অষ্টাদশ পীঠের কালেও তারার নাম নেই কোথাও। সুতরাং এ থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে সতীর অঙ্গ-পতনের কাহিনীও এখানে আরোপিত। সেক্ষেত্রে সতীর চোখের তারার পতন থেকে দেবীর নামও তারা হয় নি।[৫] আমরা জানি, তারণ শব্দটির ব্যুৎপত্তি হলো √তৃ+ণিচ্+অন (র্তৃ. ভা), আর তারা শব্দেরও ব্যুৎপত্তি—√তৃ+ণিচ্+তা (র্তৃ)+আ।[৬] সুতরাং বলা যায়, তারার পতন থেকে দেবীর নাম তারা হয় নি। তারা এসেছে 'তারণ' শব্দ থেকে। অর্থাৎ গরল প্রদাহে শিবকে যন্ত্রণা থেকে তারণ করেছিলেন, তাই তাঁর নাম তারা বা তারিণী। শিবচরিতেও বলা হয়েছে দেবীর নাম তারিণী।

এখানে দুই স্থানেরই মূর্তি কল্পনা বিশ্লেষণ করে বলা যায়, ঐ মূর্তি কল্পনা পৌরাণিক কাহিনীকে অনুসরণ করেছে। আর এই অনুসরণ হিন্দু তন্ত্রাশ্রিত অন্যান্য মূর্তিকল্পনার ক্ষেত্রেও সত্য। সুতরাং উভয়স্থানেরই তারার উদ্ভবের ইতিহাসকে চীনাচারের সাথে যুক্ত না করে হিন্দু তন্ত্রাচারের সাথে যুক্ত করাই

যুক্তিযুক্ত। আর এই যুক্তিকে আরও যুক্তিনিষ্ঠ করে তোলে সেখানেই যেখানে তারাপীঠের তারার প্রতিষ্ঠা মহাশ্মশানের উপর। তাছাড়া, পার্বতীর কোলে বসে শিবের স্তন্যপান—এমন ধ্যানকল্পনা তন্ত্রোক্ত শক্তি উপাসনার ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এখন প্রশ্ন থাকে, শুশুনির দেবী যদি তারিক্ষি, তারাক্ষ্যা বা তারিক্ষ্যে হয়, যা হয়তো এসেছে 'তারা অক্ষি' থেকে, এবং যখন লোকবিশ্বাস এই যে দেবীর স্নানজল চক্ষুতে লেপন করলে চক্ষুরোগের নিরাময় হয়, তখন কি বলা যেতে পারে না যে সতীর চোখের তারা থেকেই দেবীর নাম তারা হয়েছে ? এক্ষেত্রে বলা যায়, যদি তাই হবে, তবে তো সতীর চোখের তারা পড়ার জন্য যা পীঠ নামে খ্যাত, সেই তারাপীঠ তো একমাত্র চক্ষু নিরাময়ের কেন্দ্র রূপে প্রতিষ্ঠিত হতো। কিন্তু তা তো নয়। তিনি মানবকুলের সমস্ত সঙ্কট থেকে তারণ করেন, এই অর্থেই তাঁর মহিমা প্রতিষ্ঠিত। এখানে অর্থাৎ শুশুনিতে অবশ্য চোখের তারাকে রক্ষা করেন বলে দেবীর নাম তারাক্ষ্যা (তারা রক্ষা=বর্ণলোপের সূত্রে তারাক্ষা>তারিক্ষে বা তারিক্ষা) আসতে পারে, এবং সেক্ষেত্রেও তিনি বিপদ থেকে তারণ করেন অর্থেই তারা।

এক্ষেত্রে আরও একটি প্রশ্ন থাকে—তিনি যদি উগ্রতারা না হবেন, তবে তাঁর উদ্দেশ্যে মহিষ বলি হয় কেন ? এর উত্তরে বলা যায়, পুরাণকে অনুসরণ করে শিবকে দেবীর স্তনদানের ভাবকল্পনাকে শিল্পায়িত করা হয়েছিল, এবং তন্ত্রের ক্ষেত্রে দেবীকে গ্রহণ করা হয়েছিল। সেক্ষেত্রে পশু বলিদান, তন্ত্রোক্ত শক্তি উপাসনার একটি প্রধান অঙ্গ। কালিকা পুরাণে পক্ষী থেকে মনুষ্য—এমন কিছু বাদ নেই যা চণ্ডিকাভৈরবাদির বলি নয় বলে উল্লেখিত না হয়েছে।[৭] এর মধ্যে তান্ত্রিক সাধকগণ বলিরূপে মৎস্য, মহিষ, ছাগ এবং মনুষ্যকে নির্বাচিত করেছিলেন। বর্তমান সময়ে 'নরবলি' অবলুপ্ত হলেও কোথাও কোথাও 'মহিষ বলি' এখনও চালু রয়েছে। এই সব বলির উদ্দেশ্য কালিকাপুরাণে উক্ত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে 'বলিভিঃ সাধ্যতে মুক্তির্বলিভিঃ সাধ্যতে দিবম্॥' অর্থাৎ বলিদ্বারা মুক্তি-সাধন হয়, এবং বলি দ্বারা স্বর্গ-সাধন হয়।

শুশুনিতে দেবী বিস্মৃতির অন্তরালে চলে গেলেও গ্রামের মধ্যে 'তারা' নামে স্মৃতি, এবং 'মহিষ বলি'র স্মৃতির রেশ থেকে যেতে পারে, বা দেবীকে আবিষ্কার করার পর কালিকাপুরাণের অনুসরণে পূজাপদ্ধতির প্রচলন ও দেবীর মহিমা প্রচারের জন্য 'মহিষবলি'র সূত্রপাত করা হতে পারে।

এখানকার দেবী বার মাস থাকেন একটি দালানরীতির ঘরে। এখানে জ্যৈষ্ঠ মাসে শুক্লাচতুর্দশী তিথিতে বাৎসরিক পূজা উপলক্ষে মেলা ও উৎসব পালিত হয়। ঐ দিন গ্রামের বহির্ভাগে একটি পুকুরের পাড়ে যে বৃহৎ আটচালা রীতির মন্দির রয়েছে, সেখানে দেবীকে নিয়ে যাওয়া হয়, এবং তাঁর সম্মুখে মহিষ বলি দেওয়া হয়।

তারাক্ষ্যা মন্দিরের মধ্যে পদ্মাসনে উপবিষ্টা চতুর্ভুজা ত্রিনয়নী অন্য একটি প্রস্তর নির্মিত দেবী মূর্তি রয়েছেন। দেবীর দুপাশে দুটি হস্তী শুঁড় দিয়ে তাঁকে জলসিঞ্চন করছে। এই মূর্তি কমলেকামিনী গজলক্ষ্মীর।

তথ্যপঞ্জী

১। বাঙলা ও বাঙালী, ডঃ অতুল সুর, সাহিত্যলোক, ১ম মুদ্রণ ১৩৮৭, পৃঃ—৪৩

২। সতীক্ষেত্র ছাব্বিশ উপপীঠের সন্ধানে, নিগূঢ়ানন্দ, শরৎ পাবলিশিং হাউস, ১ম প্রকাশ ১৩৮৬, পৃঃ ৩১-৩২

৩। বাঙালা ও বাঙালী, ডঃ অতুল সুর, সাহিত্যলোক, ১ম মুদ্রণ ১৩৮৭, পৃঃ—৪৩

৪। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (১ম), বিনয় ঘোষ, প্রকাশ ভবন ৩য় মুদ্রণ ১৩৯৫, পৃঃ—২৯৫

৫। সতীক্ষেত্র ছাব্বিশ উপপীঠের সন্ধানে, নিগূঢ়ানন্দ, শরৎ পাবলিশিং হাউস, ১ম প্রকাশ ১৩৮৬, পৃঃ—২৮

৬। সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান, সঙ্ক : শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, সাহিত্য সং, পুনর্মুদ্রণ ১৯৭৫, পৃঃ—৩৭৮

৭। ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায় (২য় ভাগ), ৺অক্ষয়কুমার দত্ত, সম্পাঃ বারিদবরণ ঘোষ, করুণা প্রকাশনী, ১ম করুণা সং ১৩৯৭, পৃঃ—১১১

গোপালদাসপুর

কালনা থানার কালনা ২ নং ব্লকের অন্তর্গত একটি গ্রাম গোপালদাসপুর। বৈদ্যপুর থেকে ৫ কিলোমিটার দক্ষিণে। এখানে রয়েছে রাখালরাজ ঠাকুর। আমরা জানি, চৈতন্যোত্তর বাংলায় বৈষ্ণব সাধকেরা শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ

বিশেষ লীলাকে আশ্রয় করে সাধনা করে গেছেন। সেক্ষেত্রে কৃষ্ণের একটি লীলা—গোষ্ঠলীলা। এই লীলারূপের প্রেরণাতেই জন্ম নিয়েছে রাখালরাজ বা রাখালঠাকুর। এই রাখালঠাকুর দঃ-২৪পরগণার ডায়মণ্ডহারবার, কানপুর, রাজপুর, শোভানগর, পুরন্দরপুর, হাউড়ীহাট—জগদীশপুর, পূর্বচাঁদপুর, নিকারীঘাটা প্রভৃতি গ্রামে রাখালঠাকুরের থানের সন্ধান পেয়েছেন।[১] তবে বর্ধমানে রাখালঠাকুর তথা রাখালরাজার ব্যাপক প্রসার নেই। কালনা মহকুমায় একাধিক আছে কিনা সন্দেহ। তবে সেই একটিই হচ্ছে গোপালদাস-পুরের রাখালরাজ। অবশ্য দঃ-২৪পরগণায় শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা যে অর্থে লৌকিক, এখানে রাখালরাজ সেই অর্থে লৌকিক নয়। বিশেষ পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, মন্দিরটি একটি ধ্বংসাবশেষের উপর প্রতিষ্ঠিত। এক সাক্ষাৎকারে সেবাইত শ্রীঅজিতকুমার গোস্বামী বলেন যে বর্তমান মন্দিরটি পঞ্চম মন্দির। বয়স আনুমানিক দুশো বছর। কিন্তু এটি যে পঞ্চম মন্দির, তার কোন নথিপত্র নেই। অজিতবাবু বলেন যে তাঁর শোনা কথা মাত্র।

যাই হোক, মন্দিরটি দক্ষিণমুখী জোড়বাংলা রীতির। এই রীতির নিদর্শন বাঁকুড়ায় দু একটির বেশী না থাকলেও এর উদ্ভব হয়তো বাঁকুড়াতেই। বাঁকুড়ায় বিষ্ণুপুরের কেষ্টরায়ের জোড়বাংলা মন্দিরটি স্থাপিত হয় ১৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দে। অদূরে মহাপ্রভুর জোড়-বাংলা মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত ১৭৩৪ ৩৫ খ্রীষ্টাব্দে। মন্দির শিল্পের এই রীতিটিকে কালনা মহকুমায় প্রথম নিয়ে আসেন বর্ধমানের রাজা চিত্রসেন রায় কালনার সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের নির্মাণের ক্ষেত্রে ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে। সুতরাং রাখালরাজের জোড়বাংলা মন্দিরটি এর পরেই নির্মিত হয়েছিল বলা যেতে পারে। মন্দিরটি কালনার সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের চেয়ে উচ্চ, এবং আয়তনে বড়। তবে সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরটি যতটা উচ্চ ভিত্তিবেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত, এর ভিত্তি-বেদীর উচ্চতা তার অর্ধেকেরও কম।

এই মন্দিরের চারদিকে রয়েছে পাতলা ইঁটের ধ্বংসাবশেষ। এই ধ্বংসাবশেষের উপর রয়েছে গিরিগোবর্দ্ধনের মন্দির। এটি দেবীপুরের শ্রীব্রজগোপাল পাণ্ডা মহাশয় নির্মাণ করে দেন বাং ১৩৮৩ সালে। অন্যদিকে, অদূরেই রয়েছে ঠাকুরহীন রত্নেশ্বর শিবের ছোট্ট মন্দির। আর এসব তথ্য থেকে বলা যায়, স্থানটি এক সময় পরিত্যক্ত হয়েছিল, এবং দীর্ঘকাল পরিত্যক্ত থাকার ফলে এক সময় পুরাতন স্থাপত্য জীর্ণ এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। আর তা হতে পারে

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সূত্রে। জনশ্রুতিতে বলা হয়েছে —এখানে বৃহৎ এক বন ছিল। বনে বাঘ ছিল।—এখানে এই যে জনশ্রুতি এ থেকে মনে হয়, পরিত্যক্ত মন্দিরটিকে ক্রমশঃ অরণ্য গ্রাস করে নিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে জীর্ণ অবস্থাকে নবরূপায়িত করা হয়।

এই মন্দিরের নাটমন্দিরটি পরবর্তী সময়ের সংযোজন। দোল মন্দিরটিও তাই। মন্দিরটি প্রায় ২০ ফুট উচ্চ চারটি খোলা দরজাযুক্ত। এটি উড়িষ্যারীতির রেখ মন্দির।

মূল মন্দিরে রয়েছেন গোপীনাথ জীউ, রাখালরাজ জীউ, এবং দুটি গাভী। সবই নিম কাঠের তৈরী। এই মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন রামকানু গোস্বামী। শ্রীঅজিতকুমার গোস্বামী বলেন যে রামকানু গোস্বামী কাটোয়ার নিকটবর্তী খাটুন্তি (খোট্টে) গ্রাম থেকে এসেছিলেন।

রামকানুর মূর্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও স্বপ্নতত্ত্ব রয়েছে। সেক্ষেত্রে স্বপ্নতত্ত্বাশ্রিত জনশ্রুতিটি হলো—রামকানু বৃন্দাবনে যাচ্ছিলেন। ঠাকুর স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেন যে তোকে আর যেতে হবে না। আমিই এখানে আসছি। ঠাকুর বলেন যে বাঘনাপাড়া থেকে একটা ছেলে আসবে। গ্রামের শেষে যে ছোট্ট ডোবাটি আছে (রাখালরাজতলার যমুনা দীঘি) তাতে একটি নিমকাঠ ভাসবে। ছেলেটি যা যা বলবে সেইমতো কাজ করবি।

বাঘনাপাড়ার ছেলেটি (বলরাম) ৭ দিন পরে এসে মূর্তি তৈরী করে দিয়েছিল।—এই জনশ্রুতির সাক্ষ্যে বলা যায়, রাখালরাজের মূর্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বাঘনাপাড়ার একটা যোগ রয়েছে, এবং এই মূর্তি প্রতিষ্ঠা হয়েছে বাঘনাপাড়ার জাঁকজমক পর্বের পরেই।

এই মন্দিরের বার্ষিক উৎসব চৈত্রের রামনবমীতে। এখানে জন্মাষ্টমী, দোল ও গিরিগোবর্দ্ধনের পূজা হয়। কার্তিক মাসে গোবর্দ্ধন পূজার সময় গোপীনাথ যান গোবর্দ্ধন মন্দিরে। দোলের সময় দুই মূর্তিই ওঠেন দোল-মন্দিরে। বহু ভক্তের সমাবেশ হয়। ভক্তেরা অন্নপ্রসাদ পান।

বেদী বাঁধানো তমালবৃক্ষ রয়েছে। বৈঁচিগ্রামের উমাশশী সিংহের অর্থানুকূল্যে নাটমন্দির এবং মন্দিরাদি সংস্কার করেন।

রাত্রিবেলায় রাখালরাজতলায় থাকা নিষিদ্ধ।

তথ্যপঞ্জী

১। ওভারল্যাণ্ড, ২৯শে আগষ্ট ১৯৯৩, পৃঃ—১৩

পিয়ারীনগর

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের শাখাবর্ণনে বলা হয়েছে 'আম্বুয়া মূলুকে হয় নকুল ব্রহ্মচারী।' অর্থাৎ আম্বুয়া মূলুকে নকুল ব্রহ্মচারীর পাট। এই পাটের অবস্থান তৎকালীন আম্বুয়া মূলুকের অন্তর্গত প্যারীগঞ্জ, যা বর্তমানে ধাত্রীগ্রাম সংলগ্ন পিয়ারীনগর।

চৈতন্যচরিতামৃতের মতে নকুল ব্রহ্মচারী ছিলেন শ্রীচৈতন্যের পার্ষদ, এবং পরম বৈষ্ণব। তিনি নৃসিংহের উপাসক ছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত থেকে জানা যায়, তাঁর দেহে শ্রীচৈতন্যের আবেশ হয়েছিল। আর তা প্রমাণের জন্য এসেছিলেন কাঁচড়াপাড়া পাটের শিবানন্দ সেন। তিনি নকুল ব্রহ্মচারীর পাটের অনতিদূরে বসে তাঁর দেহে যে মহাপ্রভুর আবেশ হয়, তার প্রমাণ পেয়েছিলেন।

শ্রীহরিদাস দাস বলেন "শ্রীব্রহ্মচারীর সেবিত শ্রীশ্রীগোপাল জীউ আছেন। ইঁহার শিষ্যধারায় সন্তোষ দাস বাবাজী শ্রীনিতাইগৌর-বিগ্রহ স্থাপন করেন। বাবাজীর সমাধি আছে।"[১] অন্যদিকে, 'শ্রীশ্রীমনোহর দাস বৈরাগীর জীবন চরিত্র' থেকে জানা যায় যে বীরচন্দ্রের শিষ্যমণ্ডলীর শ্রীশান্ত দাস বৈরাগী এই পাটের সেবাধিকার পেয়েছিলেন। তিনি শত বৎসর জীবিত ছিলেন। পাটে তার সমাধি রয়েছে।[২]

মন্দিরটি উচ্চ দাওয়াযুক্ত এক কুঠরীবিশিষ্ট দালানরীতির মন্দির। এখানে রয়েছে কৃষ্ণসহ প্যারীজীর মূর্তি। এই প্যারীজীর নামানুসারে এবং স্থানটিতে গঞ্জ অর্থাৎ বাজার থাকার জন্য যতদূর সম্ভব স্থানটির নাম প্যারীগঞ্জ। কালক্রমে প্যারীগঞ্জ নামটি হয় পিয়ারী (<প্যারী) নগর।

প্যারীজীর মূর্তি ছাড়া মন্দিরে রয়েছে বালগোপাল ও গৌরনিতাই-এর মূর্তি। এ সব দেবতার সেবা কার্যাদির জন্য বর্ধমানের রাজারা কিছু সম্পত্তি দান করেন।

১৩৫৬ সালে এই পাটের সেবাকার্যে নিযুক্ত ছিলেন ৯৬ বৎসর বয়স্ক কাটোয়া নিবাসী শ্রীবৈষ্ণবচরণ দাস মহান্ত, যাঁর পূর্বাশ্রমের নাম শ্রীরাধিকাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তাঁর অধুনালুপ্ত 'শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণোপসনা' বা 'বৈষ্ণব সিদ্ধান্তরত্ন'

নামক গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি থেকে জানা যায়, তিনি ছিলেন অদ্বৈত শাখার। তাঁর গুরু ছিলেন গোবিন্দ দাস মহান্ত। সিদ্ধ সাধনায় তাঁর নাম ছিল বিদ্যুন্মঞ্জরী।

এই পাটের সেবাকার্যাদি কখনোই বংশানুক্রমিক হয়ে ওঠে নি। তা বৈষ্ণব আচারগ্রন্থ 'হরিভক্তিবিলাসে'র অনুসরণেই অনুষ্ঠিত হয়।

তথ্যপঞ্জী

১। শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধান (২য়, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড), সঙ্কঃ—শ্রীহরিদাস দাস, ২য় সং, ৫০১ শ্রীচৈতন্যাব্দ, নবদ্বীপ, পৃঃ—১৯১২
২। শ্রীশ্রীমনোহর দাস বৈরাগীর জীবন চরিত্র, কৃষ্ণধন চট্টরাজ, নবদ্বীপ, ১ম সং ১৩৫৬, পৃঃ—৮

সিঙ্গারকোন

কালনা-বৈঁচি রাস্তার উপর কালনা থানার কালনা ২য় নং ব্লকের অন্তর্গত একটি গ্রাম সিঙ্গারকোন। এখানে রয়েছে শ্রীমোহনানন্দ আচার্যের শ্রীপাট। ইনি শ্রীঅদ্বৈতশিষ্য শ্রীশ্যামদাস আচার্যের শিষ্য ছিলেন। তিনি এখানে শ্রীশ্রী৺ রাধাকান্ত জীউর সেবা প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীশ্রীহরিদাস দাসের শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধানে বিগ্রহের নাম 'শ্রীশ্রীরাধাবল্লভজী' বলা হলেও ঠাকুর বাড়ির প্রস্তরফলকে বিগ্রহের নাম 'শ্রীশ্রী৺রাধাকান্ত জীউ' বলা হয়েছে।

রাধাকান্ত হলেন কষ্টিপাথরের ত্রিভঙ্গ মূর্তি। সওয়া ১ ফুটের মতো উচ্চতা। মন্দিরটি জোড় বাংলা রীতির। এর গঠন ২০´×২৪´, এবং উচ্চতা ২০ ফুট। দক্ষিণ দিকে ১টি, এবং পশ্চিমদিকে ১টি দরজা।

মূল মন্দিরের সামনে নাট মন্দির। আর সদর দরজার উপর দালানরীতির নহবতখানা।

সদর দরজার সম্মুখে ৪´ উচ্চভিত্তিবেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত দালানরীতির দোলমঞ্চ। বাইরে বারান্দায় খিলানযুক্ত তিনটি করে খোলা দরজা রয়েছে।

এর গর্ভগৃহের চারদিকে চারটি খোলা দরজা রয়েছে। নীচে থেকে একটা সিঁড়ি উঠে গেছে গর্ভগৃহে।

সদর দরজার মুখোমুখী রয়েছে আটচালা রীতির একটি শিবমন্দির। কিছু টেরাকোটার কাজ রয়েছে। এর দৈর্ঘ্য প্রস্থ ৫´×৫´, এবং উচ্চতা প্রায় ১৫´ ফুট। মাঘ মাসের অমাবস্যা তিথিতে মোহনানন্দের তিরোভাব উপলক্ষে তমালতলায় মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তাছাড়া, রাধাবিহীন রাধাকান্তকে দোলমঞ্চে আনা হয়। মেলা বসে। সাড়ম্বরে বারুদ পোড়ান হয়।

গ্রামটির পথপ্রান্তে টেরাকোটাসমৃদ্ধ পরিত্যক্ত ধ্বংসোন্মুখ পঞ্চরত্ন মন্দির দেখা যায়। এছাড়া, চক্রবর্তী বংশের প্রতিষ্ঠিত বুড়ীমা (লক্ষ্মী, সরস্বতী সহ দুর্গা), শ্মশানকালী, সত্যপীর, পথের কালী, সিদ্ধেশ্বরী প্রভৃতি পূজিতা হন। আর এই পূজা উৎসবের মধ্য দিয়ে লোকসংস্কৃতি বহমানা।

মামগাছি

পূর্বস্থলী থানার অন্তর্গত মামগাছি বা মাউগাছি (মোদদ্রুমদ্বীপ) র বর্তমান নাম জান্নগর বা জাহাননগর। এই গ্রামে ব্রহ্মাণীমাতা ছাড়া আরও তিনটি (বর্তমানে ২টি) শ্রীপাট আছে।

শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণী দেবী পুত্র বৃন্দাবন দাস সহ শ্রীবাসের আশ্রয়ে বাস করতেন। সেই ভাঙ্গা বাড়ি ও মন্দির রয়েছে অন্যত্র। এখানে ১৯২৯ সালে নূতন মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এটি ভাণ্ডারটিকুরী হল্ট থেকে দক্ষিণমুখী যেতে ব্রহ্মাণীতলা থেকে মিনিট সাতেক পথ, এবং প্রথমেই পড়ে।

পূর্বমুখী এই মন্দিরের দক্ষিণ থেকে বামদিকে রয়েছেন শ্রীমালিনী ঠাকুরাণীর পূজিত (সেবক নন্দনন্দন ব্রহ্মচারীর মতে বৃন্দাবন দাসের পূজিত) শ্রীশ্রীগৌর নিতাই, সামনে বলরাম-সুভদ্রা-জগন্নাথ, তার বামে শ্যামসুন্দর। আর রাধাকৃষ্ণ, ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর কর্তৃক ১৯২৯ সালে প্রতিষ্ঠিত। এই রাধাকৃষ্ণের মূর্তিই পাথরের, বাকি সবই দারু মূর্তি। বার্ষিক অনুষ্ঠান বৈশাখী কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথিতে অনুষ্ঠিত হয়।

এই শ্রীপাট থেকে দক্ষিণমুখে আরও পাঁচ মিনিট এগোলেই শ্রীসারঙ্গমুরারি প্রভুর শ্রীপাট।

সারঙ্গদেব সর্পাঘাতে মৃত একটি বালকের কর্ণে দীক্ষামন্ত্র দিয়ে জীবন দান করেন। সেই বালক সারঙ্গদেবের সেবাতেই জীবন কাটান, এবং শ্রীঠাকুর মুরারি নামে প্রসিদ্ধ হন। শ্রীহরিদাস দাস তাঁর 'শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধান' নামক গ্রন্থে বলেছেন যে এই প্রাচীন সেবাটি মামগাছি গ্রামে বহু প্রাচীন বকুল বৃক্ষতলে অদ্যাপি বিদ্যমান আছে।[১]

এই মন্দিরের পুনঃ নির্মাণ হয় ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে। পুরাতন মন্দিরের মাত্র তিনটি খিলান অবশিষ্ট ছিল। এখানে শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুরের পূজিত শ্রীশ্রীরাধামদন গোপালজীকে রাখা হয়েছে। এঁর ত্রিভঙ্গ মূর্তি। রাধার উচ্চতা ২½´ এবং মদনগোপালের উচ্চতা ৩ ফুট। সারঙ্গদেবের পূজিত শ্রীরাধা গোপীনাথ জীউ রয়েছেন। এঁদের উচ্চতা যথাক্রমে ½´, ১ ফুট। সেবানন্দ সেনের পূজিত রাধাগোবিন্দ রয়েছেন, যাঁদের উচ্চতা যথাক্রমে ¼´, ½ ফুট। আর রয়েছেন শ্রীশ্রীপুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের সেবিত শ্রীশ্রীগৌর গদাধর জীউ। ১৯৪৩ সালেই এই পাটের বিগ্রহগুলির সংস্কার হয়। বার্ষিক উৎসব হয় দোলের সময়।

তথ্যপঞ্জী

১। শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধান (২য়, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড), সঙ্কঃ—শ্রীহরিদাস দাস, নবদ্বীপ, ২য় সং, ৫০১ শ্রীচৈতন্যাব্দ, পৃঃ—১৪০০

পাতুন

মন্তেশ্বর থানার অন্তর্গত দেনুড়ের নিকটবর্তী একটি গ্রাম পাতুন। জনশ্রুতি, মহর্ষি পতঞ্জলি এই গ্রামে এসে পতঞ্জলীশ্বর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। সেক্ষেত্রে পতঞ্জলীর নামে গ্রামটির নাম হয় পাতুন। কিন্তু গ্রাম নামটির ক্ষেত্রে এই তত্ত্ব আরোপিত হয়েছে বলেই মনে হয়। কারণ, মন্দিরটি তত প্রাচীন নয়। গ্রামের প্রান্তে একটি পুকুরের পাড়ে রয়েছে পত্রেশ্বর শিবের একটি প্রাচীন মন্দির। বিনয় ঘোষ বলেছেন—"পত্রেশ্বর মন্দিরের ভিতরে-বাইরে যে-সব পাথরের মূর্তি স্তূপীকৃত করা হয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল :

ক. বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবদেবীর মূর্তি।

খ. অবলোকিতেশ্বর, লোকেশ্বর বিষ্ণু, বিষ্ণু (নানারূপের), সূর্য, গণেশ মূর্তি।

গ. ধর্মরাজের নানাপ্রকারের কূর্মমূর্তি।

ঘ. শিবলিঙ্গ।

মূর্তিগুলি দেখলে মনে হয়, অধিকাংশই পালযুগের শেষে এবং সেনযুগে খোদাই করা হয়েছে। আরও একটা বৈশিষ্ট্য হল, মূর্তিগুলির আনকোরা নূতনত্ব। অর্থাৎ মূর্তিগুলি কোনো কাজে ব্যবহার করা হয়েছে বলে মনে হয় না। পাথরের খণ্ড ঘষামাজা পর্যন্ত হয় নি, দেখলেই বোঝা যায়। পূজা তো হয়ই নি, এমনকি মন্দির বা প্রাসাদ অলঙ্করণের জন্যও ব্যবহার করা হয়নি। অনেক অসম্পূর্ণ মূর্তিও আছে, দেখলে ছেনি-বাটালির ঘা পর্যন্ত চেনা যায়। এছাড়া একই মূর্তির সংখ্যাধিক্য এবং এক স্থানে একত্র সমাবেশ থেকে এই কথাই মনে হয় যে পাতুন গ্রাম এককালে ঠিক দাঁইহাটের মতো ভাস্করদের গ্রাম ছিল।"[১]

গ্রামদেবতা রূপে রয়েছেন ঐ পত্রেশ্বর (পতঞ্জলীশ্বর) শিব, এবং ব্যগ্র-ক্ষত্রিয়দের দ্বারা পূজিত ধর্মরাজ।

এই গ্রামে শ্রীঅভিরাম-শিষ্য বিদুর বা যাদবেন্দু পণ্ডিতের শ্রীপাট রয়েছে। দালানরীতির মন্দিরে রয়েছেন শ্রীশ্রীগোপীনাথ জীউ। এখানে কার্তিকী শুক্লা নবমী-দশমী তিথিতে বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

তথ্যপঞ্জী

১। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (১ম খণ্ড), বিনয় ঘোষ, প্রকাশ ভবন, ৩য় মুদ্রণ ১৩৯৫, পৃঃ—১৫৫

বাঘনাপাড়া

কালনা থানার অন্তর্গত কালনা ১ নং ব্লকের অধীন একটি গ্রাম বাঘনাপাড়া। এটি কালনা-বেলের হাট-বর্ধমান বাসরুটের উপর পড়ে। এই গ্রাম মৃত বল্লুকা নদীর তীরে অবস্থিত। এখানে রয়েছে নিত্যানন্দের পত্নী জাহ্নবাদেবীর পালিত-পুত্র রামচন্দ্র গোস্বামী তথা রামাই-এর পাট।

মুরলীবিলাস ও বংশীশিক্ষা নামক দুটি অপ্রামাণ্য গ্রন্থের মতে জাহ্নবীদেবী যেবার বৃন্দাবনে গিয়ে দেহরক্ষা করেন, সেবার রামচন্দ্র খড়দহে সংবাদ পাঠিয়ে বেশ কিছুকাল তথায় অবস্থান করেন। তারপর গৌড়ে ফিবে অম্বিকার পশ্চিমে বল্লুকা নদীর দক্ষিণ তীরে গভীর জঙ্গল কাটিয়ে তথায় বাঘনাপাড়া পাটের পত্তন করেন।

বংশীশিক্ষার মতে রামাই বৃন্দাবনের প্রস্কন্দন-তীর্থ থেকে কানাই-বলাই-এর মূর্তি নিয়ে আসছিলেন। তখন "কৃষ্ণবলরাম কহিলেন, আর না যাইব। / এই বনে রহি মোরা বিহার করিব।" এখানে এই বনটিকে পৌরাণিক মহিমায় মণ্ডিত করার উদ্দেশ্যেই ব্যাঘ্রপাদ ঋষির কাহিনী যুক্ত করা হয়েছে, যা অতি-মাত্রায় অলৌকিক এবং কাল্পনিক।

বাঘনাপাড়ার ইতিকথা (ভারতবর্ষ, ভাদ্র ১৩২৪) প্রবন্ধে শ্রীবলাই দেবশর্ম্মা লিখেছেন "বনে ব্যাঘ্রের বড় উপদ্রব ছিল বলিয়া গ্রামের নামই হইল ব্যাঘ্রনাদাশ্রম , তাহাব অপভ্রংশ বাঘ্নাপাড়া।" কিন্তু ধ্বনিতত্ত্বে তা গ্রাহ্য নয়।

মুরলীবিলাসে বলা হয়েছে, "ব্যাঘ্রে দূর করি কৈলা বাঘ্‌নাপাড়া গ্রাম।" আর তাই যদি হয় তবে রামাই বাঘ খেদিয়ে গ্রামবাসীদের 'বাঘ নাই'—এই আশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তা ধরে নেওয়া যায়, এবং যখন পাড়া গড়ে উঠল তখন 'বাঘ নাই' এর সাথে পাড়া যুক্ত হয়ে হলো বাঘ্নাপাড়া। কিন্তু বাঘনাপাড়ার নামের প্রসঙ্গে আমার অন্য দুটি কথা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়।

প্রথমতঃ, এমনও হতে পারে—বাগান ছিল বলে ঐ স্থানটি বাগনা (>বাঘনা) নামে অভিহিত ছিল। পরে আশ্রমকে কেন্দ্র করে যখন পাড়া গড়ে ওঠে, তখন থেকে বাঘনাপাড়া নামে পরিচিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, বাঘনাপাড়ার দক্ষিণ-পূর্বে অতি সংলগ্নেই রয়েছে দুটি গ্রাম—শিয়ালডাঙ্গা ও কৈখালি। ঐ গ্রাম দুটির নামতত্ত্বের প্রমাণে বলা যায়, মুরলীবিলাসোক্ত বনটি বাঘের অস্তিত্বের জন্য মুখে মুখে বাঘের গৃহ অর্থে 'বাঘের থানা' থেকে 'বাঘ্না' নামে কথিত হতো। পরে রামচন্দ্র যখন পাট প্রতিষ্ঠা করেন, এবং ক্রমে যখন একটা পাড়া গড়ে উঠলো, তখন থেকেই বাঘনাপাড়া নাম।

বাঘনাপাড়ার গ্রামদেবতা বলরাম ও কৃষ্ণ যুগল বিগ্রহ। শ্রীহরিদাস দাস বলেন যে ১৫১৩ শকাব্দে রামাই গোঁসাই-এর কালে নির্মিত শ্রীকৃষ্ণবলদেব

শ্রীবিগ্রহের শ্রীমন্দির অতীব মনোহর।[১] কিন্তু ডঃ কাননবিহারী গোস্বামী বলেন যে এটি ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত।[২] শ্রীযজ্ঞেশ্বর চৌধুরীও বলেছেন যে রামচন্দ্রের ভ্রাতা শচীনন্দন কর্তৃক নির্মিত কৃষ্ণ-বলরাম মন্দির। মন্দিরের প্রবেশ দ্বারে চারিছত্র শ্লোক উৎকীর্ণ আছে। কিন্তু প্রথম দুই ছত্র অত্যন্ত অস্পষ্ট হওয়ায় পড়া যায় নাই। শেষ দু'ছত্রের পাঠ হতে মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় জানা যায়। যথা,—

শাকে নাগাগ্নি কামেষু বিধৌ শ্রীরামচন্দ্রতঃ।
আবিরাসীদিষ্ট স্তম্ভং কার্য্যেঽস্মিন্ শ্রীরমাপতেঃ॥

অর্থাৎ নাগ=৮, অগ্নি=৩, কাম=৫ ও বিধু=১ ধরে অঙ্কস্য বামাগতি অনুযায়ী ১৫৩৮ শকাব্দ বা ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে এই মন্দির নির্মিত হয়েছিল।[৩] কৃষ্ণ-বলরামের মন্দিরটি দালানরীতির। রেবতী রাধারানীর মন্দিরটিও দালান-রীতির। এই দুটি দালান ছাড়া আরও দুটি দালান বর্গাকৃতি ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে। এর মাঝে রয়েছে নাটমন্দির।

রেবতী-রাধারানী মন্দিরে টেরাকোটা অলঙ্করণের পরিবর্তে স্টাকো পদ্ধতিতে লতাপাতা, ফুল, পক্ষী ইত্যাদি উৎকীর্ণ আছে।

রেবতী-রাধারানী মন্দিরের বিপরীতে রয়েছে জগন্নাথ মন্দিরটি। শ্রীযজ্ঞেশ্বর চৌধুরী বলেন যে মন্দিরটি অষ্টাদশ শতকে নির্মিত হয়েছিল।[৪] এই ঘরের মধ্যে বড় বিগ্রহরূপে রয়েছেন জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা। এঁদের পাদদেশে রয়েছে ছোট ছোট আকৃতিবিশিষ্ট গৌর নিতাই, গোপাল, প্রাণবল্লভ, লক্ষ্মী, ১০৮টি শালগ্রাম শিলাসহ রাজরাজেশ্বর, ১০৮টি ক্ষুদ্রাকৃতি শিবলিঙ্গ, জাহ্নবা, গোকুলচাঁদ ও রাধারানীর মূর্তি। মন্দির চত্বরের মধ্যে রয়েছে সুপ্রশস্ত নাটমন্দির ছাড়াও দ্বিতল নহবতখানা, অষ্টকোণাকৃতি ঘড়িঘর, জগন্নাথদেবের গুণ্ডিচাগৃহ ও রন্ধনশালা।

মন্দিরের সিংহদ্বার দিয়ে ঢুকেই বারমহলে রয়েছে জগদ্ধাত্রী ও দুর্গার পূজামণ্ডপ, গাজনমন্দির ও দোলমঞ্চ। আর বারমহলে উত্তরমুখী ঘরে রয়েছেন গোপেশ্বর শিব। এঁর বারান্দায় রয়েছে কষ্টিপাথরের নন্দীবৃষ।

এখানে এই যে ১০৮টি শিবলিঙ্গ, জগদ্ধাত্রী, দুর্গা, এবং সর্বোপরি গোপেশ্বর শিব রয়েছেন, এসবের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠতে পারে, বৈষ্ণব পরিমণ্ডলে এসব বিরুদ্ধ দেবদেবীর সংযোজন কেন? এক্ষেত্রে কতকগুলি উদ্ধৃতি দিয়ে তার কারণ বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

মহাভারতে অনুশাসন পর্বে বলা হয়েছে "ব্রহ্মা, বিষ্ণু, আপনি ও অন্যান্য দেবগণ আপনারা সকলেই সেই দেবাদিদেবের লিঙ্গ পূজা করিয়া থাকেন।" এবং সেক্ষেত্রে আরও বলা হয়েছে "মহাত্মা বাসুদেব বদরিকাশ্রমে সহস্র বৎসর কেবল সেই সনাতন মহেশ্বরের আরাধনা করিয়াই তাঁহার প্রসাদে জগদ্ব্যাপ্ত ও সর্বভূতের প্রিয়তম হইয়াছেন।"[৫] আবার শ্রীচৈতন্য দাক্ষিণাত্য থেকে যে 'ব্রহ্মসংহিতা' গ্রন্থটি সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছিলেন, সেই গ্রন্থেই (৫।১৪) বলা হয়েছে যে লিঙ্গরূপী মহেশ্বর পরম শক্তিমান পুরুষ, সেই লিঙ্গে জগৎপতি মহাবিষ্ণু সদা আবির্ভূত।[৬] অন্যদিকে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার নবম পরিচ্ছেদে দেখা যায়, চৈতন্যদেব তীর্থপর্যটন করতে গিয়ে দাক্ষিণাত্যের নানাস্থানে শিবকে দর্শন করছেন, এমন কি 'শিয়ালী ভৈরবী দেবী' এবং 'কন্যাকুমারী'কে দর্শন করছেন। তাছাড়া, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলা হয়েছে—

পরমানন্দপুরী তবে চলিলা নীলাচলে।
মহাপ্রভু চলি চলি আইলা শ্রীশৈলে॥
শিবদুর্গা রহে তাঁহা ব্রাহ্মণের বেশে।
মহাপ্রভু দেখি দোঁহার হইল উল্লাসে॥
তিন দিন ভিক্ষা দিল করি নিমন্ত্রণ।
নিভৃতে বসি গুপ্ত কথা কহে দুইজন॥[৭]

আবার শাস্ত্রে "বৈষ্ণবপ্রধান স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে দেখা যায় নিজের হাতে কালীপূজো করতে ; রাসলীলায় প্রবেশ করেন মহাদেব।"[৮] আর এইসব সূত্র ধরেই চৈতনোত্তর যুগে যখন ব্রাহ্মণ্য জীবনচর্যা বৈষ্ণব পরিমণ্ডলকে গ্রাস করেছে, তখন থেকেই কোন কোন বৈষ্ণব পাটে বা কোন কোন বিষ্ণুমন্দিরে শিব বা অন্যান্য বিরুদ্ধ দেবীকে স্থান করে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া, বৈষ্ণবদের আচার গ্রন্থ শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে যেখানে রুদ্রকে অর্চনা করার কথা বলা হয়েছে,[৮(ক)] সেখানে রামাই-এর পাটে গোপেশ্বরের বিশিষ্ট হয়ে থাকার কোন বাধা নেই। এঁর সম্বন্ধে অন্যতম সেবাইত শ্রীপাঁচকড়ি গোস্বামী এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যে গোপেশ্বর শিব হলেন ব্যাঘ্রপাদের পূজিত দেবতা। তিনি (ব্যাঘ্রপাদ) ব্যাঘ্রযোনী অবস্থা থেকে শাপমুক্ত হন। মুরলীবিলাসে ব্যাঘ্রের সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

গঙ্গায় প্রবেশ করি দেহ তেয়াগিলা,
দিব্য দেহ ধরি তিঁহ মুক্তপদ পাইলা।

কিন্তু ডঃ সুকুমার সেনাদি অনেকেই মুরলীবিলাসকে প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করতে পারেন নি।

ব্যাঘ্রপাদ শাপমুক্ত হয়ে বলেছিলেন যে তাঁর আরাধ্য দেবতা হরগৌরীর মূর্তি মাটির তলায় চাপা পড়ে আছে। তিনি যেন উদ্ধার করে তাঁকে দ্বারদেশে প্রতিষ্ঠা করেন। তাতে রামাই তাঁকে উদ্ধার করে নাম দেন গোপেশ্বর। এই নামতত্ত্বের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে পূজারী শ্রীবিশ্বদেব গঙ্গোপাধ্যায় সাক্ষাৎকারে বলেন যে গোপীশ্বরের অপভ্রংশ গোপেশ্বর। একবার রাস হচ্ছিল। লুকিয়ে দেখছিলেন শিব। রাসমণ্ডলে দুর্গাও অংশ নিয়েছিলেন। কৃষ্ণের মুখোমুখি হতেই শিব হলেন লজ্জিত। কৃষ্ণ বললেন—তুমি যেমন আমার রাস দেখলে, আমিও দেখছি তোমার। শিব হতচকিত হয়ে দেখলেন যে তাঁর সম্মুখে দুর্গা। রাস হলো না। গোপীদের মধ্যে শিব বলে হলো গোপেশ্বর শিব। কিন্তু 'গোপী+ঈশ্বর' এই সন্ধিতে গোপেশ্বর আসে না, গোপেশ্বর আসে 'গোপ+ঈশ্বর' এই সন্ধিতে। আর আসে বলেই কুলীন গ্রামের, বৃন্দাবনের বা বৈকুণ্ঠপুরের (বর্ধমান) গোপেশ্বর শিবের সাথে গোপীতত্ত্ব যুক্ত হয় নি। এ থেকে স্পষ্টই অনুমান করা যায় যে বাঘনাপাড়ার পাটে গোপেশ্বর শিবের উপর গোপীতত্ত্বের মূলে ছিল শিবকে বৈষ্ণবায়ন করার জোর প্রয়াস।

শ্রীবিশ্বদেব গঙ্গোপাধ্যায় বলেছিলেন যে রাস ভেঙ্গে যাওয়ার জন্য এই পাটে রাস হয় না। কিন্তু রাস না হওয়ার অন্য কারণ রয়েছে। যেহেতু এই পাটের আচার-অনুষ্ঠান বৈষ্ণব আচারগ্রন্থ 'হরিভক্তিবিলাসে'র রীতি অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হয়, এবং যেহেতু হরিভক্তিবিলাসে রাসের প্রসঙ্গ নেই, তাই এখানে রাস অনুষ্ঠিত হয় না।

এখানে মন্দিরসংলগ্ন একটি দীঘি রয়েছে, তার নাম যমুনা। হয়তো যমুনার খননকালে বা মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য মৃৎখননকালেই শিবের মূর্তিটি ভগ্ন অবস্থায় আবিষ্কার করা হয়। আর এই সত্যের ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে ব্যাঘ্রপাদের কল্পিত কথনের মধ্যে।

শ্রীযজ্ঞেশ্বর চৌধুরী বলেছেন যে অধ্যাপক ডঃ কাননবিহারী গোস্বামী গোপীশ্বর শিবলিঙ্গ ও দুটি ভগ্ন প্রস্তর স্তম্ভের নিদর্শনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বেলে পাথরে নির্মিত কীর্তিমুখসহ রত্নমালা খোদিত শিলাফলকটির দৈর্ঘ্য ৩ ফুট, এবং প্রস্থ ১ ফুট। শিলাফলকের বামভাগে সিংহমুখ বা ব্যায়ত

কীর্তিমুখ হতে রত্নমালা সকল বিলম্বিত হয়ে আছে। কৃষ্ণ-বলরাম মন্দির হতে গোপীশ্বর মন্দিরে যাবার পথে স্তম্ভটি প্রতিষ্ঠিত আছে। ডঃ গোস্বামীর মতে এই শিলা-ফলকটির সঙ্গে বীরভূম জেলার পাইকোর গ্রামে স্থাপিত চেদীরাজ কর্ণদেবের শিলাস্তম্ভে ক্ষোদিত কীর্তিমুখ ও রত্নমালার সাদৃশ্য আছে।[৯]

শিবের মূর্তিটি হলো—কিছুটা শ্বেতপাথরের মতো পাথরের আয়তক্ষেত্রাকৃতি বেদী। তার উপরে কালো পাথরের চারচৌকো কিছুটা অংশ। তার উপর বেশ বড় কালো পাথরের চারচৌকা কিছুটা অংশ। তার উপর বেশ বড় কালো পাথরের গৌরীপট্ট। তার উপর অমসৃণ শিলকোটানোর মতো গাত্রবিশিষ্ট শিবের অঙ্গ (শিবলিঙ্গ), তার কেন্দ্রভাগে একটি দশভুজা মূর্তি ক্ষোদিত আছে। মূর্তিটি বদ্ধ-পদ্মাসন ভঙ্গীতে আসীন, এবং দশ-প্রহরণধারিণী। মূর্তিশিল্পে এমন ভাস্কর্য বিরল। এই শিবকে শ্রীযজ্ঞেশ্বর চৌধুরী তাঁর আলোচনায় 'গোপীশ্বর' শিব বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ইনি 'গোপীশ্বর' নন, 'গোপেশ্বর' শিব নামেই পরিচিত। পূর্বেই বলা হয়েছে, বৈষ্ণব পরিমণ্ডলে স্থান করে দেওয়া হয়েছে এই গোপেশ্বর শিবকে। ইনি যে অন্য শিবের চেয়ে স্বতন্ত্র তা বোঝাবার জন্য বিশেষ বৈশিষ্ট্য আরোপ করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে পূজারীর বক্তব্য: রাসভঙ্গ হয়েছিল বলে পাটের অনুষ্ঠান থেকে রাসকে বাদ দেওয়া হয়েছে। শিবের ধ্যানকে স্বতন্ত্র রাখতে রাস, এবং ব্যাঘ্রপাদ ঋষির কাহিনী যুক্ত করা হয়েছে গোপেশ্বরের ধ্যানমন্ত্রের সাথে। এখানে বাঘের স্মৃতি স্মরণার্থে বাঘ-বাঘিনীকে ভোগদান করা হয়। শিবকেও অন্নভোগ দেওয়া হয়।

কিন্তু এই স্বাতন্ত্র দান সত্ত্বেও শিবের কাছে যা প্রার্থনা, সেই আধি ব্যাধি থেকে মুক্তি এবং সন্তান কামনা—এখানেও তাই করা হয়। বিশেষ করে সন্তান কামনার্থে 'হত্যা' দেওয়া হয়, যা বৈষ্ণব আদর্শ থেকে দূরে। পাটবাড়ির তথ্য থেকে জানা যায় যে ১৪৫৬ (১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দ) শকাব্দে রামাইএর আবির্ভাব, এবং ১৫১১ (১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দ) শকাব্দের মাঘী কৃষ্ণা তৃতীয়া তিথিতে তাঁর তিরোধান। তবে তাঁর তিরোধান সম্বন্ধে শ্রীযজ্ঞেশ্বর চৌধুরী বলেছেন যে ১১০৬ শকাব্দে (মতান্তরে ১৫১৯ শকাব্দে)। আবার শ্রী হরিদাস দাস বলেছেন যে ১৫০৫ শাকে তিনি অপ্রকট হন।[১০] তাঁর অপ্রকট কাল যখনই হোক না কেন মন্দির নির্মাণকালে (১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে) শিবের আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠা

অসম্ভব নয়, এবং তাঁকে বৈষ্ণবীয় পরিমণ্ডলে স্থান করে দেওয়ার জন্যই রামাই-এর সাথে কল্পিত কাহিনীর আরোপ, এমন মত অযৌক্তিক নয়।

শ্রীযজ্ঞেশ্বর চৌধুরী বলেছেন যে বৃন্দাবন থেকে আগত মীনকেতন ও কায়স্থ কৃষ্ণদাস রামচন্দ্রকে রেবতী ও রাধারানী বিগ্রহদ্বয় অর্পণ করায় তিনি সানন্দে তাঁদের কৃষ্ণ-বলরামের পার্শ্বে স্থাপন করতে পারায় তাঁর অভিষ্ট সিদ্ধ হয়।[১১]

বৈধী মার্গের বৈষ্ণবদের আচারগ্রন্থ শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসের ২।১৪২ শ্লোকে বলা হয়েছে যে রুদ্রকে ঈশান কোণে অর্চনা করবে, ৫।৭ শ্লোকে বলা হয়েছে—মন্দিরের নৈঋ্র্ত কোণে শ্রীদুর্গার এবং ঈশানকোণে ক্ষেত্রপালের পূজা করবে, ৫।২১২ শ্লোকে বলা হয়েছে যে যিনি শ্রদ্ধা সহকারে একশত শালগ্রাম শিলা পূজা করেন তিনি বিষ্ণুলোকে বাসান্তে চক্রবর্তী অর্থাৎ রাজা হন, ২।৫৫ শ্লোকে লক্ষ্মীদেবীর পূজার কথা বলা হয়েছে, ৬।১৩৭ শ্লোকে জগন্নাথের সেবার কথা বলা হয়েছে, এবং ১০।২৮ শ্লোকে শ্রীশিব ও কৃষ্ণে ভেদজ্ঞান না করার বিধান দেওয়া হয়েছে। আর এই সব বিধানের হয়তো অনুসরণ রয়েছে রামাই-এর পাটের দেবদেবীদের সংযোজন ও বিন্যাসের ক্ষেত্রে।

এই পাটের বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয় রামাই-এর তিরোধানকে উপলক্ষ্য করে। তাই মাঘী কৃষ্ণা তৃতীয়া তিথিতে উৎসবের সূচনা হয়।

রামাই ছিলেন আজন্ম ব্রহ্মচারী। তিনি বাৎসল্য রসের সাধনা করে গেছেন। তাই বাৎসল্যের বশেই কানাই বলাই তাঁকে স্বপ্নে তাঁর পারলৌকিক কর্মাদি করার প্রতিশ্রুতি দেন। এখানে এই যে উৎসবের পরিকল্পনা, এর সাথে অগ্রদ্বীপের গোপীনাথের উৎসব-পরিকল্পনার সাদৃশ্য রয়েছে।

কানাই বলাই-এর উৎসব ছয় দিনের। পূর্বদিন রাত্রে অধিবাস। অধিবাসের পর—

১ম দিন—কানাই বলাই-এর কাছাপরা।

২য় দিন—নবীন বেশ (ধরাচূড়া ধারণ)।

৩য় দিন—রাখাল বেশ।

৪র্থ দিন—নটবর বেশ।

৫ম দিন—রাজবেশ।

৬ষ্ঠ দিন—শৃঙ্গারিয়া অর্থাৎ ফকির বা যোগীর বেশ (সোনার কমণ্ডলু ধারণ)।

এখানে এই যে বেশসজ্জা, এই বেশসজ্জা কৃষ্ণনগরের বারদোলের বিগ্রহগুলির ক্ষেত্রেও লক্ষিত হয়। ৺কুমুদনাথ মল্লিকের 'নদীয়া-কাহিনী'র পরিশিষ্ট অংশে বলা হয়েছে যে তিন দিনে বিগ্রহের তিন রকমের বেশ। প্রথম দিনে রাজবেশ, দ্বিতীয় দিনে ফুলবেশ, এবং তৃতীয় দিনে রাখাল বেশ।[১২]

এখানে এই দুই স্থানের বেশ সজ্জার ক্ষেত্রে জগন্নাথদেবের বেশ সজ্জার প্রভাব থাকতে পারে। যেহেতু তিথি মতে একুশটি বেশে জগন্নাথকে সজ্জিত করা হয়। আর সেই প্রভাব জগন্নাথদেবের দর্শন হেতু হওয়া অসম্ভব নয়।

যাই হোক, উপরোক্ত বেশ অনুযায়ী কানাই বলাইকে সাজিয়ে পূর্বমুখী বারান্দায় ফুলসজ্জিত কাঠের সিংহাসনে রাখা হয়। পাদপীঠে থাকে রামাই-এর প্রতিকৃতি।

দশ এগারটা বেলায় কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়ে পূজা ও আরতি করা হয়। আরতির শেষে ছয় দিনই চিঁড়াভোগ দেওয়া হয়। নিয়ম হতো ২৮টি করে চিঁড়ার মালসাভোগ। তারপর নাট মন্দিরে কীর্তন। কীর্তনের শেষে মধ্যাহ্নে অন্নভোগ। ভোগের শেষে সমবেত ভক্তদের জন্য খিচুড়ি ভোগ। সন্ধ্যায় সন্ধ্যারতি, রাত্রে নৈশভোগ। এই ভোগ পাটের সকল দেবতাকেই দেওয়া হয়। এমন কি গোপেশ্বরকেও অন্নভোগ দেওয়া হয়, যা শিবের ক্ষেত্রে নাকি রীতিবিরুদ্ধ।

ষষ্ঠ তথা শেষদিন ১২টার সময় যমুনাপুকুরের চার ধার ঘুরে নগর প্রদক্ষিণ করা হয় কীর্তন সহ। সামনে থাকে খোন্তাখুন্তি। এক্ষেত্রে বৃন্দাবনীয় বা বীরচন্দ্রীয় প্রভাব স্পষ্ট।

ষষ্ঠ দিনের বৈকালে কানাই বলাইকে শৃঙ্গারিয়া অর্থাৎ ফকির বেশে সাজানো হয়। কারণ, পিতৃশ্রাদ্ধ করতে গিয়ে তিনি ফকির হয়ে পড়েছেন। তাঁর সেই বেশ হলো—হাতওয়ালা কালো জামা পায়ের গোছ অবধি, লম্বা কালো টুপি, গলায় পুঁথির মালা, হাতে সোনার কমণ্ডলু।

সন্ধ্যায় নামকীর্তন। রাত্রে গোস্বামীগণ 'নয়ন ভরে হের যুগল রূপ মাধুরী। শোভে হলধর নামে বংশীধারী॥'—এই দুই কলি গাইতে গাইতে নগর পরিভ্রমণ করা হয়, এবং সমাপ্তিতে নাট মন্দিরে বসে শ্রী গোপালচন্দ্র গোস্বামী রচিত গান গাওয়া হয়।

রাধা ও রেবতী অশৌচ অবস্থার জন্য কানাই বলাই-এর কাছ থেকে ছাড়াছাড়ি থাকেন। দোলপূর্ণিমার রাতে আবার তাঁদের মিলন হয়।

দোল ছাড়াও এই পাটের নানা উৎসব অনুষ্ঠান এই পাটকে গণমুখী করে তুলেছে, এবং আরও গণমুখী করে তুলেছে উৎসব সমাপনান্তে সংযোজিত এক মাসব্যাপী বাঘনাপাড়ার মেলা।

বাঘনাপাড়ায় অন্যান্য প্রত্ন নিদর্শনগুলির মধ্যে রয়েছে ব্যানার্জী পরিবারের জোড়া মন্দির, যমুনাঘাটের মন্দির, নাথ পরিবারের মন্দির, সেনগুপ্ত পরিবারের মন্দির, বড়ালঘাটের মন্দির ও রঘুনাথ গোস্বামীর মন্দির।

এখানে শিবরাত্রিতে গোপেশ্বরের পূজা, চৈত্র মাসে গোপেশ্বরের গাজন, বৈশাখী পূর্ণিমায় কৃষ্ণবলরামের ফুলদোল, ফাল্গুনী পূর্ণিমায় কৃষ্ণবলরামের দোল, আষাঢ় মাসে জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা ও রথযাত্রা, চৈত্র মাসে বংশীবদনের জন্মোৎসব, হেরাপঞ্চমীর অনুষ্ঠান, অন্যদিকে জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তিতে মনসাদেবীর ঝাঁপান, শীতলাপূজা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। আর এসব উৎসব-অনুষ্ঠানাদির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলে লোক সংস্কৃতির ধারাটি।

তথ্যপঞ্জী

১। শ্রীশ্রী গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধান (২য়, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড), সঙ্ক :—শ্রী হরিদাস দাস, নবদ্বীপ, ২য় সং, ৫০১ শ্রীচৈতন্যাব্দ, পৃঃ-১৯৪৯

২। বর্তমান, ৫ই নভেম্বর ১৯৮৯, পৃঃ-৭

৩। বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি (৩য় খণ্ড), যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, পুস্তক বিপণি, ১ম প্রকাশ ১৯৯৪, পৃঃ-১৫০

৪। তদেব, পৃঃ-১৫০

৫। (সচিত্র) মহাভারত (৩য় খণ্ড), মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ, হিতবাদী কার্যালয়, ১৩৩২, পৃঃ-১৬৫০, ১৬৪৫

৬। শ্রীসুদর্শন, শ্রাবণ ১৪০০, পৃঃ-৪৯

৭। শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীকৃত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, সম্পাঃ- উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, ৩য় মুদ্রণ ১৯৮৬, পঃ-১৫৯

৮। মহাতীর্থ একান্ন পীঠের সন্ধানে, নিগূঢ়ানন্দ, শরৎ পাবলিশিং হাউস, ৩য় সং ১৩৯১, পৃঃ-৩৫

৮ (ক) শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস : (১ম খণ্ড), শ্রীসনাতন গোস্বামী, আনন্দ এজেন্সী, ১৩৭৯, পৃঃ-১১২

৯। বর্ধমান: ইতিহাস ও সংস্কৃতি (৩য় খণ্ড), যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, পুস্তক বিপণি, ১ম প্রকাশ ১৯৯৪, পৃঃ-১৪৯
১০। শ্রীশ্রী গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জীবন (১ম খণ্ড), সঙ্ক:—শ্রী হরিদাস দাস, নবদ্বীপ, ২য় সং ৫০১ শ্রীগৌরাব্দ, পৃঃ-১৭৮
১১। বর্ধমান: ইতিহাস ও সংস্কৃতি (৩য় খণ্ড), যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, পুস্তক বিপণি, ১ম প্রকাশ ১৯৯৪, পৃঃ-১৫০
১২। ৺কুমুদনাথ মল্লিকের নদীয়া-কাহিনী, সম্পাঃ—মোহিত রায়, পুস্তক বিপণি, ৩য় সং ১৯৮৬, পৃঃ-৩৬৯

দেনুড়

মন্তেশ্বর থানার অন্তর্গত একটি গ্রাম দেনুড়, প্রাচীন নাম দেন্দুড়। মন্তেশ্বরের নিকটবর্তী গ্রাম। কালনা-পুটশুড়ি বা মেমারী-পুটশুড়ি বাসে পুটশুড়ি। এরই সন্নিকটে দেনুড়। এখানে শ্রীচৈতন্যের দীক্ষাগুরু কেশব ভারতীর জন্মস্থান। এখানে 'ভারতীর গোড়ে' নামক এক পুকুরের পাড়ে শান্তিকুটীরে রয়েছে তাঁর ভজন স্থানের স্মৃতি। শ্রীবিনয় ঘোষ বলেছেন যে কেশব ভারতীর বংশের ব্রহ্মচারী উপাধিযুক্ত উত্তরসূরীরা এখনও দেনুড়ে বাস করেন। সেখানে কেশব ভারতীর একটি মন্দির ও মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।[১] তাঁর প্রতিষ্ঠিত অষ্টধাতুর বালগোপাল মূর্তি দেনুড়ে এখনও পূজিত হয়।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু দেনুড়ে 'ধরার পুষ্করিণী'র পাড়ে আমবাগানে এসেছিলেন, এবং ঐ স্থানের অধুনালুপ্ত একটি হরিতকী তলায় ভোজন ও বিশ্রাম করেছিলেন।[২] তাঁরই নির্দেশে বৃন্দাবন দাস এই গ্রামেই অবস্থান করেন, এবং শ্রীচৈতন্যভাগবত রচনা করেন।

এখানে তিনি শ্রীনিতাই-গৌরের শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করেন। এবং রামহরি দাস নামক তাঁর এক শিষ্যের উপর শ্রীবিগ্রহের সেবাভার অর্পণ করে শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন। সেই থেকে আজও তাঁর পাটে সেই শ্রীবিগ্রহের সেবা চলে আসছে। এখানে শ্রীগদাধর পণ্ডিত দ্বারা লিখিত একটি শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ রক্ষিত রয়েছে, যার পত্রের পার্শ্বে (মার্জিনে) রয়েছে শ্রীচৈতন্যের শ্রীহস্ত লিখিত

২।৪টি শব্দার্থ। তাছাড়া, প্রত্ননিদর্শনের মধ্যে এই পাটেই রয়েছে কালো পাথরের (ব্ল্যাক ব্যাসাল্ট) একটি সুদৃশ মহিষমর্দিনী মূর্তি। এটি পরবর্তীকালে রক্ষিত বা সংযোজিত যে হয়েছে, তা মনে করা যেতে পারে।

এই গ্রামের আদি গ্রামদেবতা দেন্দুডেশ্বর বা দীনেশ্বর শিব। ইনি রয়েছেন স্বল্প টেরাকোটা শোভিত আটচালা রীতির একটি মন্দিরে। এই মন্দিরেই রয়েছে ব্ল্যাক ব্যাসাল্টেরই একটি প্রাচীন চণ্ডীমূর্তি, যার নাম বিক্রমচণ্ডী। আর এই বিক্রমচণ্ডী এবং মহিষমর্দিনী দেবীর অস্তিত্ব প্রমাণ করে যে এখানে বৈষ্ণবীয় স্রোত প্রবাহিতের পূর্বে শাক্ত ধারার প্রাধান্য ছিল।

তথ্যপঞ্জী

১। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (১ম), বিনয় ঘোষ, ৩য় মুদ্রণ ১৩৯৫, পৃঃ-১৪৮

২। শ্রীশ্রী গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধান (২য়, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড), সঙ্ক : শ্রীহরিদাস দাস, নবদ্বীপ, ২য় সং, ৫০১ শ্রীচৈতন্যাব্দ, পৃঃ-১৮৮৭

আটঘরিয়া

কালনা-বর্ধমান রাস্তার উপর কালনা থানার অন্তর্গত একটি গ্রাম। এই গ্রামে বর্ধমান রাজার প্রতিষ্ঠিত একটি আড্ডাবাড়ি ছিল, যা বর্তমানে অবলুপ্ত। মাত্র কালের স্মৃতিচিহ্নরূপে দাঁড়িয়ে আছে আড্ডাবাড়িতে প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরটি।

'রাজবংশানুচরিত'-এর বিবরণ থেকে জানা যায় যে মহারাজ তেজচন্দ্র বর্ধমান থেকে অম্বিকায় যাবার যে সুপ্রশস্ত পথ প্রস্তুত করেন, ঐ পথের প্রতি চার ক্রোশ ব্যবধানে এক একটি আড্ডাবাটী প্রস্তুত করিয়ে তন্মধ্যে পুষ্করিণী খনন ও তদুপরি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়েছিলেন। সেক্ষেত্রে আটঘরিয়া, রাইপুর, রায়বাটী ও কুচুটে ৪টি আড্ডাবাটী ছিল। আটঘরিয়ার আড্ডায় প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরটির নির্মাণকাল ১৭৫৩ শকাব্দ (১৮৩১ খ্রীঃ)। এর নির্মাতা মহারাজ শ্রীতেজচন্দ্র। এর প্রতিষ্ঠালিপিটি হলো :

শকে হব্দেহগ্নীষু পৃথ্বীধরবিধুগণিতে বৃক্ষমালাদ্বিপার্শ্বাং
ক্রোশার্দ্ধাশ্মাঙ্কিতাশ্বানলমিত সুস্থতিং সংক্রমৈ সংপ্রচক্রে।

ভূপ শ্রীতেজচন্দ্রো ব্যুপবনমিলিতাং যোযনস্তে নির্ম্মাণ্যাং
বাপীকূপেশ বৃন্দাম্বগজহয় গৃহাং বর্দ্ধমানোম্বিকাস্তঃ ॥

এটি মাঝারি উচ্চতার একটি আটচালবিশিষ্ট মন্দির।

এই গ্রামের রাস্তার ধারে একটি পুকুরপাড়ে একটি গাছের তলায় একটি ভগ্ন প্রস্তরখণ্ড রয়েছে, যা একটি প্রত্নিদর্শন।

এখানে ভাদ্রমাসের বগাপঞ্চমীতে মনসাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে মেলা বসে। আর এরই মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলে সংস্কৃতির ধারা।

সারগড়িয়া

আটঘরিয়ার পার্শ্ববর্তী গ্রাম সারগড়িয়া। এই গ্রামে একটি নিমবৃক্ষের তলে রয়েছেন শীতলাদেবী, যিনি শনি-মঙ্গলবারে পূজিতা হন। ইনি লৌকিক দেবীরূপে চতুর্পার্শ্বস্থ গ্রামসমূহের এবং দূরপ্রান্তরের মানুষদের পূজা আদায় করেন। এঁর উদ্ভবের ইতিহাস কিছুটা প্রাচীন। এঁর উদ্ভবের সাথে স্বপ্নতত্ত্ব জড়িত। বৈশাখী শুক্লা নৃসিংহ চতুর্দশীতে দেবীর বার্ষিক পূজা। চতুর্পার্শ্বস্থ গ্রাম থেকে মই-এর উপর ডালা সাজিয়ে পূজা আসে। দেবীর মৃন্ময়ী মূর্তি। গর্দভপৃষ্ঠে সমাসীনা চতুর্ভুজা, রক্তবসনা উগ্রমূর্তি, এবং তাঁর ডানদিকের নিম্নহস্তে সম্মার্জনী।

ধাত্রীগ্রাম, ভবানীপুর

অম্বিকা কালনা রেলস্টেশনের পরবর্তী স্টেশন ধাত্রীগ্রাম। এটি কালনা থানার অন্তর্গত। কালনা-বর্ধমান বা কালনা-নবদ্বীপ রাস্তার উপর এর অবস্থান। বর্তমানে এটি একটি সমৃদ্ধশালী গ্রাম। শ্রীসুকুমার সেন বলেছেন যে ধাইগাঁয়ে ("ধার্যগ্রাম") লক্ষ্মণসেনের উপ-রাজধানী ("উপকারিকা",—এখনকার জমিদারির ভাষায় কাছারিবাড়ি—) ছিল।[১] অন্যদিকে, যাকারিয়া সাহেবের মতানুসারে ধার্যগ্রাম ছিল একটি জয়স্কন্ধাবার।[২] আর এই 'জয়স্কন্ধাবার'-এর অর্থ সেনানিবাস। এখন 'উপ-কারিকা' যদি উপ-রাজধানী হয়, তবে 'উপকারিকা' এবং 'জয়স্কন্ধাবার'-এর অর্থ মোটামুটি এক। কিন্তু এক্ষেত্রে দেখতে হবে, 'ধার্যগ্রামে' উপ-কারিকা বা জয়স্কন্ধাবার ছিল কি না। এক্ষেত্রে আমরা

লক্ষ্মণসেনের মাধাইনগর তাম্রশাসনের পাঠটিকে উদ্ধার করতে পারি। অবশ্য "ধার্যগ্রাম পাঠ সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা নিঃসন্দেহ নন।"[৩] কিন্তু মাধাইনগর তাম্রশাসন পাঠে জানা যায় যে শ্রাবণ মাসের সপ্তবিংশতি দিবসে (১২০৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই আগষ্ট) 'ধার্যগ্রাম' (?) নামক স্থানের নিকট অবস্থানকালীন 'পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির' 'বরেন্দ্রভূমির' অন্তর্গত 'কান্তাপুরের' দিকে 'রাবণ হ্রদের' 'দাপুনিয়াপাটক' নামক স্থানে মহারাজা লক্ষ্মণ সেন 'ঐন্দ্রীমহাশান্তি' অনুষ্ঠান পালন উপলক্ষে গোবিন্দ দেববর্মা নামক একজন ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করেছিলেন।[৪] এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে তিনি 'ধার্যগ্রাম' নামক স্থানের নিকটে অবস্থান করছেন, ধার্যগ্রামে নয়। এখন ধার্যগ্রামে যদি উপকারিকা বা জয়স্কন্ধাবার থাকত, তবে তিনি অবশ্যই ধার্যগ্রামে অবস্থান করতেন। এ থেকে সহজেই অনুমান করা যায়, 'ধার্যগ্রাম' একটি প্রসিদ্ধ স্থান হলেও সেখানে উপ-কারিকা বা জয়স্কন্ধাবার ছিল না। অবশ্য লক্ষ্মণসেনের ভাওয়াল তাম্রশাসন (১২০৫ খ্রীঃ) থেকে জানা যায় যে তিনি ধার্যগ্রাম থেকে পৌণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তির বটুম্বী চতুরকের ভূমিদান করেছিলেন। কিন্তু তিনি ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে ধার্যগ্রাম থেকে ভূমিদান করছেন না।

এখন প্রশ্ন, ধার্যগ্রামই কি ধাত্রীগ্রাম (ধাইগাঁ) ?

শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় বলেছেন যে ধার্যগ্রাম (ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালীর মতে প্রকৃত নাম ধার্যাগ্রাম) কোথায়, সে সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত।[৫]

যাকারিয়া সাহেব বলেন, "যেহেতু লক্ষ্মণসেনের মাধাইনগর তাম্রশাসনে (১২০৩ খ্রীঃ) 'পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি'র 'বরেন্দ্রভূমি'র অন্তর্গত 'দাপুনিয়া পাটক' গ্রামের ভূমি তিনি দান করেন ধার্যগ্রামের জয়স্কন্ধাবার থেকে, অতএব 'নওদীহ'র কাছেই ধার্যগ্রাম অবস্থিত ছিল। ('তবকাত-ই নাসিরী' পৃঃ ২৭১)।"[৬] এক্ষেত্রে 'নওদীহ' যদি নবদ্বীপ হয় তবে নবদ্বীপের নিকটবর্তী স্থানরূপে ধার্যগ্রাম-এর ধাত্রীগ্রাম হতে বাধা থাকে না। কিন্তু শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় যাকারিয়া সাহেবের মতটিকে খণ্ডন করেছেন। তিনি বলেছেন যে কিন্তু তা হওয়া কখনই সম্ভব নয়, কারণ লক্ষ্মণসেনের ভাওয়াল তাম্রশাসন (১২০৫ খ্রীঃ) থেকে জানা যায় যে, ঐ বছরেও ধার্যগ্রাম থেকে তিনি পৌণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তির বাশ্চসা-আবৃত্তির অন্তর্গত বটুম্বী চতুরকের ভূমি দান করেছিলেন—(**JRASB, 1942, Letters, P.1ff** দ্রষ্টব্য), যখন "নওদীহ" তাঁর হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল। সহজ বুদ্ধিতে বোঝা যায়, এটি এমন একটি স্থান যা বখতিয়ারের নদীয়া-জয়ের আগে ও পরে

লক্ষ্মণসেনের অধীন ছিল এবং ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্মণসেন ধার্যগ্রামে গিয়ে ঐন্দ্রী মহাশান্তি যজ্ঞ ভূমিদান করে আবার নবদ্বীপে ফিরে এসেছিলেন।[৭]

বখতিয়ার "গৌড়" অর্থাৎ লক্ষ্মণাবতী জয় করেছিলেন ৬০১ হিজরার ১৯শে রমজান অর্থাৎ ১০ই মে, ১২০৫ খ্রীঃ তারিখে—একথা এখন প্রামাণিকভাবে জানা গিয়াছে বখতিয়ার খলজির একটি নবাবিষ্কৃত স্বর্ণমুদ্রা থেকে। এতে তারিখ এবং গৌড়বিজয়ের কথাটি দেবনাগরী অক্ষরে লেখা আছে।[৮] অন্যদিকে শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় বলেছেন যে গৌড় জয়ের আগেই তিনি নদীয়া জয় করেন, তার তারিখ ১২০৪ খ্রীঃ বলে আমরা উপরে সিদ্ধান্ত করেছি (ডঃ দানীরও এই সিদ্ধান্ত ছিল); এই সিদ্ধান্ত এখন প্রামাণিকভাবে সমর্থিত হচ্ছে।[৯] আর তা যদি হয় তবে ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ নদীয়া জয়ের পূর্বে তিনি ধাত্রীগ্রাম থেকে নবদ্বীপে ফিরে যেতে পারেন, কিন্তু ১৫০৫ খ্রীষ্টাব্দে নদীয়া (নওদীহ) যখন তাঁর হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল, তখন তিনি ধাত্রীগ্রাম থেকে ভূমিদান করছেন, এমন কল্পনা করা যায় না। এক্ষেত্রে সুখময় মুখোপাধ্যায় বলেছেন যে মহারাজ লক্ষ্মণসেনের মাধাইনগর তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে ধার্যগ্রাম (?) নামক স্থানের নিকটে অবস্থানকালীন পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির অন্তঃপাতী বরেন্দ্র অঞ্চলের অধীনে 'দাপুনিয়া পাটক' নামক স্থানে তিনি ভূমি দান করেছিলেন। ধার্যগ্রাম পাঠ সম্পর্কে পণ্ডিতেরা নিঃসন্দেহ নন। তবে এস্থান যে বিক্রমপুর বা নবদ্বীপ নয়, এ সম্পর্কে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।[১০] সেক্ষেত্রে তিনি আরও বলেছেন যে সে স্থানটি ছিল পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির অন্তর্গত বরেন্দ্র অঞ্চলের কোথাও এবং সে স্থান গৌড়-লক্ষ্মণাবতী থেকে খুব দূরে অবস্থিত ছিল না।[১১] সুতরাং ধার্যগ্রাম যেখানে ধাত্রীগ্রাম (ধাই গাঁ) নয়, সেখানে "ধার্যগ্রাম' থেকে ধাঁইগাঁ বা অপভ্রংশে ধাত্রীগ্রামে রূপান্তরিত হয়েছে,"[১২]—ডঃ সুকুমার সেনের এই অভিমত নিরর্থক হয়ে পড়ে। এখন প্রশ্ন, এই গ্রামে প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন দেবী জগদ্ধাত্রী, তবে কি তাঁরই নামানুসারে গ্রামটির নাম হয়েছে ধাত্রীগ্রাম?

এক্ষেত্রে বলা যায়, গ্রাম নামের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ দেবদেবীর নামের সাথে পুরই যুক্ত হয়, গ্রাম নয়। তাছাড়া, 'জগদ্ধাত্রীপুর' নামটি যেখানে যথার্থ ছিল, সেখানে দেবীর নামানুসারে ধাত্রীগ্রাম নামটি অসঙ্গত বলেই মনে হয়। আবার সাম্প্রতিক কালের কোন গবেষক 'ধাত্রী' শব্দের অর্থ 'বহেড়া=বয়রা' বার করে স্থানটিতে 'বহেড়া' গাছের বন ছিল, এই অর্থে স্থানটির নাম ধাত্রীগ্রাম হয়েছে,

এই অভিমত স্থাপন করতে প্রয়াসী হয়েছেন, শুনেছি। কিন্তু ইহা কষ্ট কল্পিত বলেই মনে হয়। আসলে ধাত্রী (>দাই) দের গ্রাম ছিল, এই অর্থেই স্থানটির নাম ধাত্রীগ্রাম (ধাই গাঁ) হয়েছিল, একথা মনে করা অধিকতর যুক্তি-সঙ্গত বলে মনে হয়।

এই গ্রাম পূর্ব থেকেই শিক্ষা সংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র ছিল। ডঃ অলোক কুমার চক্রবর্তী বলেছেন যে ধাত্রীগ্রামের গুরু ভট্টাচার্য বংশীয় অভয়রাম তর্কভূষণের পুত্র ছিলেন রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত, যিনি কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগে খ্যাত ছিলেন 'বুনো রামনাথ' নামে।[১৩] অন্যদিকে, যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী বলেছেন যে সমুদ্রগড়ে ছিল বুনো রামনাথের বাসস্থান ও চতুষ্পাঠী।[১৪] এ থেকে অনুমান করা যায়, রামনাথ পিতৃভিটা ত্যাগ করে ধাত্রীগ্রামের সন্নিহিত সমুদ্রগড়ে চতুষ্পাঠী স্থাপন করে বসবাস করতে থাকেন। এই গ্রামটি রামসুন্দর তর্কচূড়ামণি, সত্যব্রত সামশ্রয়ী, সত্যনারায়ণের পাঁচালি লেখক কৃষ্ণকান্ত ভট্টাচার্য, এবং সাহিত্যিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের জন্মস্থান রূপে বিখ্যাত। এই গ্রামটির পার্শ্বে একটি জঙ্গলের মধ্যে টেরাকোটা অলঙ্করণে শোভিত তিনটি মন্দির আছে। এগুলি শিব মন্দির। এগুলির প্রতিষ্ঠাকাল ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দ। একটি পোড়ামাটির টালির ফলকে ক্ষোদিত লিপিতে মন্দির প্রতিষ্ঠার কথা জানা যায়। লিপিটি হল—

১৬৭৩ শকাব্দে ভদ্রেশ্বর পদাম্বুজ ইদম্
শ্রীমৎ সুভদ্রমাদস্য শিলামীজে।

সুতরাং লিপি অনুসারে মন্দিরগুলি কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগেই (রাজত্বকাল ১৭২৮-৮০ খ্রীঃ) স্থাপিত হয়েছিল।

শ্রীযজ্ঞেশ্বর চৌধুরী বলেছেন যে অনুমানিক চারশ বছর পূর্বে নদীয়া জেলার ব্রহ্মশাসন গ্রাম হতে রামচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত নামক এক পণ্ডিত ব্যক্তি ধাত্রীগ্রামে এসে বসবাস স্থাপন করেন। রামচন্দ্রের পুত্রের নাম ছিল চন্দ্রপতি ; তাই এই বংশটি 'চন্দ্রপতি' বংশ নামে পরিচিত। চন্দ্রপতি ধাত্রীগ্রামে দুর্গাপূজা প্রবর্তন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর বংশধরগণ পূজা চালাতে অক্ষম হওয়ায় উইল সম্পাদনের দ্বারা সার্বজনীন পূজায় পরিণত করেন। সেকারণে দেবী দুর্গা এই গ্রামে 'সাজার মা' নামে পরিচিত। ১৯৮৪ সালে সাজার মায়ের বিরাট পূজামণ্ডপ নির্মিত হয়েছে।[১৫]

এখন রামচন্দ্র যদি ৪০০ বছর পূর্বে ব্রহ্মশাসন গ্রাম থেকে ধাত্রীগ্রামে এসে

থাকেন, এবং তাঁর পুত্র চন্দ্রপতি যদি ধাত্রীগ্রামে দুর্গাপূজার প্রবর্তন করেন, তবে সেই দুর্গাপূজার প্রাচীনত্ব প্রায় ৩৫০ বৎসরের। কিন্তু তা এত প্রাচীন কিনা, তা দেখার বিষয়। এক্ষেত্রে কুমুদনাথ মল্লিকের মন্তব্যটি উদ্ধার করা যায়। তিনি বলেছেন যে নবদ্বীপাধিপতি রুদ্র একখানি আদর্শ ব্রাহ্মণ প্রধান স্থান স্থাপন মানসে একশত আট ঘর নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ মনোনীত করে তাঁদের সংসারযাত্রা নির্বাহপোযোগী ভূসম্পত্তি প্রদানপূর্বক চাঁদ রায়ের সাহায্যে এই গ্রামখানি স্থাপনা করেন। ব্রাহ্মণের সুপ্রতিষ্ঠা হেতু গ্রামখানি ব্রহ্মশাসন নামে অভিহিত হয়।[১৬] আর তা যদি হয়, এবং মহারাজ রুদ্রের রাজত্বের সূচনা কাল যদি ১৬৭৬ খ্রীষ্টাব্দ হয়[১৭], তবে রামচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্তের ধাত্রীগ্রামে আগমন ১৬৭৬ খ্রীষ্টাব্দের বেশ কিছু পরেই ঘটেছিল, এবং দেবী দুর্গার প্রতিষ্ঠা আরও পরে বলা যায়। কারণ, রুদ্রের শাসনকালে ব্রহ্মশাসন গ্রামে যে ব্রাহ্মণদের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে ১৬৭৬ খ্রীষ্টাব্দের পরে, কালান্তরে তাঁদেরই একটি শাখাই তো ধাত্রীগ্রামে উপনিবিষ্ট হয়েছিলেন, এবং দুর্গাপূজার প্রবর্তন করেছিলেন।

নদীয়ার ব্রহ্মশাসন গ্রামের সাথে সংযোগের সূত্রেই হয়তো এখানে জগদ্ধাত্রী এবং অন্নপূর্ণা পূজার প্রচলন হয়েছিল।

কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী কৃষ্ণচন্দ্রের পৌত্র অর্থাৎ ঈশ্বরচন্দ্রের পুত্র গিরিশচন্দ্রকে (১৮০২—১৮৪১) জগদ্ধাত্রী পূজার প্রবর্তক বলতে চেয়েছেন। কিন্তু এ কথা ঠিক নয়। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের উদ্যোগেই বাংলাদেশে জগদ্ধাত্রী পূজার ব্যাপক প্রচলন শুরু হয়।[১৮] অন্যদিকে, ডঃ অলোক কুমার চক্রবর্তী বলেছেন যে ভারতচন্দ্রের কথা ধরে নিলে ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের পর থেকে ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসের মধ্যে চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র অন্নপূর্ণা পূজা প্রবর্তন করেন বলে অনুমান করা যায়।[১৯] আর তা যদি হয় তবে ধাত্রীগ্রামে জগদ্ধাত্রী ও অন্নপূর্ণা পূজার ইতিহাস প্রাচীনত্বের দিক থেকে ২৩০ বছরের ঊর্ধ্বে নয়।

শ্রীহরিদাস দাস বলেন যে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ধাত্রীগ্রামে রুদ্র নামক ব্রাহ্মণ জমিদারকে দীক্ষিত করেন। ইনি ঘোর শাক্ত ও বৈষ্ণব বিদ্বেষী ছিলেন; পরে পরম বৈষ্ণব হন এবং ঐ স্থানে বিষ্ণু-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন।[২০] এক্ষেত্রে বলা যায়, শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ যদি রুদ্র নামক ব্রাহ্মণকে দীক্ষিত করে থাকেন তবে তিনি এবং তাঁর বংশধরগণ অবশ্যই 'গোস্বামী' উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন।

কিন্তু ধাত্রীগ্রামে 'গোস্বামী' উপাধিবিশিষ্ট কোন ব্রাহ্মণ পরিবার নেই। সেই 'গোস্বামী' উপাধিবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ পরিবার রয়েছে ধাত্রীগ্রাম সংলগ্ন ভবানীপুরে। এঁরা ছিলেন ব্রাহ্মণবংশীয় প্রাচীন জমিদার। এঁদের গৃহে এখনও রাধাবল্লভ পূজিত হন। এখন যদি রাধাবল্লভকে ব্যাপকতর অর্থে বিষ্ণু ধরা যায়, তবে এঁদের গৃহে যে মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে, তাকে বিষ্ণুমন্দির বলা যায়। আর সেদিক থেকে ঐ গোস্বামী পরিবারকে রুদ্রবংশীয় বলে সনাক্ত করা যায়। কিন্তু সংশয় দেখা যায় সেখানে যেখানে নিত্যানন্দের শিষ্যগৃহে অর্থাৎ রুদ্রের তথা রুদ্রবংশীয়দের গৃহে প্রথামতে গৌর নিতাই-এর দারুমূর্তি প্রতিষ্ঠিত না থাকার ক্ষেত্রে। সুতরাং ধাত্রীগ্রাম বা ভবানীপুরের কেউ যে নিত্যানন্দের দ্বারা দীক্ষিত হয়েছিলেন তা বলা যায় না।

তবে ভবানীপুরের গোস্বামীবংশের যে একটা পূর্বাপর ঐতিহ্য ছিল, তা অনস্বীকার্য। তাই বর্ধমানের রাজা তেজচন্দ্র এই বংশেরই কোন পুরুষকে গুরুত্বে বরণ করেছিলেন।[২১]

এঁদের গৃহে রাধাসহ রাধাবল্লভ রয়েছেন, যা পাথরের গোলাকার বেদীতে প্রতিষ্ঠিত দারু মূর্তি। এঁর বার্ষিক উৎসব জন্মাষ্টমীতে।

এঁদের গৃহে আরও রয়েছেন মহাদেব, নারায়ণ ও ব্রহ্মাণী।

তথ্যপঞ্জী

১। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড। পূর্বার্ধ), শ্রীসুকুমার সেন, ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, ৪র্থ সং ১৯৬৩, পৃঃ-২৭৭

২। বাংলায় মুসলিম অধিকারের আদিপর্ব (১২০৪—১৩৩৮ খ্রীঃ), সুখময় মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যলোক, ১ম প্রকাশ ১৯৮৮, পৃঃ—২৩৪

৩। তদেব, পৃঃ—১৮১

৪। Inscriptions of Bengal, vol. III, N. G. Majumdar, 1229, pp. 112 & 115

৫। বাংলায় মুসলিম অধিকারের আদিপর্ব (১২০৪—১৩৩৮ খ্রীঃ), সুখময় মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যলোক, ১ম প্রকাশ ১৯৮৮, পৃঃ—২৩৫

৬। তদেব, পৃঃ—২৩৪

৭। তদেব, পৃঃ ২৩৪-৩৫

৮। Journal of Numismatic Society of India, vol. XXXV, 1973, Plate XV, No-1, pp. 197-210

৯। বাংলায় মুসলিম অধিকারের আদিপর্ব (১২০৪—১৩৩৮ খ্রীঃ), সুখময় মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যলোক, ১ম প্রকাশ ১৯৮৮, পৃঃ—১২

১০। তদেব, পৃঃ—১৫৪

১১। তদেব, পৃঃ—১৮১

১২। বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি (৩য় খণ্ড), যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, পুস্তক বিপণি, ১ম প্রকাশ ১৯৯৪, পৃঃ—২৫৭

১৩। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, ডঃ অলোক কুমার চক্রবর্তী, প্রগ্রেসিভ বুক ফোরাম, ১ম প্রকাশ ১৯৮৯, পৃঃ—৯০

১৪। বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি (৩য় খণ্ড), যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, পুস্তক বিপণি, ১ম প্রকাশ ১৯৯৪, পৃঃ ৩২২-২৩

১৫। তদেব, পৃঃ ২৫৭-৫৮

১৬। নদীয়া-কাহিনী, কুমুদনাথ মল্লিক, সম্পাঃ—মোহিত রায়, পুস্তক বিপণি, ৩য় সং ১৯৮৬, পৃঃ—২৫০

১৭। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, ডঃ অলোক কুমার চক্রবর্তী, প্রগ্রেসিভ বুক ফোরাম, ১ম প্রকাশ ১৯৮৯, পৃঃ—৫

১৮। তদেব, পৃঃ—১৫১, ১৪৯

১৯। তদেব, পৃঃ—১৪৮

২০। শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধান (২য়, ৩য়, ৪র্থ খণ্ড), সঙ্কঃ—শ্রীহরিদাস দাস, নবদ্বীপ, ২য় সং, ৫০১ শ্রীচৈতন্যাব্দ, পৃঃ—১৮৯০

২১। বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি (৩য় খণ্ড), যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, পুস্তক বিপণি, ১ম প্রকাশ ১৯৯৪, পৃঃ—১৫৭।

পারুলিয়া ও রাক্ষসীপোতার ঢিবি

পূর্বস্থলী থানার অন্তর্গত একটি গ্রাম পারুলিয়া। এই গ্রামের জঙ্গলের মধ্যে রয়েছে একটি ধ্বংসাবশেষ। জনশ্রুতি—এখানে চন্দ্রকেতু নামে এক রাজা

রাজত্ব করতেন। এক ব্রাহ্মণের অভিশাপে তাঁর রাজ্য ও প্রাসাদ ধ্বংস হয়ে যায়। আর এর পাশেই রয়েছে আর এক প্রত্নস্থল—রাক্ষসীপোতার ঢিবি। শ্রীহরিদাস দাস বলেছেন যে জাম্নগরের পশ্চিমে অর্ধ ক্রোশ দূরে রাক্ষসীপোতা—রাজা চন্দ্রসিংহের রাজপুরী ছিল। ঐ স্থানে একটি রৌপ্য মুদ্রা পাওয়া যায়। ওটির একদিকে 'শ্রীশ্রীচন্দ্রকান্ত সিংহ—নরেন্দ্রস্য' বাংলায় ও অপরদিকে মৌথিলী অক্ষরে 'শকে ১২৪৩' লিখিত ছিল। রাজা লক্ষ্মণের পরেই রাজা চন্দ্রকান্ত সিংহ প্রাদুর্ভূ'ত হন।[১] কিন্তু দুজনের সময়কালের দূরত্ব কম নয়। তাই রাজা লক্ষ্মণের পরেই বলা যায় না। তাছাড়া, ঐ মতের সপক্ষে তেমন কোন বলিষ্ঠ ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় নি।

তথ্যপঞ্জী

১। শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধান (২য়, ৩য়, ৪র্থ খণ্ড), সঙ্ক :-শ্রীহরিদাস দাস, নবদ্বীপ. ২য় সং ৫০১ শ্রীচৈতন্যাব্দ, পৃঃ—১৮৭৩

মন্তেশ্বর

মন্তেশ্বর থানার সদর কার্যালয় মন্তেশ্বর। এটি মেমারি-মালডাঙ্গা বাসরুটের উপর অবস্থিত একটি প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু গ্রাম। এই গ্রামে আটচালা রীতির একটি মন্দির (১৫´× ১৫´× ৩০´) রয়েছে। তা'তে প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন ৫´ উচ্চতাবিশিষ্ট গ্রামদেবতা মন্ত্রেশ্বর শিব। এ'রই নামানুসারে গ্রামটির নাম হয়েছে মন্তেশ্বর।

এই মন্ত্রেশ্বর শিব ব্যতীত মন্তেশ্বরে রয়েছেন দুজন ধর্মঠাকুর। একজন পরামানিক পরিবারের দ্বারা সেবিত, অন্যজন ব্যগ্রক্ষত্রিয় পরিবারের দ্বারা সেবিত। তাছাড়া, গ্রামের মধ্যে মুখ্যরূপে অবস্থান করছেন গ্রামদেবী চামুণ্ডা।

পুরাণে চামুণ্ডার উৎপত্তি সম্বন্ধে যে কাহিনী আছে, তা এই : অসুরপতি দুই ভাই শুম্ভ ও নিশুম্ভের সর্বময় কর্তৃত্বে সন্ত্রস্ত হয়ে স্বর্গের দেবতারা দেবী ভগবতীর শরণাপন্ন হন। দেবী দুর্গা—অম্বিকা তাঁদের অভয় দিয়ে বলেন ভয় নেই, অসুর নিধন করতে হবে। দেবীর রূপের কথা শুনে শুম্ভ প্রলুব্ধ হয়ে তাঁর

পাণিপ্রার্থী হয়, এবং দূত পাঠায় তাঁর কাছে। দেবী দূতকে বলেন—শুম্ভই হোক আর নিশুম্ভই হোক এখানে এসে তাঁকে যে যুদ্ধে জয় করতে পারবে, তারই পাণিগ্রহণ করবেন। ক্রুদ্ধ শুম্ভের আদেশে চণ্ড ও মুণ্ড চতুরঙ্গ বাহিনী নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করে। তাদের রণমূর্তি দেখে দেবীর মুখ তৎক্ষণাৎ কালিবর্ণ হয়ে যায়। পরক্ষণেই তাঁর ভ্রূকুটিকুটিল ললাট থেকে করালবদনা কালী আবির্ভূতা হন। হাতে তাঁর অসি, পাশ ও বিচিত্র খট্টাঙ্গ। ভূষণ নরমালা, বসন ব্যাঘ্রচর্ম। শরীরের মাংস শুকনো। বদনমণ্ডল বিস্তৃত। মূর্তি ভয়াবহ লোলজিহ্ব, রক্তবর্ণ চক্ষু। এই মূর্তি ধারণ করে দেবী অসুর সেনাদের উপর পড়ে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেন, এবং চণ্ড-মুণ্ডকে নিহত করে তাদের মুণ্ডসহ দেবী অম্বিকার কাছে উপস্থিত হয়ে উপহার দেন। তখন তিনি বলেন :

যস্মাচ্চণ্ডঞ্চ মুণ্ডঞ্চ গৃহীত্বা ত্বমুপাগতা।
চামুণ্ডেতি ততো লোকে খ্যাতা দেবী ভবিষ্যসি॥

মার্কণ্ডেয় পুরাণ—৮৭ অঃ

অর্থাৎ, দেবী! যেহেতু তুমি চণ্ড ও মুণ্ড উভয়কে গ্রহণ করে আমার কাছে এসেছ, সেইহেতু চামুণ্ডা নামে তুমি লোকের কাছে খ্যাত হবে।[১]

এই চামুণ্ডার বিভিন্ন মূর্তি ও রূপের বর্ণনা আছে আগমশাস্ত্রে ও পুরাণে। পুরাণ ও শাস্ত্রানুসারে মূর্তিভেদে এঁর বিভিন্ন নাম। যেমন—রুদ্রচর্চিকা বা রুদ্রচামুণ্ডা, সিদ্ধচামুণ্ডা, রূপবিদ্যা, ক্ষমা, এবং দন্তুরা।

বিনয় ঘোষ বলেছেন যে মন্তেশ্বরের চামুণ্ডা—রুদ্রচর্চিকা, রুদ্রচামুণ্ডা বা সিদ্ধ-চামুণ্ডার মূর্তি।[২]

মূর্তিটি ১½ ফুটের মতো 'বা-রিলিফ' পদ্ধতিতে খোদিত কষ্টি পাথরের। চালচিত্রে দেবীর মাথার উপরে রয়েছে সপ্তমাতৃকার মূর্তি।

পঞ্চম শতাব্দীর এক লেখাসহ পাথরের গায়ে উৎকীর্ণ সপ্তমাতৃকা চামুণ্ডার মূর্তি পুরাতাত্ত্বিকরা খুঁজে পেয়েছেন মধ্যপ্রদেশের বিদিশার নিকটবর্তী পর্বারী অঞ্চলে গবেষণা চালিয়ে। নাহারঘাটিতেও গুপ্তযুগের যে লেখ আবিষ্কৃত হয়েছে সেখানেও সপ্তমাতৃকা চামুণ্ডার সন্ধান পাওয়া যায়।[৩] আর সেই সূত্রেই বলা যায়, মন্তেশ্বরের চামুণ্ডা মূলতঃ সপ্তমাতৃকা চামুণ্ডা।

স্কন্দগুপ্তের একটি অর্ধভগ্ন শিলালেখে যে সপ্তমাতৃকার নাম পাওয়া যায়, তাঁরা হলেন—ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, মাহেন্দ্রী, বারাহী ও

চামুণ্ডা।[৪] ডঃ নীহাররঞ্জন রায় সপ্তমাতৃকার যে সাতটি নাম উদ্ধার করেছেন, তার মধ্যে মাহেন্দ্রীর পরিবর্তে 'ইন্দ্রাণী'র নাম উল্লেখ করেছেন।[৫] অন্যদিকে, চণ্ডীতে (৯।৩৮-৪১) যে সপ্তমাতৃকার নাম রয়েছে তাঁরা হলেন—ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, ঐন্দ্রী (ইন্দ্রাণী), বারাহী ও শিবদূতি কালী।[৬] এখানে যেহেতু সপ্তমাতৃকা হলেন দেবীর সপ্তরূপ[৭], এবং যেহেতু দেবী এখানে চামুণ্ডা, সেহেতু চামুণ্ডার মস্তকোপরি চালচিত্রে রয়েছেন চণ্ডী-কথিত সপ্তমাতৃকা। এই সপ্তমাতৃকার মধ্যে মধ্যমণি হয়ে রয়েছে এক বীণাবাদিনীর মূর্তি। ইনি বাগীশ্বরী। জৈনতন্ত্রে বাগীশ্বরীর আর এক নাম ব্রহ্মাণী।[৮] তাই মূর্তিটিকে 'ব্রহ্মাণী' বলে সনাক্ত করা যায়। এঁর দুপাশে রয়েছেন তিন তিন মাতৃকা। আর এই সপ্তমাতৃকাদের দুইপ্রান্তে রয়েছে দুটি গজমুণ্ড। দেবী মুকুটশোভিতা, ত্রিনয়নী, নগ্না, নতকুচ মুণ্ডমালাশোভিতা। প্রলয়কালীন মেঘের মতো গায়ের রং। শবাসনা। দক্ষিণ হস্তগুলিতে রয়েছে পানপাত্র, শূল, ডমরু, কর্তী, পদ্ম। আর বাম হস্তগুলিতে রয়েছে ঘণ্টা, খেটক, খট্বাঙ্গ, ত্রিশূল। ত্রিশূল দিয়ে চণ্ড-মুণ্ডকে বধ করছেন। আর বামদিকের এক হাতের অনামিকায় কামড় দিয়ে জগতের ভয় হরণ করছেন। ইনি নৃত্যপরা দশভুজা। এঁর পাদদেশে রয়েছে শিবা, শকুন, চণ্ড-মুণ্ড, ডাকিনী-যোগিনী। এঁর ধ্যান মন্ত্রটি হল :

ধ্যায়েৎ দেবীং কৃশাঙ্গিন প্রলয় জলধরা শ্যামারূপং
ত্রিনেত্রাং দিগবস্ত্রাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাং
গলিত নতকুচাং চণ্ডমুণ্ডাদি হস্তিং
নৃত্যস্তি প্রেতমধ্যে শিবহৃদয়ং তলে বাণাবতংসং চামুণ্ডাং
ব্রহ্মা বিষ্ণু পরশিবং সেবিতাং সিদ্ধদাত্রিং অক্ষতযোনিং
ভদ্রাক্ষ্যদক্ষকালীং ভোরিণং সিদ্ধতাং
প্রণমামিং দিব্যারূপং বিভূষিতাং বিভ্রাণাং
অসিপাত্র ডমরু মণিকরকরাব্জে
শূলবাজং সাপযুক্তং বদনং সরসিজাসনং
অনামিকা ভীতিহরং নরমুণ্ডমালা মুকুটং ভূষিত
অং হিং চামুণ্ডায় নমঃ।

অর্থাৎ, শ্যামবর্ণ মেঘের মতো দেবীর গায়ের রং। তাঁর চক্ষু তিনটি।

নগ্নবেশ মুণ্ডমালাশোভিত নতকুচ। তিনি চণ্ডমুণ্ডকে সংহার করে নৃত্য করছেন। পদতলে তাঁর শব ও মহাকাল। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব তাঁকে আরাধনা করছেন। মোক্ষদাত্রী তিনি—কালীমূর্তিতে অভয়বর দিচ্ছেন। ডানহাতে তাঁর পানপাত্র অসি ডমরু ও শূল। বামহাতে ত্রিশূল দিয়ে চণ্ডমুণ্ডকে বধ করছেন, এবং অনামিকাতে কামড় দিয়ে জগতের ভয় হরণ করছেন। এই হল মন্তেশ্বরের চামুণ্ডার ধ্যানের মর্মার্থ।

এই দেবী বার মাস থাকেন মাইচপাড়ার দক্ষিণমুখী দালানরীতির এক মন্দিরে। দেবীর সাথে অন্য এক সিংহাসনে রয়েছেন শিব, নারায়ণ, ক্ষেত্রপাল, ধর্মরাজ ও মনসা।

সেবাইত শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সাক্ষাৎকারে বলেন যে দেবীর শয়নমন্দিরটি ছিল মাটির। তাঁর পিতামহ দেবীকে মাটির ঘরেই পূজা করতেন। মন্দিরটিতে যে প্রতিষ্ঠালিপি রয়েছে তা থেকে জানা যায়, ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীপঞ্চানন রায় ও শ্রীহরিপদ রায় দালানরীতির ইষ্টকনির্মিত শয়নমন্দিরটি স্থাপন করেন।

মাইচপাড়ায় আরও দেবীর দু'টি মন্দির রয়েছে। একটি দেবীর ভোগ-মন্দির, অন্যটি মহিষকাটা মন্দির।

মহিষকাটা মন্দিরটির প্রবেশদ্বারের মাথায় যে প্রতিষ্ঠালিপি রয়েছে, তা হলো— শুভমস্তু, সকাব্দ ১৬৬১

অর্থাৎ মন্দিরটির নির্মাণকাল ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দ, অর্থাৎ বর্ধমানের রাজা (জমিদার) কীর্তিচন্দ্র রায়ের আমলে (১৭০২-১৭৪০ খ্রীঃ) নির্মিত হয়েছিল।

এখানে 'বর্ধমান রাজাদের মহিষ বলিদান হত' এবং দেবীর পূজার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে বর্ধমান রাজাদের ভূমিদান—এ সব তথ্য থেকে অনুমান করা যেতে পারে, বর্ধমান রাজাদের অর্থানুকূল্যে মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। তার কারণ, প্রতিষ্ঠালিপিতে বর্ধমানের রাজাদের নাম নেই। যদি মন্দির প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অর্থদান থাকতো, তবে প্রথানুযায়ী রাজার নাম থাকত। তাই যতদূর সম্ভব মনে হয়, রাজাদের মহিষ বলিদান, ভূমিদান—পরবর্তী সময়ের দান।

ভোগমন্দিরটিতে প্রতিষ্ঠালিপি না থাকলেও এটি যে একই সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা নিশ্চিত অনুমান করা যায়।

সেবাইত শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী দেবীর শয়নমন্দিরটিকে মূল মন্দির

বলেছেন। আবার শ্রীপ্রণবেশ চক্রবর্তী নবকল্লোল পত্রিকার ১৪০১-এর পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁর 'মন্তেশ্বরের চামুণ্ডা পূজা ও মেলা' নামক প্রবন্ধে মহিষকাটা মন্দিরটিকে বলেছেন মূল মন্দির। এক্ষেত্রে দেখা যেতে পারে, কোন মতটি গ্রহণযোগ্য।

এখন মহিষকাটা মন্দিরটি যদি মঞ্চ হয়, তবে শয়ন মন্দিরটিকেই মূল মন্দির বলা যায়। তবে মঞ্চের গুরুত্ব অনুসারে মহিষকাটা মন্দিরটিকেও মূল মন্দির বলা যায়। এখানে গুরুত্বের দিক দিয়ে বিচার করেই হয়তো মহিষকাটা মন্দিরটিকে ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্টক নির্মিত করা হয়েছিল।

মহিষকাটা মন্দিরটি ১৩৬৩ বঙ্গাব্দে শ্রীরামপদ রায় কর্তৃক সংস্কৃত, এবং ১৩৯৮ বঙ্গাব্দে শ্রীতারকনাথ রায় কর্তৃক পুনঃসংস্কৃত হয়। এবং মন্দিরদুটি এক সময় যে জীর্ণ হয়েছিল, তার প্রমাণ রয়েছে মহিষকাটা মন্দিরের দুই পার্শ্বে এবং ভোগ মন্দিরের সম্মুখে পুরানো ইঁটের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে।

মহিষকাটা মন্দিরটি ১৫´ ভিত্তিবেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত চারচালা মন্দির। এর গঠন ১০´×১০´×৩০´। এটি পূর্বমুখী। চারদিকে ৫´ প্রশস্ত চাতাল। পূর্ব ও পশ্চিম—উভয়দিকেই ৯টি করে সিঁড়ি। আর পশ্চিমের দেওয়াল গাত্রে রয়েছে পেখম ছড়ানো একটি বড় ময়ূরের মূর্তি। সম্মুখে নাট মন্দির। এতে বসানো রয়েছে মহিষকাটার খুঁটি। এই নাট মন্দিরের পশ্চিম দিকে দেবীর মুখোমুখী কার্নিশের নীচে চিত্রিত ময়ূরের মুখে ধৃত সর্প।

মহিষকাটা মন্দিরের অদূরে বায়ু কোণে প্রতিষ্ঠিত দেবীর ত্রিমুখী (উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম) ভোগ মন্দির। ৫´ ভিত্তিবেদীর উপর ৭´×৭´×১৫´ আয়তনের মন্দির।

মহিষকাটা মন্দিরের ঈশানকোণে রয়েছে দক্ষিণমুখী আট চালবিশিষ্ট শিব মন্দির। এর গঠন ৫´ ভিত্তিবেদীর উপর ১০´×১০´×২০´ আয়তনের। এর পাশেই রয়েছে পত্তনিদার চৌধুরীদের পশ্চিমমুখী ধ্বংসপ্রাপ্ত দুর্গাদালান।

মহিষকাটা মন্দিরটি মাইচপাড়ায় অবস্থিত, এবং যেখানে অবস্থিত, সেই স্থানটিকে মাইচ বা মঞ্চ মাইচতলা বলা হয়ে থাকে। এখন প্রশ্ন 'মাইচ' শব্দটির উৎপত্তি কোন শব্দ থেকে ?

আমরা জানি, মৎস্য থেকে অপভ্রংশে মচ্ছ, গোসল থেকে গোচল আসে। শ্রীসুকুমার সেন বলেছেন যে "মনসা" থেকেই "মনচা" এসেছে।[৯] সুতরাং

ধ্বনিতত্ত্বের এই নিয়মেই মহিষ থেকে অপভ্রংশে 'মইচ' আসতে পারে। আবার মহিষ সম্বন্ধীয় অর্থে যখন মাহিষ হয় [১০], তখন মইচ (মহিষ) সম্বন্ধীয় মঞ্চ অর্থে 'মাইচ মঞ্চ' শব্দটি অপভ্রংশে এবং ধ্বনিসাম্যে 'মঞ্চমাইচ' রূপ পেয়েছিল। আর তা থেকে সংক্ষেপে মাইচ। তার সাথে তলা বা পাড়া যুক্ত হয়ে হয়েছে মাইচতলা এবং মাইচপাড়া।

আসলে মহিষকাটা মন্দিরটি একটি মঞ্চ। সেই মঞ্চ থেকে দেবী মহিষ কাটা প্রত্যক্ষ করতেন বলে মন্দিরটিকে 'মঞ্চ মাইচ' বলা হয়। আমরা যেমন মন্দিরবিশিষ্ট স্থানকে 'মন্দিরতলা' বলে থাকি, তেমনি 'মঞ্চ-মাইচতলা', সংক্ষেপে 'মাইচতলা' বলা হয়ে থাকে, এবং যে পাড়ায় 'মঞ্চ মাইচ' প্রতিষ্ঠিত, সেই পাড়াটি 'মাইচপাড়া' নামে আখ্যাত হয়।

জনশ্রুতি—মন্তেশ্বরের উত্তরে খড়ে নদী সংলগ্ন জামডার দিকে যে জলা আছে, সেই জলা থেকে দেবী চামুণ্ডাকে স্বপ্নাদেশে পাওয়া গিয়েছিল। ক্ষীরগ্রামের সন্নিহিত বামুনপাড়া থেকে চোরে নাকি চুরি করে নিয়ে এসে ফেলে দেয়। স্বপ্নাদেশ পেয়ে জনৈক ব্রাহ্মণ জেলেদের ডেকে জল থেকে দেবীকে উদ্ধার করেন। শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী বলেন যে জাল ফেলে দেবীকে উঠিয়ে সেই পুরানো স্মৃতি রোমন্থন করা হয়। চক্রবর্তীরা ৪০ পুরুষ ধরে দেবীর সেবাইত। আর তা যদি হয় তবে প্রতি পুরুষে ২৫ বা ৩০ বছর ধরলে বলা যায়, পালযুগে দেবীর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। কিন্তু এখন দেখতে হবে, এইমত কতটা গ্রহণযোগ্য?

বিনয় ঘোষ বলেছেন যে প্রথমে মেডতলার (পূর্বস্থলী থানার) ভট্টাচার্যদের পূজা ও বলিদান হয়।[১১] কারণরূপে জানা যায় যে মেঢ়তলার ভট্টাচার্যরা চামুণ্ডার ধ্যান তৈরী করে প্রথম পূজার সূচনা করেছিলেন। তাই আজও তাঁদের পূজাই প্রথম নিবেদিত হয়।

এই মেড়তলার ভট্টাচার্যদের পূর্বপুরুষ রাজারাম ঠাকুর। শ্রীযজ্ঞেশ্বর চৌধুরী বলেছেন যে গ্রামটি প্রাচীন হলেও এই গ্রামের প্রসিদ্ধি শুরু হয় রাজশাহী জেলার গুড়নই নিবাসী রাজারাম ঠাকুরের আগমনের ফলে। তিনি কোন সিদ্ধ সাধকের নিকট সাধন মার্গের গূঢ় রহস্য অবগত হন, এবং তাঁর নিকট হতে 'গোপাল' ও 'যাদুয়া' মূর্তি লাভ করে মেড়তলায় প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর বংশধরগণ মেড়তলার ভট্টাচার্য বংশ নামে প্রসিদ্ধ। এই বংশের রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার বর্ধমানের রাজার নিকট হতে মেড়তলা গ্রামের জমিদারি ও ঝাউ-

ভাঙা হতে মাথাপুর পর্যন্ত জলকরের বন্দোবস্ত লাভ করেন। জলকর বন্দোবস্তের জন্য তাঁরা 'জলকর ঠাকুর' নামে খ্যাত ছিলেন। কালাশঙ্করের সময়ে (রাজা চিত্রসেনের সমসাময়িক) যাদুয়ার মন্দির নির্মিত হয়েছিল।[১২] আর তা যদি হয় তবে রাজারামের মেডতলায় আগমন সপ্তদশ শতকের ঊর্ধ্বে নয়। এক্ষেত্রে প্রশ্ন থাকে, দেবীর পূর্বনিবাস যদি বামুনপাড়ায় হয়, দেবী যদি চোরদের দ্বারা অপহৃত হয়ে জামড়ার জলায় নিক্ষিপ্ত হন, এবং তিনি উদ্ধার প্রাপ্ত হয়ে মেড-তলায় ভট্টাচার্যদের দ্বারা প্রথম পূজিতা হন, তবে মন্তেশ্বরের চামুণ্ডার ইতিহাস সপ্তদশ শতকের কি ঊর্ধ্বে নয়? কিন্তু মন্তেশ্বরের চামুণ্ডার পূজাপদ্ধতি এবং লৌকিক আচার অনুষ্ঠান বিশ্লেষণ করলে এই সত্য স্পষ্ট হয় যে মন্তেশ্বরের চামুণ্ডার ইতিহাস এত অর্বাচীন নয়। এখানে চামুণ্ডার একটা পূর্বাপর ঐতিহ্য ছিলই। আর ছিল বলেই নানা বিচিত্র লৌকিক আচার অনুষ্ঠান মন্তেশ্বরের লোক জীবনের সাথে অন্তরঙ্গভাবে জড়িয়ে আছে, যা দুই এক শতকের হতে পারে না। তাই চামুণ্ডার আদিনিবাস যে বামুনপাড়া ছিল, এই তথ্যের ক্ষেত্রে সত্যতা আছে বলে মনে হয় না।

মন্তেশ্বরে আগুরি তথা উগ্র ক্ষত্রিয়রাই চামুণ্ডাদেবীর প্রধান উপাসক। এই সূত্রে অনেকেই প্রশ্ন তুলতে পারেন, যেহেতু আগ্রা অঞ্চল থেকে আগত বলে সম্প্রদায়টি আগরি (আগুরি) নামে খ্যাত হয়, এবং যেহেতু বর্ধমানরাজ ক্ষত্রগুণ-বিশিষ্ট যোদ্ধৃসম্প্রদায়টিকে রাজ্যরক্ষার্থে আগ্রা অঞ্চল থেকে বর্ধমানে নিয়ে আসেন,[১৩] সেহেতু মন্তেশ্বরে চামুণ্ডার ইতিহাসকে কি সপ্তদশ শতকের ঊর্ধ্বে নিয়ে যাওয়া যায়? যদি যায়, তবে মন্তেশ্বরের চামুণ্ডার সাথে কি ঐ সময়ের পূর্বে উগ্রক্ষত্রিয়দের যোগ রাখা সম্ভব? তা যে সম্ভব নয়, তার কারণ সপ্তদশ শতকের শেষভাগে বর্ধমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠা। এক্ষেত্রে বলা যায়, এই রাজবংশ প্রতিষ্ঠা হওয়ার পূর্বেই যে বর্ধমানে আগুরিদের বসতি গড়ে উঠেছিল, তার প্রমাণ রয়েছে কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে, যার রচনাকাল ষোড়শ শতকের শেষ ভাগ। সেখানে মুকুন্দরাম চক্রবর্তী বলেছেন—

আগুরি বসিয়া পুরে আপনার বৃত্তি করে
অনুক্ষণ চিন্তা করে রণ।
করি নানা অস্ত্রশিক্ষা গুরুবিপ্র করে রক্ষা
অনুচিত করে না কথন॥[১৪]

তাছাড়া, আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়ের মতে চতুর্দ্দশ শতকে রচিত 'ব্রহ্ম-বৈবর্তপুরাণে[১৫] 'আগরি' সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। সুতরাং আগুরি সম্প্রদায়কে বর্ধমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠার সাথে, এমনকি পাঠান-রাজ উচ্ছেদকল্পে রাজা তোডর মল্লের বর্ধমানে আগমনের (১৫৭৪-৭৫ খ্রীঃ) সাথেও যুক্ত করা যায় না।

'উগ্রক্ষত্রিয়'দের সম্বন্ধে ডঃ তপেন্দ্রনারায়ণ দাশ বলেছেন "এই সম্প্রদায়ের বাংলাদেশে আগমন ঘটেছে সম্ভবত অশোকের সমকালে। * * অশোকের হাতে গঙ্গারিডিদের পতনের পর অশোকের বংশধর এই উগ্রগণ গঙ্গারিডি কলিঙ্গে (যা প্রাচীন আলোচকদের মতে বর্ধমান) বসতি স্থাপন করেন। ফলে বর্ধমান অঞ্চলে উগ্রক্ষত্রিয়দের প্রাধান্য স্থাপিত হয়।"[১৬] কিন্তু তা যদি সত্য হতো তবে তৎকালীন সাগর মোহনা পর্যন্ত, যে মোহনা মেগাস্থিনিসের ভারতে অবস্থানকালে পিংলার কাছে ছিল[১৭], সেই পর্যন্ত উগ্রক্ষত্রিয়দের বসতি বিস্তার ঘটতো। কারণ, মেগাস্থিনিস স্পষ্টই বলেছেন, "Now the river, which at its sources in 30 stadia broad, flows from north to south, and empties its water into the ocean forming the eastern boundary of Gangaridai."[১৮] অর্থাৎ উত্তর থেকে দক্ষিণে গঙ্গা বইছে, এবং যেখানে গঙ্গা তার জলরাশি সমুদ্রে উজাড় করে দিচ্ছে, সেখানেই সৃষ্টি হচ্ছে গঙ্গারিডি কলিঙ্গের পূর্বসীমা। এখানে গঙ্গারিডি কলিঙ্গের পূর্বসীমা মূলতঃ যেখানে মেদিনীপুর পর্যন্ত প্রসারিত, সেখানে যদি গঙ্গারিডি কলিঙ্গে অশোকের বংশধরগণ বসতি বিস্তার করে থাকতেন, তবে একমাত্র বর্ধমানেই এঁদের বসতি সীমাবদ্ধ থাকত না, মেদিনীপুরেও এঁদের বসতির বিস্তার ঘটত। তাই কলিঙ্গের পতনের পর অশোকের বংশধররূপে বর্ধমানে উগ্রক্ষত্রিয়দের বসতি বিস্তার, এমন মত গ্রাহ্য হতে পারে না।

অন্যদিকে, বর্ধমান জেলার গলসি থানার অন্তর্গত মল্লসারুল গ্রামে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের গোপচন্দ্রের মল্লসারুল তাম্রশাসনে রাজপাদোপজীবী অর্থাৎ রাজকর্মচারীদের উল্লেখ আছে। এদের মধ্যে একশ্রেণীর কর্মচারীর নাম 'অগ্রহারিক'।[১৯] সেই 'অগ্রহারিক' থেকে কেউ কেউ মনে করেছেন যে আগুরি (আগরি) এসেছে। ৺হরিচরণ বন্ধু তাঁর 'রাজপুত ও উগ্রক্ষত্রিয়' গ্রন্থে বলেছেন যে ভাগ্যান্বেষী যুদ্ধোপজীবী রাজপুত ক্ষত্রিয়গণ রাঢ়প্রদেশে 'অগ্রহার' লাভ করে ক্রমশঃ সামন্ত নৃপতি পদে উন্নীত হয়েছিলেন, এবং সেক্ষেত্রে ভব রায়

বলেছেন যে উগ্র ক্ষত্রিয় অর্থাৎ মল্লসারুল তাম্রলেখে উল্লিখিত অগ্রহার।[২০]

ডঃ নীহার রঞ্জন রায় বলেছেন যে কোন কোন ধর্মদেয় বা ব্রহ্মদেয় গ্রাম অগ্রহার নামে অভিহিত হতো। অনুমান হয়, ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে বা রাষ্ট্র কর্মকেন্দ্র হিসাবে কোন কোন অগ্রহার গ্রাম বেড়ে উঠে বড় হতো এবং অন্যান্য গ্রাম অপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করত। অগ্রহার হচ্ছে ধর্মদেয়, ব্রহ্মদেয় ভূমি ; এই ভূমির রক্ষণ-পর্যবেক্ষকের নাম বোধ হয় ছিল আগ্রহারিক।[২১] আর এর সত্যতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে মাজিগ্রাম, ক্ষীরগ্রাম, বড়বেলুন, কুড়মুন, মস্তেশ্বরের মতো উগ্রক্ষত্রিয় প্রধান গ্রামগুলির ধর্মীয় প্রেক্ষাপটের বিশ্লেষণে।

তাম্রশাসনটিতে উল্লিখিত রাজকর্মচারীদের নামগুলির কোন কোনটি পদবিরূপে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যেমন—বিষয়ীপতি>বিষয়ী, দণ্ডনায়ক>নায়েক, কুমারামাত্য>কুমার বা কোঁয়ার, ভুক্তিপতি>ভক্ত, হট্টপতি>হাটি, ইত্যাদি। অন্যদিকে, তাম্রশাসনটিতে উল্লিখিত দু একটি বৃত্তিনাম যে পরবর্তীকালে জাতি-নামে পরিবর্তিত না হয়েছে, তা নয়। যেমন, কোট্টপাল থেকে কোটাল, এবং মহাকায়স্থ থেকে কায়স্থ, তেমনি 'আগ্রহারিক' এই বৃত্তিনামটি সহজভাবেই জাতিনাম আগরি বা আগুরিতে রূপান্তরিত হতে পারে। সুতরাং ভব রায় যে বলেছেন, উগ্রক্ষত্রিয় অর্থাৎ মল্লসারুল তাম্রলেখে উল্লিখিত অগ্রহার[২২], বা আগ্রহারিক, এই মতকে সমর্থন করা যায়। এক্ষেত্রে প্রশ্ন থাকে, 'আগ্রহারিক' যদি একটি বৃত্তি সূচক উপাধি হয়, এবং 'আগ্রহারিক' থেকে যদি জাতিনাম আগুরি (আগরি) এসে থাকে, তবে সেই 'আগুরি' জাতি কেন একটি অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকল ? এক্ষেত্রে বলা যায়, মল্লসারুল তাম্রলেখটি প্রকৃতপক্ষে ছিল আঞ্চলিক শাসনব্যবস্থার কর্ম বিন্যাসের একটি বিশ্বস্ত দলিলস্বরূপ। আর সেই দলিলের প্রমাণেই বলা যায়, খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে বর্ধমানে 'আগ্রহারিক' নামে এক কর্মচারী গোষ্ঠীর অস্তিত্ব ছিল, এবং কালক্রমেই তাঁরা জাতিগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছিলেন। সেক্ষেত্রে যেহেতু তাঁরা ব্রহ্মদেয় ভূমির রক্ষণ-পর্যবেক্ষণের দায়িত্বে ছিলেন, সেইহেতু কালক্রমে তাঁরা কৃষিজীবী সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছিলেন। এক্ষেত্রে প্রশ্ন থাকে, তাই যদি হবে, তবে তাঁদের জাতি নামের সাথে 'ক্ষত্রিয়' যুক্ত করা হচ্ছে কেন, আর সেই ইঙ্গিতই বা মুকুন্দরাম চক্রবর্তী দিচ্ছেন কেন ? এক্ষেত্রে বলা যায়, উনবিংশ শতাব্দীর শেষে বৃহৎ বঙ্গে কায়স্থ, সুবর্ণ বণিক, মাহিষ্য, আগুরি প্রমুখ বহু জাতির মধ্যে ১৮৯০-৯১ খ্রীষ্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্টকে

কেন্দ্র করে যে সামাজিক আন্দোলনের বিকাশ হয়, সেই আন্দোলনের সূত্রেই 'ক্ষত্রিয়' যুক্ত করা হয়। রাঢ় সংস্কৃতির গবেষক ডঃ পঞ্চানন মণ্ডলেরও মতে 'আগরি' বর্ণাশ্রমী ক্ষত্রিয় নন।[২৩] তাঁরা যদি প্রকৃতই ক্ষত্রিই হতেন, তবে তাঁদের মধ্যে শাসক বা রাজার অস্তিত্ব থাকত। কিন্তু "আগরি বা উগ্র ক্ষত্রিয়রা এই অঞ্চলের প্রধান শাসক বা রাজা ছিলেন কোনদিন এমন রাজবংশেরও কোন ইতিহাস এখনও অনাবিষ্কৃত।"[২৪] আর তাঁরা যে ক্ষত্রিয় ছিলেন না, তার ইঙ্গিত রয়েছে মল্লসারুল তাম্রলেখে। সেখানে হট্টপতি নামে এক শ্রেণীর কর্মচারীর উল্লেখ রয়েছে, যাঁরা ছিল হাটের তত্ত্বাবধায়ক, সেই 'হট্টপতি' থেকে এসেছে হাটি, যা আগুরি সম্প্রদায়ের একটি পদবি। আবার "কুমারামাত্য বোধ হয় বংশানুক্রমে প্রত্যক্ষভাবে রাজা বা রাজকুমার কর্তৃক নিযুক্ত এবং তাঁহাদের অধীন কর্মচারী।"[২৫] আর সেই কুমারামাত্য থেকে এসেছে কোঁয়ার, যা আগুরি সম্প্রদায়ের আর এক পদবি। এ থেকে বলা যায় যে তাঁরা যুদ্ধব্যবসায়ী বা ক্ষত্রিয় ছিলেন না। এঁরা বর্ধমান অঞ্চলেরই ভূমিপুত্র এবং সুদীর্ঘকাল ধরেই এই জনগোষ্ঠী জমিকে কেন্দ্র করেই বিবর্তিত হয়েছে।

এক্ষেত্রে প্রশ্ন থাকে, যদি তাই-ই হয়, তবে মুকুন্দরাম কেন তাঁদের বৃত্তিরূপে রণবিদ্যার কথা বলেছেন? এক্ষেত্রে বলা যায়, কবিকঙ্কণ চণ্ডীর বসুমতী সংস্করণে কিন্তু মুকুন্দরাম তাঁদের রণবিদ্যার চিত্র অঙ্কিত করেন নি। সেখানে সকল জাতির বৃত্তির উল্লেখ করলেও আগরি জাতির বৃত্তি সম্বন্ধে নিরব থেকেছেন। সেখানে আগরি জাতি সম্বন্ধে এইমাত্র বলেছেন—

আগরি নিবসে পুরে আপনার বৃত্তি করে
অনুচিত না করে কখন॥[২৬]

এখানে কি যে বৃত্তি তার উল্লেখ নেই। সেই উল্লেখ রয়েছে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে। সুতরাং এখানে প্রক্ষিপ্তের প্রশ্ন একটা থেকে যায়। আর যদি নাও থাকে, তবে সেক্ষেত্রে বলা যায়, বাগ্দী সম্প্রদায়, যাঁরা বর্গক্ষত্রিয় নামে পরিচিত, যাঁরা রণনিপুণ জাতিরূপে আখ্যাত হয়েছিলেন, তাঁরাও কিন্তু মূলতঃ ছিলেন মৎসশিকারী জাতি।[২৭] এই জাতিরও দুটি শাখা আছে—মাঝি ও দণ্ড মাঝি। শ্রীমাণিকলাল সিংহ বলেছেন যে বাগ্দী জাতির এই দুটি শাখা দাঁড় টেনে, লগি বা বৈঠা ঠেলে খেয়া পারাপার করে বলেই এরা বাগ্দী-মাঝি এবং দণ্ড-মাঝি নামে অভিহিত।[২৮] সুতরাং

এঁরা বর্ণাশ্রমী ক্ষত্রিয় ছিলেন না, এবং সকলেই যে যুদ্ধের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাও নয়। তাঁরা মধ্যযুগে রাঢ়-বঙ্গের সামন্ত রাজাদের সৈন্য বিভাগে কাজ করতেন। তাঁদের মধ্যে প্রচলিত রাউত, প্রতিহার, সর্দার, দিগর, রায় ইত্যাদির পদ পদবীগুলি তারই স্বাক্ষর বহন করে।[২৯] আর তাঁদের রণনিপুণতার চিত্র মুকুন্দরামও চিত্রিত করেছেন। অন্যদিকে, আগুরিরাও মধ্যযুগে রাঢ়-বঙ্গের সামন্ত রাজাদের সৈন্য বিভাগে কাজ করতেন। তবে উভয় সম্প্রদায়েরই সমগ্র অংশ নয়। সেক্ষেত্রে বাগদীরা যেমন মূলতঃ ছিলেন মৎস্য শিকারী জাতি, তেমনি এক প্রভাবশীল কর্মচারীগোষ্ঠী মূলতঃ কৃষিজীবীতে পরিণত হয়েছিলেন। আর এর ইতিহাসও সুদীর্ঘকালের। আগ্রহারিক (আগরি)—এর মতই কায়স্থও ছিল একটি বৃত্তিসূচক নাম। ডঃ অতুল সুর বলেছেন যে বস্তুত নবম ও দশম শতাব্দী থেকেই কায়স্থরা নিজেদের স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে গণ্য করতে শুরু করেছিলেন।[৩০] আর চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে রচিত ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে প্রথম 'আগরি', এই জাতিনামের উল্লেখ পাচ্ছি। সুতরাং নবম-দশম থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী কোন সময়ে আগ্রহারিকরা আগরিরূপে স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে গণ্য করতে শুরু করেছিলেন। তাই সামগ্রিক বিচারে বলা যায়, মন্তেশ্বরে দেবী চামুণ্ডার ইতিহাসেয় সূচনা সপ্তদশ শতকে নয়, এর ইতিহাস পালযুগের হওয়াও অসম্ভব নয়। তবে এক্ষেত্রে প্রশ্ন থাকে, মন্তেশ্বরেই যদি দেবী চামুণ্ডার আদি বাসস্থান হয়েই থাকে, তবে জামড়ার জলা থেকে দেবী চামুণ্ডার উদ্ধারের যে জনশ্রুতি, তার মধ্যে কি কোন সত্যতা নেই ? যদি থাকে, তবে কখন এবং কেনই বা তিনি জলায় নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন ?

এক্ষেত্রে আমরা তুর্কী-পাঠানযুগের সামরিক অভিযানগুলির কথা স্মরণ করতে পারি। সেক্ষেত্রে দেখা যায়, মন্তেশ্বরের নিকটবর্তী রাইগ্রাম পাঠানযুগে সামরিক অভিযানে বিধ্বস্ত হচ্ছে। আবার মন্তেশ্বরের সন্নিকটস্থ শুশুনি গ্রামের তারাক্ষ্যা দেবীকে গ্রামস্থ একটি পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধারের সময় উদ্ধার করা হয়। জনশ্রুতি—কালাপাহাড়ের (১৫৬৫—১৫৭৬ খ্রীঃ) ভয়ে নাকি মূর্তিটিকে জলে ডুবিয়ে রাখা হয়। সুতরাং এক্ষেত্রেও কোন বিধর্মীয় অভিযানকালে পবিত্রতা রক্ষার জন্য দেবীকে পার্শ্ববর্তী গ্রামের জলায় ডুবিয়ে রাখা হয়েছিল বলে অনুমান করা যায়। আর এই অনুমানের পক্ষে যথেষ্ট কারণ রয়েছে। কারণ, বর্ধমানের আগুরি সম্প্রদায়ের উপরও বিধর্মীয় অভিযানের

অভিঘাত নেমে এসেছিল। এ প্রসঙ্গে ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "বর্ধমানের আগুরি-সম্প্রদায় কারারুদ্ধ হইয়াও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নাই, ফলে অনেকেই নিহত হইয়াছিল।"[৩১] তবে এক্ষেত্রে আমার কারণরূপে ঔরঙ্গজেবের সেই ফরমানের কথা অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়, যে ফরমানে তিনি পরগণাতে পরগণাতে হিন্দুর দেবমূর্তি ভগ্ন করবার আদেশ প্রচার করেছিলেন। শ্রীযদুনাথ সরকার প্রবাসী পত্রিকার ১৩২০ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত 'পূর্ববঙ্গ' নামক প্রবন্ধে বলেছেন "হিজরী ১০৭৯ সালে বাদশাহ যে ভারত ব্যাপিয়া দেবমূর্তি ভাঙ্গার আদেশ দেন, সেই সময়ের ফারসী ইতিহাসে তাহার ইঙ্গিত আছে।"[৩২] ডঃ অতুল সুর বলেছেন যে ঔরঙ্গজেবের আদেশে কাশী বিশ্বনাথের মন্দির, মথুরার কেশবরাই মন্দির, উড়িষ্যা, যোধপুর, উদয়পুর প্রভৃতি অঞ্চলে বহু হিন্দু মন্দির ধ্বংস করা হয়েছিল।[৩৩] অবশ্য এক্ষেত্রে একটি বিপরীতধর্মী কথা এসে পড়ে, যে কথা পূর্বকথার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কথাটি হল—ঔরঙ্গজেব বাদশাহ সম্ভবতঃ মাধবের সেবার জন্য বহুভূমি রামজীবন মৌলিককে দান করেছিলেন। সেই দলিলে "বাদসাহ আলমগির ১০৯১" অঙ্কিত সিলমোহর দেওয়া আছে।[৩৪] আর তা যদি হয়, তবে পূর্বকথার সাথে সামঞ্জস্য থাকে না। কিন্তু পাট্টাখানা অর্দ্ধছিন্ন হওয়ায় কি নিমিত্ত সম্রাট ঔরঙ্গজেব রামজীবন মৌলিক চৌধুরীকে সুলতান প্রতাপাস্তর্গত মৌজা প্রদান করেন, তা জানা যায় না।[৩৫] তাছাড়া, দলিলটি বিশ্বাসযোগ্য নয়। কারণ, ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু হয় ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে। আর দলিলটিতে ছাপ রয়েছে ১০৯১ হিজিরার, অর্থাৎ ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দের।

ঔরঙ্গজেব ১০৭৯ হিজরী অর্থাৎ ১৭০১ খ্রীষ্টাব্দে ভারত ব্যাপিয়া দেবমূর্তি ভাঙ্গার ফরমান জারি করেন। এই সময় বাংলার দায়িত্বে ছিলেন মুর্শিদকুলি খাঁ। আর ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু হচ্ছে ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে। এই সময়ের মধ্যে তাঁর নির্দেশ যে কঠোরতার সাথে পালন করা হয়েছিল তার প্রমাণ রয়েছে বাংলায় মন্দির প্রতিষ্ঠার সময়কালের মধ্যে। পশ্চিম বাংলার কোন জেলায় ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে অন্ততঃ ১৭১৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কোন মন্দির প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না। বাঁকুড়ার বৈতলের লাহা পরিবারের রাধাদামোদরের পরিত্যক্ত মন্দিরটির নির্মাণ কার্য ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে শেষ হয়েছিল। মেট্যালার বাবুপাড়ায় লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭১৮ খ্রীষ্টাব্দে। এর মধ্যে কোন মন্দির প্রতিষ্ঠিত

হয়েছিল কিনা, তা জানা নেই। শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি'তে তার নিদর্শন পাওয়া যায় না। বর্ধমান জেলার রাণাপাড়ার শ্রীরাধাগোবিন্দের মন্দিরটি নির্মিত হয় ১৬৯২ খ্রীষ্টাব্দে। ১৭১৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কিনা জানা নেই। বীরভূমের কেন্দুবিল্বের শ্রীরাধাবিনোদ মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেখানেও ১৭১৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কিনা জানা নেই। নদীয়ার ক্ষেত্রেও সেই একই কথা। এক্ষেত্রে কিন্তু মুর্শিদকুলী খাঁকে সম্পূর্ণ দায়ী করা যায় না। কারণ, মুর্শিদকুলী খাঁর মৃত্যু হয় ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু ১৭১৮ খ্রীষ্টাব্দে মন্দির প্রতিষ্ঠা হতে দেখা যাচ্ছে। এ থেকে অনুমান করা যায়, মুর্শিদকুলী খাঁ ঔরঙ্গজেবের ফরমানকে নিষ্ঠার সঙ্গে পরগণায় পরগণায় প্রচার করার ব্যবস্থা করেছিলেন। তাই হয়তো ইতঃস্তত বিক্ষিপ্তভাবে বাংলার যত্রতত্র ভগ্ন দেব-মূর্তির অস্তিত্ব দেখা যায়। সেক্ষেত্রে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু পর্যন্ত মুর্শিদকুলীরই দায় থাকছে, তার পরেও মন্দির নির্মাণ বন্ধ থাকছে হয়তো ফরমান জনিত ভয়ের কারণেই একটা বিশেষ সময় পর্যন্ত। আর এই সময়েই হয়তো দেবী চামুণ্ডাকে জলায় পরিত্যাগ করা হয়েছিল দেবীর পবিত্রতা রক্ষার জন্য, বা দেবীসহ পলায়নের সময় দেবীকে জলায় নিক্ষেপ করা হয়েছিল। সেই স্মৃতিকে কয়েক বছরের জন্য মন্তেশ্বরের ব্রাহ্মণরা ধরে রেখেছিলেন। সেই স্মৃতির সূত্র ধরে স্বপ্নদর্শনের মাধ্যমে তাঁরাই দেবীকে উদ্ধার করেন। স্বল্প সময়ের জন্যই মন্তেশ্বরের জনজীবন থেকে চামুণ্ডাকে আশ্রয় করে যে সব লোক সংস্কার গড়ে উঠেছিল, তা হারিয়ে যায় নি।

১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে কীর্তিচন্দ্র রায়ের মৃত্যু হয়। সম্রাট মহম্মদ শাহের প্রদত্ত ফরমান বলে চিত্রসেন রায় প্রথম রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন, এবং বর্ধমানের সিংহাসনে বসেন। তবে পিতার বর্তমানেই ১৭২৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইন্দ্রায়ণ ও মণ্ডলঘাট পরগণার জমিদারি প্রাপ্ত হন। তাঁরই সমসাময়িক কালে কালীশঙ্কর মেড়তলার যাদুয়ার মন্দির নির্মাণ করেন। সুতরাং যাদুয়া মন্দির নির্মাণের কালসীমা ১৭২৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে হতে পারে। আর রাজারামের মেড়তলায় আগমন সপ্তদশ শতকের শেষার্ধ হতে পারে। তিনি গোপাল ও যাদুয়া মূর্তি লাভ করে সিদ্ধ সাধক রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাই মেড়তলার ও দোনা গ্রামের ভট্টাচার্য পরিবার ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা দেবীর

পূজার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। এই দোনা গ্রামের ভট্টাচার্যগণ যেমন তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধ ছিলেন, তেমনি মেড়তলার ভট্টাচার্যবংশও তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধ ছিলেন। তাই চামুণ্ডাদেবীকে যখন উদ্ধার করা হয়, তখন দেবীকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ভট্টাচার্য বংশীয়দের ডাকা হয়েছিল। তাঁরাই আবার নূতন করে পূজাপদ্ধতি ও ধ্যান রচনা করেন। এই সময়টা অনুমিত হয় ১৭০৫ খ্রীষ্টাব্দের পরেই কোন এক সময়। এরপর ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে মঞ্চমাইচ এবং ভোগগৃহ নির্মিত হয়। দেবীর মাহাত্ম্য বৃদ্ধি হলে বর্ধমানের রাজারাও এই পূজার সাথে যুক্ত হয়ে পড়েন। তবে বর্গীর আক্রমণ এবং ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বর্ধমানের অর্থনীতির উপর এমনভাবে আঘাত করেছিল, কৃষিক্ষেত্র এবং লোকালয় একাকার হয়ে শ্মশানভূমিতে পরিণত হয়েছিল, পুরানো জমিদার শ্রেণীর পতন শুরু হয়েছিল, গ্রামের পর গ্রাম লোকবসতি শূন্য হয়ে পড়েছিল, পুরানো সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলিও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল, তাতে বাংলার অন্যান্য মন্দিরের মতো এ মন্দিরও নিজেকে অক্ষত রাখতে পারে নি। কালক্রমে জীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। আর তারই প্রমাণ রয়েছে মহিষকাটা মন্দিরের উভয় পার্শ্বের ঢিবি ও ভোগ মন্দিরের পাদদেশে ছড়ানো ভগ্নাবশেষের মধ্যে।

বৈশাখী শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে চামুণ্ডা পূজার সূচনা হয়। তার আগের দিন খাঁ পুকুরে জাল ফেলে মাছ ধরা হয়। ঐ দিনই রাত বারটার সময় দেবীকে বিবাহের পর ডুবিয়ে রাখা হয়। এই প্রসঙ্গে সাক্ষাৎকারে শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বললেন যে এর অর্থ জাল ফেলে পুরানো স্মৃতি রোমন্থন করা। কিন্তু জাল ফেলা হচ্ছে পূর্বে, তারপর দেবীকে খাঁ পুকুরে ডুবিয়ে রাখা হয়। সুতরাং এখানে স্মৃতি রোমন্থনের ব্যাপার থাকছে না।

খাঁ পুকুরে একবার মাত্র জাল ফেলা হয়। সেই জালে যা মাছ ওঠে, তা নিয়ে আসা হয় মঞ্চমাইচ তলায়। সেখানে গ্রামবাসীদের সাথে উপস্থিত থাকেন গ্রামের পাঁচ প্রধান—মাইচপাড়া, উত্তরপাড়া ও জোকারিপাড়ার তিন রায়, ধাওড়াপাড়ার মণ্ডল এবং হাজরাপাড়ার হাজরা। এঁদের উপস্থিতিতে পুরোহিত সেবাইতদের প্রত্যেকের হাতে মৎস্য দিয়ে সকলকে জানিয়ে দেন পূজার ক্ষেত্রে কার কি দায়িত্ব। এক্ষেত্রে ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যাদেবীর পূজার ক্ষেত্রে 'গুয়াডাকা' অনুষ্ঠানটির কথা স্মরণ করা যায়।

আমরা জানি, লোকসংস্কারে মাঙ্গল্য অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে 'পানসুপারী'র যেমন

মূল্য আছে, তেমনি মূল্য আছে মাছের। তাই ক্ষীরগ্রামে যেমন পানসুপারী দিয়ে উৎসবের সূচনা করা হয়, এখানে তেমনি মাছ দিয়ে।

এক্ষেত্রে প্রশ্ন থাকে, দেবী চামুণ্ডাকে কেন তবে খাঁ পুকুরে ডুবিয়ে রাখা হয়? এর উত্তরে বলা যায়, একমাত্র মন্তেশ্বরের চামুণ্ডাকেই জলে ডুবিয়ে রাখা হয় না। ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যাকে, সিমুলিয়ার মহিষমর্দিনীকে, কামালপুরের চন্দ্রমুখীকে এবং বীরভূমের কঙ্কালীকেও জলে ডুবিয়ে রাখা হয়। এক্ষেত্রে আমরা কবি কৃত্তিবাসের কথা স্মরণ করতে পারি। তিনি 'শ্রীরামচন্দ্রের কালিকার প্রতি স্তবে' কালিকাকে 'মহিষমর্দিনী' বা উগ্রচণ্ডা' রূপে স্তব করেছেন, এবং 'অহিরাবণ-বধ'-এ কালিকা এবং যোগাদ্যাকে এক করে দেখেছেন।[৩৬] এঁকে ভদ্রকালী বিশ্বাসে ও ধ্যানে পূজিতা হতে দেখা যায়।[৩৭] আবার জনশ্রুতি, ক্ষীরগ্রামের রাজা হরিদত্তকে উগ্রচণ্ডা মূর্তিতে স্বপ্নে দেখা দেন। তাছাড়া, মন্তেশ্বরের চামুণ্ডাও ভদ্রকালীরূপে পূজিতা হন। আর এই ভদ্রকালী যোগাদ্যা দেবীর উদ্দেশ্যে অহিরাবণ-বধের পর তাঁর উদ্দেশ্যে রানী বলেছিলেন—

"কি দোষেতে মহীরে ভাবিল দেবী পর?
আগে গিয়া প্রতিমা ডুবায়ে দিব জলে।"[৩৮]

সেই ডুবায়ে দেওয়া মহীরাবণের পূজিতা দেবী ভদ্রকালী বা যোগাদ্যাকে রামচন্দ্রের আদেশে মর্তদেশে প্রতিষ্ঠা করা হয়, যা রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডে মহীরাবণবধ পালায় বর্ণিত আছে। তাছাড়া, কীর্তিবাসের 'যোগাদ্যা বন্দনা' হতে জানা যায় যে দেবীর আদেশে শ্রীরামচন্দ্র হনুমানকে ক্ষীরগ্রামে দেবীকে প্রতিষ্ঠার জন্য আজ্ঞা করেন। সুতরাং দেবী চামুণ্ডার মতো দেবীরা যেহেতু উগ্রচণ্ডা বা ভদ্রকালী, সেহেতু এঁদের পরিকল্পনায় সেই স্মৃতিকে যে ধরে রাখা হয়েছে, তা অনুমান করা যায়। তবে এঁরা যে মূলতঃ জলদেবী, বিশালাক্ষীর স্তুতিতে তার ইঙ্গিত রয়েছে। সেখানে বিশালাক্ষীর ধ্যানে বলা হয়েছে 'সিন্ধু জলদেবী'।[৩৯] আর এই জলদেবীগণের অস্তিত্ব অথর্ব বেদেও রয়েছে। ঐ বেদের ১ম কাণ্ড: ১ম অনুবাকের ৫ম সূক্তে বলা হয়েছে—"বরণীয় ধনের নিয়ন্ত্রী হে জলদেবীগণ, আমি তোমাদের কাছে শান্তিপ্রদ ঔষধ (অমৃত) প্রার্থনা করছি।" আর ঐ জলদেবীগণকে ১ম কাণ্ড: ১ম অনুবাকেই বলা হয়েছে—"মাতৃস্থানীয় জলাধিষ্ঠাত্রী দেবীগণ"।[৪০] আর এই সূত্রেই মন্তেশ্বরের সপ্তমাতৃকা চামুণ্ডাকে জলধিষ্ঠাত্রী দেবী বলা যায়। কারণ, তাঁর মাথায় যে ইন্দ্রাণী ও

সরস্বতী (ব্রহ্মাণী) রয়েছেন, তাঁরাও যে জলধিষ্ঠাত্রী দেবী, তার ইঙ্গিত রয়েছে অথর্ব বেদের ৩য় কাণ্ড : ৪র্থ অনুবাকের ৫ম সুক্তে। তাই জলাধিষ্ঠাত্রী চামুণ্ডাকে জলে ডুবিয়ে আবার জল থেকে তুলে পূজা করা হয়।

শ্রী প্রণবেশ চক্রবর্তী বলেছেন যে প্রকৃতপক্ষে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন থেকেই এখানে এমন একটি প্রথা অনুসৃত হয়ে আসছে, যা সংস্কৃতি-গবেষকদের মধ্যে বিস্ময়-মিশ্রিত কৌতূহল উদ্রেক করে। সেটা হচ্ছে 'ময়ূর নাচ'। প্রতি বছর অক্ষয় তৃতীয়ার দিন থেকে অষ্টমী তিথি পর্যন্ত প্রতিদিন ভোরবেলায় খোল ও মৃদঙ্গ বাজিয়ে ময়ূরতলায় গিয়ে ভক্তরা সাতপাক প্রদক্ষিণ করেন। তারপর চামুণ্ডার বড় মন্দিরে এসে শোলার তৈরী (ঠিক মুকুটের মতো) 'ময়ূর' নিয়ে সাত বার মন্দির প্রদক্ষিণ করেন। গ্রামের মাইচপাড়ার 'হাজরা' মহাশয়রা মাথায় করে ময়ূর নিয়ে আসেন, এবং বায়েনরা খোল বা মৃদঙ্গ বাজান। বায়েনরা এ ভাবে প্রতি বছর বাজিয়ে চলেছেন পুরুষানুক্রমে।[৪১]

এই 'ময়ূর নাচ' ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা পূজারও একটি অঙ্গ। এ প্রসঙ্গে শ্রীযজ্ঞেশ্বর চৌধুরী বলেছেন যে ২৭শে বৈশাখ বৈকালে ক্ষীরগ্রামে "মোরনাচ" যা অপভ্রংশে—"ময়ূর নাচে" পরিণত হয়েছে। এই ময়ূর নাচকে তিনি 'মেড়য়া' (বলিকৃত নর) নাচ বলে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন।[৪৩] কিন্তু 'ময়ূর'-এর অপভ্রংশে 'মোর' হতে পারে, কিন্তু 'মোর'-এর অপভ্রংশে 'ময়ূর' হয় না। আমরা প্রাচীন পদাবলী সাহিত্যে 'ময়ূর'-এর ব্যবহার 'মৌর' পাচ্ছি।[৪৩] সেই 'মৌর' থেকে 'মোর' হয়। সুতরাং 'মোর নাচ' আসলে 'ময়ূর নাচ'ই। এই ময়ূর নাচকে আমরা দশমীকৃত্যের অন্তর্গত শবরোৎসবের 'শবর নাচ' বলতে পারতাম। কারণ, দশমীর দিন শবরেরা ময়ূর পুচ্ছ পরিধান করে নেচে থাকে। কিন্তু মন্তেশ্বরের এই 'ময়ূর নাচ'কে 'শবর নাচ' বলে স্বীকার করে নেওয়া যেত, যদি তার সাথে দশমীকৃত্যের যোগ থাকত। কিন্তু এই অনুষ্ঠান অক্ষয় তৃতীয়া থেকে নবমী পর্যন্ত ৭ দিন চলে। এক্ষেত্রে প্রশ্ন থাকে, 'ময়ূর নাচ' যদি 'শবর নাচ' না হয়, তবে এ নাচের তাৎপর্য কি?

এক্ষেত্রে বলা যায়, এই নাচ মূলতঃ মুখোশ নাচের সমগোত্রীয়, যা লোক-সংস্কৃতির এক অঙ্গ। আর এই নাচের মাধ্যমে বিশেষ এক অভিনয়কে ব্যক্ত করা হয়।

পূর্বেই বলেছি, চামুণ্ডা মূলতঃ জলাধিষ্ঠাত্রী জলদেবী। আর তাঁর সন্তানগণ মূলতঃ কৃষিজীবী ও মৎসজীবী। পূর্বেই দেখানো হয়েছে যে উগ্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায় মূলতঃ এক প্রভাবশালী কর্মচারীগোষ্ঠী হলেও তাঁরা কৃষিজীবীতে পরিণত হয়েছিলেন। আর বাগদী সম্প্রদায় মূলতঃ মৎস্যশিকারী গোষ্ঠী, এবং তাঁরা কৃষির সাথেও যুক্ত। আর জালিক কৈবর্তরা মৎস্যজীবী গোষ্ঠী। এঁদের আকাঙ্ক্ষা পর্যাপ্ত বৃষ্টি। লোক বিশ্বাস—তা জলদেবীর করুণার উপর নির্ভর করে। আর সেই বৃষ্টির প্রার্থনা গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে হাজরা মহাশয়রা ময়ূর নাচের মাধ্যমে অভিনয় করে ব্যক্ত করেন।—হে জলদেবী, তুমি এসো। তোমার আগমনে আকাশে মেঘের সঞ্চার হোক, এমন করেই ময়ূর পেখম তুলুক। তোমার করুণায় বৃষ্টিধারা নেমে আসুক।—এই প্রার্থনা বর্ষার এবং কৃষিকর্মারম্ভের প্রাক্ মুহূর্তে, বৈশাখ মাসের শুভ অক্ষয় তৃতীয়ায়।

অন্যদিকে, 'ময়ূর নাচে'র আর এক গভীর তাৎপর্য আছে বলে মনে হয়। আর এই মনে হওয়ার কারণ—মঙ্কমাইচ মন্দিরের দেওয়ালে মূর্ত্তিত এক ময়ূর মূর্তি। আর নাট নন্দিরের কার্নিসের নীচে অঙ্কিত ময়ূরের মুখে সাপের চিত্র। ঐ মূর্তি ও চিত্র অর্বাচীন কালের শিল্পকাজ হলেও তা প্রাচীন ঐতিহ্যের সূত্রেই এসেছে বলে মনে হয়। সেক্ষেত্রে ময়ূরের দেওয়ালে মূর্তিত পেখম ছড়ানো ময়ূরের মূর্তিটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন যে নানা দেবভাবনা ও রূপকল্পনা নানা দিগ-দেশাগত কাহিনীর সঙ্গে মিশে গিয়ে মনসামঙ্গলে মনসাদেবী রূপে বিচিত্র মূর্তি পরিগ্রহ করেছে। এতে বহু উপাদান আছে। এর মধ্যে একটি শেষবৈদিক কুমারী ও ময়ূরী এবং পরবৈদিক বিষ নাশিনী মায়ূরী বিদ্যাধরী। আবার বৌদ্ধ মহাযান-মতে মহামায়ূরী দেবী বিষনাশনের আরোগ্যের এবং বিদ্যার দেবতা। এলোরায় ছয় নম্বর গুহার দ্বিতলে বারান্দার এক ধারে মহামায়ূরীর যে মূর্তি আছে তাতে দেবী, বিদ্যা (অর্থাৎ পুথি ও পাঠক) এবং পেখমধরা ময়ূর একসঙ্গে পাই।[৪৪] আর এ থেকে বলা যায়, যিনি শেষ বৈদিকে কুমারী ও ময়ূরী, তিনিই পরবৈদিকে বিষ নাশিনী মায়ূরী। আর তিনিই বোধ হয় বৌদ্ধদের মহামায়ূরী। তাঁর প্রতীক পেখম ধরা ময়ূর। অন্যদিকে, মন্ত্রেশ্বরে চামুণ্ডার ধ্যান মন্ত্রে চামুণ্ডাকে 'অক্ষতযোনিং' বলা হয়েছে, যার অর্থ কুমারী। সেই অর্থেই তিনি ময়ূরী বা মায়ূরী বিদ্যাধরী। আর সেই ইঙ্গিতই দিচ্ছে মঙ্কমাইচের দেওয়ালে

মূর্তিত পেখম ছড়ানো ময়ূর, আর ময়ূর নাচ। ময়ূর নাচের মধ্য দিয়ে দেবীর প্রকৃত স্বরূপকে প্রকাশ করা হয়।

বৈদিক যুগে একুশটি ময়ূরী এবং সপ্তস্বসাও মানুষকে বিষমুক্ত করে বলে মনে করা হতো।[৪৫] এই সপ্তস্বসা প্রকৃতপক্ষে সপ্ত মাতৃকা। এই সপ্তমাতৃকার সাথে একুশটা ময়ূরীর যোগ আছে বলে মনে করা যেতে পারে। সুতরাং সেদিক থেকেও মন্তেশ্বরের চামুণ্ডার উৎসবে 'ময়ূর নাচে'র যোগকে অস্বীকার করা যায় না। কারণ, মন্তেশ্বরের চামুণ্ডাও মূলতঃ সপ্তমাতৃকা চামুণ্ডা।

এখানে ময়ূর নিয়ে হাজরারা ভোরবেলায় সাতবার মন্দিব প্রদক্ষিণ করেন। ময়ূর নাচ চলে সাত দিন। দেবী চামুণ্ডার মাথায় হাজরারা সাত কলসি জল ঢালেন। সুতরাং সপ্তমাতৃকা চামুণ্ডার সাত, সাতবার মন্দির প্রদক্ষিণ, ময়ূর নাচ সাতদিন, সাত কলসি জল ঢালা, ঠাকুর বাচের সময় সাতবার যাওয়া আসা—এই পাঁচ সাতের মধ্যে একটা যোগসূত্র আছে বলে মনে হয়।

অধিবাসের দিন মাছ বিতরণের পর দুই এঁড়ে জুড়ে 'হলকর্ষণ' অনুষ্ঠান হয়। ক্ষীরগ্রামেও 'হলকর্ষণে'র অনুষ্ঠান আছে, যার নাম 'হল-লাঙ্গল'। আবার শিবের গাজনে কোথাও কোথাও দুই ব্যক্তি হালের বলদের অভিনয় করে জোয়াল কাঁধে নিয়ে টানে।[৪৬] এখানে গাজনের ক্ষেত্রে থাকে লৌকিক শিবের অভিনয়।

ক্ষীরগ্রামে চৈত্র সংক্রান্তির দিন যজ্ঞকুণ্ড থেকে হোমের জলভরা ঘট এনে যোগাদ্যার মন্দিরের বাইরে পূর্বদিকে স্থাপন করা হয়। সেই ঘটের জল ফুল বেলপাতা কলা আম্রশাখা তামার কলসিতে ঢেলে রাখা হয়। এই কলসিকে 'ক্ষীরকলসি' বলে। মহাপূজার আগের দিন এই ক্ষীরকলসি নিয়ে গ্রাম প্রদক্ষিণ করা হয়। প্রদক্ষিণকালে তার পশ্চাতে মামা-ভাগনে সম্পর্কীয় দুটি এঁড়ে গরুসহ নতুন হাল-লাঙ্গল অনুগমন করে।[৪৭]

এখন প্রশ্ন, এই 'ক্ষীরকলসি' কি? এই 'ক্ষীরকলসি' প্রকৃতপক্ষে মন্থনজাত অমৃত, যাকে যজ্ঞকুণ্ডে রক্ষা করা হয়। আর এই 'ক্ষীরঘটে'র উল্লেখ রয়েছে চতুর্দশ শতাব্দে রচিত জিনপ্রভসুরির রত্নবাহপুরকল্পে।

এখানে অমৃতভাণ্ড হচ্ছে 'জলভরা ঘট'। তাকে ফুল বেলপাতা কলা আম্রশাখা দিয়ে সঞ্জীবিত করে যজ্ঞস্থানে রাখা হয়। ওটিই 'ক্ষীরকলসি'। এখানে 'ক্ষীর' অর্থে যজ্ঞীয় জল। মৃণাল হোড় বলেছেন যে যজ্ঞীয় জল বলতে

বর্ষার জলই অমৃত। এই অমৃত প্রকৃতপক্ষে দৈবী সোমরস অর্থাৎ বৃষ্টির জল।[৪৮] এখানে এই অভিনয় করা হয় যে জলাধিষ্ঠাত্রী জলদেবীর করুণায় মেঘ বৃষ্টি রূপ অমৃত (ক্ষীর) বর্ষণ করবে। মাঠে মাঠে হাল চলবে। এখানেও শিবের কৃষিকার্যের একটা অস্পষ্ট চিত্র ধরা পড়েছে। 'মামা-ভাগনে' প্রকৃতপক্ষে শিব ও নারদের প্রতি যেন ইঙ্গিত করে।

অন্যদিকে, মন্তেশ্বরের জলাধিষ্ঠাত্রী জলদেবীর (চামুণ্ডার) কাছে অভিনয়ের মাধ্যমে এই প্রার্থনা করা হয় : হে জলাধিষ্ঠাত্রী জলদেবী, তুমি এসো। তোমার করুণায় মেঘের সঞ্চার হবে। অমৃতময় বর্ষা নামবে। মাঠে হাল চলবে।

এরপরেই মাইচপাড়ার হাজরা-বাড়িতে নানা মাঙ্গল্য আচার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে চামুণ্ডার বিবাহ দেওয়া হয় ঐ দুটি ষাঁড়ের সঙ্গে। এখানে চামুণ্ডার বিবাহের বিশেষ এক তাৎপর্য রয়েছে।

আমরা জানি, জলের সাথে সূর্য আর অগ্নির মিলনে জলপূর্ণ মেঘের সৃষ্টি, সেই মেঘ আনে অমৃতরূপ বর্ষা, সেই বর্ষা পৃথিবীকে শস্যবতী করে। তাই জলাধিষ্ঠাত্রী জলদেবীগণকে 'বরণীয় ধনের নিয়ন্ত্রী' বলা হয়েছে অথর্ববেদ-সংহিতার ১ম কাণ্ড : ১ম অনুবাকের ৫ম সূক্তে।

অথর্ববেদে (৪।১।৫।১)এ সূর্যকে 'সহস্রশৃঙ্গবৃষভ' বলা হয়েছে। আর কৃষ্ণযজুর্বেদে (৫।৫।৭।২)-এ অগ্নিকে 'বৃষভ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৪৯] সুতরাং দুই বৃষভ (ষাঁড়) হচ্ছেন সূর্য ও অগ্নি। এঁদের মিলিত সত্তাই যজুর্বেদের যুগে রুদ্র শিব, এবং পৌরাণিক যুগে মহেশ্বর।[৫০] এঁদের সাথেই জলাধিষ্ঠাত্রী জলদেবী চামুণ্ডার বিবাহ দেওয়া হয়। আর সেই বিবাহ দেওয়া হয় জলপূর্ণা এবং শস্যপূর্ণা বসুন্ধরার আকাঙ্ক্ষায়।

চামুণ্ডা জলাধিষ্ঠাত্রী জলদেবী বলেই জলেই অবস্থান। তিনি জল থেকেই উত্থিত হন। তাই অধিবাসের (সপ্তমীর) দিন বিবাহপর্ব সাঙ্গ হলে রাত ১২ টার সময় দেবীকে খাঁ পুকুরে গোপনে ডুবিয়ে রেখে আসা হয়। অষ্টমীর দিন বেলা ১০টা নাগাদ মাইচ পাড়ার রায়েদের বাড়ি থেকে বাদ্যযন্ত্রসহকারে গ্রামবাসীগণ শোভাযাত্রা করে খাঁ-পুকুরের ঘাটে এসে উপস্থিত হন। তখন কিন্তু পুকুরের জলকে কেউ স্পর্শ করতে পারেন না।

পুরোহিত পূজা করে প্রথম পুকুরের জলে হাত দেন। তারপর সেই পুকুরের জল গ্রামবাসীদের মাথায় ছিটিয়ে দেন। তখন অধিকাংশ বাগদী

সম্প্রদায়ের লোকেরা জলে নেমে পড়েন দেবীকে খুঁজে বার করতে। এক্ষেত্রে প্রশ্ন থাকে, কেন বাগ্দী সম্প্রদায়ের লোকেরা দেবীকে খোঁজার কাজে প্রধান ভূমিকা পালন করেন? তার উত্তরে বলা যায়, যতদূর সম্ভব বাগ্দী সম্প্রদায়ের কেউ গোয়ারা-জামড়ার জলা থেকে দেবীকে উদ্ধার করেন। তাই দেবীকে উদ্ধার করার কাজে বাগ্দী সম্প্রদায়ের লোকদের নিয়োগ করা হয় সেই স্মৃতির স্মারক রূপে।

মূর্তিটি খুঁজে পাওয়ার পর মূর্তিটিকে নিজের হাতে নেওয়ার জন্য সকলেই ঝাঁপিয়ে পড়েন। জলের মধ্যে দেবীকে নিয়ে কাড়াকাড়ি হয়। কে সকলের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে মূর্তিটিকে হাতে করে পুকুর থেকে উপরে উঠে আসতে পারেন, তাই নিয়ে চলতে থাকে প্রতিযোগিতা। দেবীকে জল থেকে না তোলা পর্যন্ত কোন বাড়িতেই রান্নার আয়োজন করা হয় না।

দেবীকে কাড়াকাড়ি করতে করতে শোভাযাত্রা মহিষকাটা মন্দিরের উদ্দেশ্যে এগোতে থাকে। সেক্ষেত্রে পথের ধারের প্রত্যেক বাড়ির সম্মুখে দেবীকে দুধ গঙ্গাজল, ডাবের জল দেওয়া হয়। মাঝে মাঝে দেবীর উদ্দেশ্যে পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। রক্ত পিচ্ছিল পথে দেবী আসেন মাইচতলার মহিষকাটা মন্দিরে। সেখানে হাজরা মহাশয়রা দেবীর মাথায় সাত কলসি জল ঢালেন। এখানে প্রশ্ন থাকতে পারে—দেবীকে দুধ গঙ্গাজল, ডাবের জল নিবেদন করা হচ্ছে, বা তাঁর মাথায় সাত কলসি জল ঢালা হচ্ছে, এ সবের তাৎপর্য কি?

এক্ষেত্রে আমরা জিনপ্রভসূরিকে স্মরণ করতে পারি। তিনি বলেছেন, "অদ্যাপি পরমসময়িনো ধর্মরাজ ইতি ব্যপদিশ্য কদাচিদ বর্ষতি বর্ষাসু জলধরে ক্ষীরঘটাসহস্রৈর্ভগবন্তং স্নপয়ন্তি সম্পদ্যতে চ তৎক্ষণাদ্ বিশিষ্টা মেঘবৃষ্টি।"[৫১] অর্থাৎ পরম সময়ে ধর্মরাজ এইভাবে আদিষ্ট জলধর কদাচিৎ বর্ষাকালে বর্ষণ করে। ক্ষীরঘটের দ্বারা ভগবানকে স্নান করায়। তৎক্ষণাৎ বিশিষ্ট মেঘবৃষ্টি হল। ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন যে রাঢ়ে এখনও কোন কোন স্থানে দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টি হলে দুধে স্নান করানো হয়।[৫২] এই সূত্রে বলা যায়, দেবীর ক্রোধকে প্রশমিত করার উদ্দেশ্যে, এবং মেঘবৃষ্টির আকাঙ্ক্ষায় স্নান করানো হয়।

অষ্টমীর দিন বৈকাল নাগাদ মহিষকাটা মন্দিরে দেবীকে রাখা হয়। তখন গ্রামবাসীদের পূজা মন্দিরে আসে। পূর্বে এই সময় বর্ধমানের রাজাদের অর্থে

ক্রীত মহিষ বলি দেওয়া হতো। বর্তমানে গ্রামবাসীদের প্রদত্ত মহিষ বলি দেওয়া হয়। অসংখ্য ছাগও বলি হয়। বলিদানের ব্যাপারে কোন বাছ-বিচার নেই। শুয়োর ভেড়াও বলি হয়। এক্ষেত্রে বলা যায়, বলির ব্যাপারে চামুণ্ডা সর্বভুক্। তাঁর সম্বন্ধে অন্য এক স্তোত্রে বলা হয়েছে, "নৃবাজি মহিষেভাংশ্চ খাদন্তী চ করে স্থিতান।" এই বলিদান প্রসঙ্গে বিনয় ঘোষ বলেছেন, "কেবল ছাগল ভেড়া বলিদান দেওয়া হয় না, মহিষ শুয়োর পর্যন্ত বলি দেওয়া হয়। দু'দশটা নয়, শত শত। কোনো নির্দিষ্ট স্থানে নয়—সর্বত্র, গ্রামের পথের ধারে ধারে বেদী করে। মনে হয় যেন, নরবলির ভয়াবহ তাণ্ডবলীলার প্রাগৈতিহাসিক সংস্কারের একটা বৈকল্পিক সমাধান সবে মাত্র করা হয়েছে, তাই বিকল্পের মধ্যে এখনও তার সেই আদিম প্রচণ্ডতার রেশটুকু বজায় রয়েছে, যেমন আছে জামালপুরের বুড়োরাজের উৎসবে।[৫৩] কিন্তু এক্ষেত্রে তান্ত্রিক পৈশিকতার প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না।

মহিষকাটা মন্দির থেকে দেবী রাত ১১ টার মধ্যে নিজের শয়নগৃহে ফিরে আসেন। ফেরার পথে প্রতি বাড়িতে পূজা পান। সেবাইতদের প্রতি বাড়িতে ভোগ গ্রহণ করে রাত ১২টার পর শয়ন করেন।

নবমীর দিন ৮ জন কৈবর্ত চতুর্দোলায় দেবীকে বহন করে নিয়ে গ্রাম প্রদক্ষিণ করেন। প্রত্যেক বাড়ির সামনে বাঁধানো বেদীতে পূজা ও পাঁঠাবলি হয়। দেবীর সঙ্গে ব্রাহ্মণ, ঘাতক, পরামানিক ও বাজনদাররা সারাদিন গ্রামে ঘুরে সন্ধ্যা ৬টার সময় শয়ন মন্দিরে চলে আসেন। আসার ৩ ঘণ্টা পরে ব্রাহ্মণগণ বার করে মহিষকাটা মন্দিরে নিয়ে যাবেন। তখনও যাবার পথে অধিকাংশ লোকের ঘরে পূজা ও বলি পাবেন। তারপর রাতে দেবী মহিষকাটা মন্দির থেকে সেবাইতদের ঘরে ঘরে ভোগ খেয়ে শয়নগৃহে ফিরে আসবেন এবং শয়ন করবেন।

দশমীর দিন সকালবেলায় দেবী চতুর্দোলায় বার হবেন। প্রত্যেক বাড়িতে গিয়ে শীতলভোগ গ্রহণ করবেন। গ্রাম প্রদক্ষিণের সময় গ্রামের সধবা মেয়ে বৌরা মাকে সিঁদুর পরিয়ে সেই সিঁদুর নিজেদের সিঁথিতে পরেন। এ যেন অনেকটা দুর্গাপূজার বিজয়া দশমীর সিঁদুর খেলার মতো।

দেবী শেষে হাজরা বাড়ি যাবেন। হাজরাদের বাড়ি থেকে মহিষকাটা মন্দির পর্যন্ত ঠাকুর বাচ (নেচে নেচে সাতবার যাওয়া আসা) হবে। সেই

সময় প্রচুর লোকের সমাগম হয়। ঘণ্টাখানেক ধরে এই অনুষ্ঠান হয়। এরপর দেবী আসতে থাকেন শয়ন মন্দিরের অভিমুখে। সেই মন্দিরে প্রবেশ করার পূর্বে শত শত শায়িত ভক্তদের ডিঙ্গিয়ে দেবী আসেন। রায় এবং হাজরারা দেবীকে ব্রাহ্মণদের হাতে সমর্পণ করেন। ব্রাহ্মণগণ মন্দিরের সম্মুখস্থ নাটমন্দিরে বরণ করে দেবীকে শয়ন মন্দিরে তুলে নেন।

এখানে এই যে চতুর্দোলায় করে গ্রাম প্রদক্ষিণ, এ সম্বন্ধে বিনয় ঘোষ বলেছেন যে প্রদক্ষিণ ব্যাপারটাই অনার্যদের উৎসবের প্রধান লক্ষণ। 'যাত্রা বা জাত' কথার মধ্যে আজও সেই প্রাগার্যদের উৎসবের গ্রাম প্রদক্ষিণের বিশেষত্ব অক্ষুণ্ণ রয়েছে। বিশেষত, ধীবর ও ব্যগ্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের লোক পুরোহিতসহ দেবীকে বহন করে গ্রাম প্রদক্ষিণ করেন। মনে হয় যেন দেবী তাদেরই স্কন্ধে চড়ে গ্রাম প্রদক্ষিণ করেন, যারা তাঁর আদি অকৃত্রিম পূজারী।[৫৪] এখানে দেবীর উৎসবের আচার অনুষ্ঠানের প্রভাবকে স্বীকার করে নিলেও প্রশ্ন থাকে, ধীবর ও ব্যগ্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ই কি ছিল মন্তেশ্বরের চামুণ্ডাদেবীর আদি ও অকৃত্রিম পূজারী?

এক্ষেত্রে বলা যায়, যখন কোন দেব বা দেবী সার্বজনীন হয়ে ওঠেন, তখন তাঁর উৎসব পরিকল্পনার ক্ষেত্রে কর্মবিভাজনের একটা ব্যাপার থেকে যায়। যেমন, চামুণ্ডার উৎসবের ক্ষেত্রে ধীবর ও ব্যগ্রক্ষত্রিয়দের দ্বারা যে চতুর্দোলা বহন, তাকে কর্মবিভাজনের একটি অঙ্গ বলা যায়।

এক্ষেত্রে প্রশ্ন থাকে, কারা উৎসব-পরিকল্পনা করে কর্মবিভাজন করছেন—উচ্চকোটির, না নিম্নকোটির মানুষেরা?

বৈদিক যুগে দেখা যায়, অন-আর্যদের প্রতি আর্যদের ছিল উন্নাসিকতা। প্রাক্ বৌদ্ধযুগেও উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের মধ্যে প্রবল ব্যবধান রচিত হয়েছিল। প্রাক্ তুর্কী আক্রমণের যুগেও ঐ দুই কোটির মধ্যে বিভেদ ছিল। চৈতন্য-পূর্ব যুগেও সেই একই চিত্র। তবে সামাজিক উদারতার বাতাবরণ সৃষ্টি করছেন বুদ্ধ এবং শ্রীচৈতন্য। বিশেষত বৌদ্ধ যুগে উচ্চকোটির মানুষেরা তাঁদের ধর্মীয় পরিমণ্ডলে নিম্নকোটির মানুষদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। সেক্ষেত্রে উচ্চকোটির মানুষরাই উৎসব পরিকল্পনা, এবং কর্মবিভাজন করেছেন। আর বিশেষ বিশেষ কর্মের ভার অর্পণ করা হয়েছে মানুষের বৃত্তির প্রতি লক্ষ্য রেখে।

এখানে দেবী চামুণ্ডার উৎসব-পরিকল্পনার ক্ষেত্রে, তা যে যুগেই হোক,

কর্মবিভাজনের ক্ষেত্রে কর্মগ্রহণের জন্য নিম্নকোটির মানুষদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। আর সেই 'চতুর্দোলা বহন' সেই কর্মবিভাজনেরই একটি অঙ্গ।

আমরা জানি, বাংলায় 'চতুর্দোলা' অর্থাৎ ডোলা মুখ্যতঃ বহন করতেন বাগ্দী (বর্গক্ষত্রিয়) সম্প্রদায়ের মানুষেরা। অন্যদিকে, এই পশ্চিমবঙ্গে পারলৌকিক কর্মে চৌদোল (চতুর্দোলা) জলে ভাসাবার রীতি আছে। সেই চতুর্দোলা যেহেতু জলে ভাসানো হচ্ছে, সেহেতু চতুর্দোলাকে এখানে নৌকা ধরা যেতে পারে। আর শাস্ত্রপ্রমাণে, এবং ব্যবহারিক জীবনে নৌকর্মজীবী হলো কৈবর্ত অর্থাৎ ধীবর সম্প্রদায়। তাই চতুর্দোলা বহনের জন্য কৈবর্তগণ নিযুক্ত হয়েছিল। সুতরাং সামগ্রিক বিচারে ধীবর ও ব্যগ্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায় যে মন্তেশ্বরের চামুণ্ডা-দেবীর আদি ও অকৃত্রিম পূজারী, এমন মতকে গ্রহণ করা যায় না। তবে একথা বলা যায় যে বৌদ্ধ ও হিন্দুতান্ত্রিক উভয়েরই লক্ষ্য ছিল, অসভ্য ও অনার্য আচারপরায়ণ বলে যারা অখ্যাত ছিল, তাদের নিজেদের ধর্মীয় সংস্কৃতির বৃত্তের অন্তর্ভুক্ত করা। এই সময় অন্যান্য আরও অনেক দেবদেবীর মতো চামুণ্ডাদেবীও বাংলার ধর্ম ও সংস্কৃতির ইতিহাসে একটা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। মন্তেশ্বরের চামুণ্ডা আজও তারই উজ্জ্বল স্মৃতি বহন করে চলেছেন।

এখানে চামুণ্ডা দেবীর উৎসবের আর একটি অঙ্গ হলো 'ঠাকুর বাচ', অর্থাৎ হাজারদের বাড়ি থেকে মহিষকাটা মন্দির পর্যন্ত সাতবার ঠাকুর নিয়ে যাওয়া আসা, যা দশমীর দিন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

আমরা জানি, 'বাইচ বা বাচ' শব্দটি এসেছে সংস্কৃত 'বহিত্র' শব্দ থেকে, যার অর্থ 'নৌচালন-প্রতিযোগিতা' আর এই 'বাচখেলা' পূর্ববঙ্গের নদীনালায় দশমীর দিন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। তা থেকে মনে হতে পারে, 'ঠাকুর বাচে'র মধ্যে যেন সেই অভিনয়কেই ফুটিয়ে তোলা হয়। এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে, 'বাচ' কথার অর্থ যদি 'নৌচালন-প্রতিযোগিতা'[৫৫] হয়, তবে 'ঠাকুর বাচ' কথার কোন অর্থই দাঁড়ায় না। এক্ষেত্রে বলা যায়, 'বাচ' শব্দের অর্থ 'নৌচালন-প্রতিযোগিতা' হলেও পরবর্তীকালে তার অর্থ দাঁড়িয়েছে 'প্রতিযোগিতা'। তাই 'নৌচালন-প্রতিযোগিতা'কে বাচ না বলে 'নৌকাবাচ' বলা হয়ে থাকে। আর তা হয় বলেই এক্ষেত্রে ঠাকুর নিয়ে প্রতিযোগিতার জন্য 'ঠাকুর বাচ' বলা হয়ে থাকবে। অবশ্য এক্ষেত্রেও এক বিশেষ তাৎপর্য থাকতে পারে। তাৎপর্যটি

হল—দশমীর দিন, বিদায় পর্ব। সপ্তমাতৃকাকে নৌকাযোগে বিদায় দেওয়া হচ্ছে। পিতৃগৃহ থেকে নৌকা করে একে একে সপ্তদেবীকে যথাস্থানে পৌছে দেওয়া হচ্ছে। আর সেই অভিনয়কে হয়তো ফুটিয়ে তোলা হয়েছে 'ঠাকুরবাচে'র মধ্যে। এখানে সেই সত্য ধরা পড়েছে 'নৌকাবাচে'র মতো সাতবার যাওয়া আসার মধ্যে।

যাই হোক, প্রত্নতত্ত্ব এবং লৌকিক সংস্কৃতির দিক থেকে মস্তেশ্বরের বিশেষ এক গুরুত্ব রয়েছে। সেখানে দেবী চামুণ্ডাকে আশ্রয় করে যে আচার-অনুষ্ঠান, পূজাপদ্ধতি ও সংস্কার, তা বাংলার ধর্মীয় তথা লোক-সংস্কৃতির ইতিহাসকে করেছে উজ্জ্বল ও সমৃদ্ধ।

তথ্যপঞ্জী

১। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (১ম খণ্ড), বিনয় ঘোষ, প্রকাশ ভবন, ৩য় মুদ্রণ, ১৩৯৫, পৃঃ ২১৪-২১৫

২। তদেব, পৃঃ—২১৬

৩। প্রতিদিন, ১৯ নভেম্বর ১৯৯৬, পৃঃ—৪

৪। বঙ্গ সংস্কৃতির এক পর্ব (১ম খণ্ড), নৃসিংহপ্রসাদ ভট্টাচার্য, ১ম সং ১৯৯৫, কালনা, পৃঃ ৭৩-৭৪

৫। বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব / ২য় খণ্ড), ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, পঃ বঃ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, ১ম সাক্ষরতা সং ১৯৮০, পৃঃ—৬৬০

৬। বঙ্গ সংস্কৃতির এক পর্ব (১ম খণ্ড), নৃসিংহ প্রসাদ ভট্টাচার্য, ১ম সং ১৯৯৫, কালনা, পৃঃ—৭৪

৭। তদেব, পৃঃ—৭৪

৮। তদেব, পৃঃ—৭৪

৯। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড। পূর্বার্ধ), শ্রীসুকুমার সেন, ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, ৪র্থ সং ১৯৬৩, পৃঃ—২১৮

১০। সংসদ্ বাঙ্গলা অভিধান, সঙ্কঃ—শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, সাহিত্য সংসদ্, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৭৫, পৃঃ—৭০৪

১১। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (১ম খণ্ড), বিনয় ঘোষ, প্রকাশ ভবন, ৩য় মুদ্রণ ১৩৯৫, পৃঃ—২১৭

১২। বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি (৩য় খণ্ড), যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, পুস্তক বিপণি, ১ম প্রকাশ ১৯৯৪, পৃঃ—২১৭

১৩। বর্ধমান পরিচিতি, অনুকূলচন্দ্র সেন ও নারায়ণ চন্দ্র চৌধুরী, বুক সিণ্ডিকেট, ১ম প্রকাশ ১৩৭৩, পৃঃ—৩৭

১৪। মুকুন্দরাম : কবিকঙ্কণ চণ্ডী (১ম ভাগ), সম্পাঃ—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশ্বপতি চৌধুরী, কলিঃ বিঃ ১৯৬২, পৃঃ—৩৫৭

১৫। বাঙলার সামাজিক ইতিহাস, ডঃ অতুল সুর, জিজ্ঞাসা, ১ম প্রকাশ ১৯৭৬, পৃঃ—৫৮

১৬। ইতিহাসের নবভাষ্য, ডঃ তপেন্দ্র নারায়ণ দাশ, নৈরঞ্জনা, ১ম সং ১৯৯৩, পৃঃ—২৫

১৭। গঙ্গারিডি : দেশ ও জাতি (দেশ খণ্ড), বিবেকানন্দ দাশ, নৈরঞ্জনা, কালনা, ১ম প্রকাশ ১৩৯৮, পৃঃ—১৭

১৮। Ancient India as described by Megasthenes & Arrian, Tr : J. W. McCrindle, collected E. A. Schwanbeck (Cal-1926) P. 32

১৯। Epigraphia Indica, vol. XXIII, P. 155

২০। বর্ধমান-চর্চা, সম্পাঃ—সমীরণ চৌধুরী, বর্ধমান ১৯৮৯, পৃঃ—৫০

২১। বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, সম্পাঃ—জ্যোৎস্না সিংহরায়, সংক্ষেপিত সং ১৩৭৩, পৃঃ ২০২-৩

২২। বর্ধমান-চর্চা, সম্পাঃ—সমীরণ চৌধুরী, বর্ধমান ১৯৮৯, পৃঃ—৪

২৩। তদেব, পৃঃ—৪৯

২৪। তদেব, পৃঃ—৪৯

২৫। বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, সম্পাঃ—জ্যোৎস্না সিংহরায়, সংক্ষেপিত সং ১৩৭৩, পৃঃ—২০৩

২৬। কবিকঙ্কণ চণ্ডী, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, বসুমতী, ১৩৭০ পৃঃ—৭১

২৭। রাঢ়ের জাতি ও কৃষ্টি (১ম খণ্ড), মাণিকলাল সিংহ, বিষ্ণুপুর, ১ম সং ১৯৮২, পৃঃ—২২৫

২৮। তদেব, পৃঃ—২২৯

২৯। তদেব, পৃঃ ২২৮-২২৯

৩০। বাঙলার সামাজিক ইতিহাস, ডঃ অতুল সুর, জিজ্ঞাসা, ১ম প্রকাশ ১৯৭৬, পৃঃ ৪১-৪২

৩১। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (২য় খণ্ড : চৈতন্যযুগ), ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক, ৩য় সং ১৯৮৩, পৃঃ—২৮

৩২। কৌশিকী, ৩য় পর্যায়, ২য় বার্ষিক সংখ্যা, ১৯৯৬, পৃঃ—১১৫

৩৩। ভারতের ইতিহাস (নবম ও দশম শ্রেণী), ডঃ অতুলচন্দ্র রায়, প্রান্তিক, পুনর্মুদ্রণ ১৯৯৬, পৃঃ ১৮৯-৯০

৩৪। কৌশিকী, ৩য় পর্যায়, ২য় বার্ষিক সংখ্যা ১৯৯৬, পৃঃ—১১৫

৩৫। তদেব, পৃঃ—১১৬

৩৬। কৃত্তিবাসী রামায়ণ, সম্পাঃ—উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বসুমতী, ২০ সং পুনর্মুদ্রণ, পৃঃ—৩৯১

৩৭। বাংলার লৌকিক দেবতা, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, দেজ, ১ম দেজ সং ১৩৮৫, পৃঃ—৬৭

৩৮। কৃত্তিবাসী রামায়ণ, সম্পাঃ—উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বসুমতী, ২০ সং পুনর্মুদ্রণ, পৃঃ—৩৯১

৩৯। বাংলার লৌকিক দেবতা, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, দেজ, ১ম দেজ সং ১৩৮৫ পৃঃ—৬৩

৪০। অথর্ববেদ, অনুঃ ও সম্পাঃ—শ্রীবিজনবিহারী গোস্বামী, হরফ, ১ম প্রকাশ ১৩৮৫, পৃঃ—৫

৪১। নবকল্লোল, পৌষ ১৪০১, পৃঃ—১৮১

৪২। বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি (৩য় খণ্ড), যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, পুস্তক বিপণি, ১ম প্রকাশ ১৯৯৪, পৃঃ—৮৭

৪৩। শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধান (১—৪র্থ), সঙ্কঃ—হরিদাস দাস, নবদ্বীপ, ২য় সং ৫০১ শ্রীচৈতন্যাব্দ, পৃঃ—১০৩২

৪৪। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড। পূর্বার্ধ), শ্রীসুকুমার সেন, ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, ৪র্থ সং ১৯৬৩, পৃঃ ২২০-২১

৪৫। তিন হাজার বছরের লোকায়ত জীবন, শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এ. মুখার্জী, ১ম সং ১৩৮৩, পৃঃ—৬২

৪৬। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়, এ. মুখার্জী, ষষ্ঠ সং ১৯৭৫, পৃঃ—১৯৫

৪৭। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (১ম খণ্ড), বিনয় ঘোষ, প্রকাশ ভবন, ৩য় মুদ্রণ ১৩৯৫, পৃঃ—১৮৮

৪৮। ওভারল্যাণ্ড, রবিবাসর, ১৪ মার্চ ১৯৯৩, পৃঃ—১৪

৪৯। বঙ্গসংস্কৃতির এক পর্ব (১ম খণ্ড), নৃসিংহপ্রসাদ ভট্টাচার্য, কালনা, ১ম সং ১৯৯৫, পৃঃ—৪৪

৫০। তদেব, পৃঃ—৪৪

৫১। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড। অপরার্ধ), শ্রীসুকুমার সেন, ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, ২য় সং ১৯৬৫, পৃঃ—১২৬

৫২। তদেব, পৃঃ—১২৬

৫৩। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (১ম খণ্ড), বিনয় ঘোষ, প্রকাশ ভবন, ৩য় মুদ্রণ ১৩৯৫, পৃঃ—২১৮

৫৪। তদেব, পৃঃ—২১৭

৫৫। সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান, সঙ্কঃ—শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, সাহিত্য সংসদ্, পুনর্মুদ্রণ ১৯৭৫, পৃঃ—৫৯০

কাইগ্রাম

কালনা মহকুমার মন্তেশ্বর থানার অন্তর্গত একটি গ্রাম রাইগ্রাম। এটি নাদনঘাট ও কুসুমগ্রাম দিয়ে যে রাস্তাটি চলে গেছে, তার উপর অবস্থিত। আর এই রাইগ্রামেরই মাইল তিন উত্তরে কাইগ্রাম। এটিও মন্তেশ্বর থানার অন্তর্গত। এখানে মুন্সী (বসু) বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ জীউ-এর মন্দির। ২৫. ১২. ৯৬-এর এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে শ্রীনন্দগোপাল বসু বলেন যে শ্রীঅভিরাম বসু ছিলেন বর্ধমানরাজের একজন মুন্সী (করণিক)। ইনি ফার্সী বয়েত রচনা করে দিল্লীর মুঘলদরবারকে মুগ্ধ করেছিলেন। তিনিই নাকি আনুমানিক ৩০০ বছর পূর্বে বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের সময় মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন। আর তা যদি হয়, তবে মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাকাল ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দ বলে ধরা যায়।

আমরা জানি, রাজা কীর্তিচন্দ্র রায় বৈকুণ্ঠপুরে ১৬৫৪ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে গোপেশ্বর শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। আর এটিই বোধ হয় বর্ধমানরাজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রাচীনতম মন্দির। এরপর ১৬৬১ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমানরাজ কর্তৃক অম্বিকা কালনায় প্রতিষ্ঠিত হয় লালজী মন্দির, এবং সিদ্ধেশ্বরীদেবীর ম ন্দর। আর ঐ একই বৎসরে মন্তেশ্বরে প্রতিষ্ঠিত হয় চামুণ্ডাদেবীর মন্দির। এক্ষেত্রে অভিরাম বসু যদি বর্ধমানরাজের রাজকর্মচারী হয়ে থাকেন, তবে কাইগ্রামে তাঁর প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ জীউ-এর মন্দির ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দের পরেই প্রতিষ্ঠিত হওয়াই স্বাভাবিক।

মন্দিরটি তিন কুঠুরীযুক্ত দালানরীতির। দক্ষিণমুখী মন্দিরটির সম্মুখে সুবৃহৎ নাটমন্দির। এই মন্দিরের গর্ভগৃহে পশ্চিমদিকে রয়েছেন শ্রীঅভিরাম মুন্সীব (বসুর) প্রতিষ্ঠিত রাধাবিনোদ ও রাধারানী। রাধাবিনোদ ১ ফুটেব মতো প্রস্তর মূর্তি। আর পূর্বদিকে রয়েছেন শ্রীঅভিরাম মুন্সীর ভ্রাতার প্রতিষ্ঠিত রাধাকান্ত ও রাধারানী।

মন্দিরে প্রবেশ দ্বারের সম্মুখে রয়েছে প্রায় ২০´ উচ্চতাবিশিষ্ট রাসমঞ্চ। এর নিম্নাংশ আটটি খোলা দরজাযুক্ত, আর উর্ধ্বাংশ কিছুটা গম্বুজরীতির। এর অনতিদূরে উচ্চ ভিত্তিবেদীর উপর খোলা দালানযুক্ত দালানরীতির সুউচ্চ দোলমন্দির প্রতিষ্ঠিত। এর ভিত্তিবেদীর মধ্যে রয়েছে দরজাযুক্ত ঘর। এর পাশেই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে আটচালারীতির উত্তরমুখী শিবমন্দির। এর দরজার মাথায় রয়েছে গণেশ মূর্তি। দুপাশে কৃত্রিম মন্দির। ফুলকারি কাজ ও দরজার উপরে দুদিকে পদ্ম। দরজার দুপাশ দিয়ে এক সারি করে উঠে গেছে নৃসিংহ, কূর্মাবতার, প্রণামরত হনুমান, সাহেব, ঘোড়সওয়ার সৈন্যের যুদ্ধ ইত্যাদি টেরাকোটার চিত্র।

এই গ্রামেরই ব্রহ্মচারীদের গৃহে রয়েছে উচ্চভিত্তিবেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত টেরাকোটাসমৃদ্ধ প্রায় ২৫´ উচ্চতাবিশিষ্ট একটি জোড়-বাংলা মন্দির: এটি মুখ্যতঃ পশ্চিমমুখী। এর পশ্চিমদিকে একটি দরজা, এবং উত্তরদিকে আর একটি দরজা আছে।

মন্দিরটির সম্মুখভাগে দশভুজা দুর্গা, নৌকাবিহারের মতো অসংখ্য টেরাকোটার কাজ। এর মাথায় রয়েছে প্রতিষ্ঠালিপি।

লিপিটি : সকাব্দ ১…৬

লিপিটির সংখ্যাটির মাঝের সংখ্যা দুটি ঘসে যাওয়ায় দুর্বোধ্য। তবে সাক্ষাৎকারে শ্রীমানব ব্রহ্মচারী বললেন যে সংখ্যাটি হবে : ১৪০৬, আর তা যদি হয়, তবে মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাকাল ১৪৮৪ খ্রীষ্টাব্দ, অর্থাৎ প্রাক্ চৈতন্যযুগের। কিন্তু ডঃ অতুল সুর জোড়-বাংলা মন্দিরকে 'চৈতন্যোত্তর যুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে'র পর্যায়ে ফেলেছেন।[১] সুতরাং এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকাল ১৪০৬ শকাব্দ হতে পারে না।

বাঁকুড়ার জোড়-বাংলা মন্দিরের প্রাচীনতম নিদর্শন বিষ্ণুপুরের কেষ্ট রায়ের মন্দির, যার প্রতিষ্ঠাকাল ৯৬১ মল্লাব্দ, অর্থাৎ ১৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দ। নদীয়ার জোড়-বাংলা মন্দিরের প্রাচীনতম নিদর্শন তেহট্টের কৃষ্ণরায়ের মন্দির, যার প্রতিষ্ঠাকাল ১৬৭৮ খ্রীষ্টাব্দ। অন্যদিকে, অম্বিকা-কালনার সিদ্ধেশ্বরী দেবীর জোড়-বাংলা মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকাল ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দ। শ্রীযজ্ঞেশ্বর চৌধুরী বলেছেন যে বর্ধমান জেলার সিঙ্গারকোনের রাধাকান্তের জোড়-বাংলা মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাকাল অষ্টাদশ শতক।[২] আর বর্ধমানরাজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রাচীনতম মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকাল ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দ। তাই আমরা অনুমান করতে পারি যে কাইগ্রামের জোড়-বাংলা মন্দিরটি ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দের পরেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

এই মন্দিরের গায়েই উচ্চভিত্তিবেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে দোলমঞ্চ। মন্দিরের গর্ভগৃহে রয়েছেন প্রস্তরনির্মিত ৪´ উচ্চতাবিশিষ্ট শঙ্খচক্র গদা পদ্মধারী অনন্ত বাসুদেব। তাছাড়া রয়েছেন গণেশ, রামচন্দ্র ও চণ্ডী। আর মুখ্য হয়ে রয়েছেন বরাহ বিষ্ণু গোপাল। এঁর মুখ বরাহের। এঁর চার হাতে শঙ্খচক্র গদা পদ্ম। এটি ২ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট সবুজ আভাযুক্ত কষ্টিপাথরে নির্মিত। এমন প্রত্ন নিদর্শন সত্যিই বিরল। এটি নাকি স্বপ্নদর্শনের মাধ্যমে প্রাপ্ত। শ্রীমানব ব্রহ্মচারী বলেন যে তাঁদের কৌলিক উপাধি ছিল চট্টোপাধ্যায়। এই বংশেরই একজন ব্রহ্মচারী হয়ে দেশ দেশান্তর ঘুরে ঘরে ফিরে আসেন। তিনিই স্বপ্নাদৃষ্ট হয়ে রাইগ্রামের গোপালডাঙ্গার ধ্বংসস্তূপ থেকে বরাহ বিষ্ণু গোপালকে উদ্ধার করে কাইগ্রামে প্রতিষ্ঠা করেন। সেই থেকে এঁর নিত্যসেবা চলে আসছে। দোল ও রথ এঁর বিশেষ উৎসব।

তথ্যপঞ্জী

১। বাঙলার সামাজিক ইতিহাস, ডঃ অতুল সুর, জিজ্ঞাসা, ১ম প্রকাশ ১৯৭৬, পৃঃ—৭৮

২। বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি (৩য় খণ্ড), যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, পুস্তক বিপণি, ১ম প্রকাশ ১৯৯৪, পৃঃ—৩৬৭

সমুদ্রগড়

পূর্বস্থলী থানার অন্তর্গত একটি প্রাচীন গ্রাম। এটি কালনা-নবদ্বীপ বাস রাস্তার উপর। বৃন্দাবন দাসের 'শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবতে' এবং অষ্টাদশ শতকের প্রথম পাদে রচিত শ্রীনরহরি চক্রবর্তীর 'শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে এই গ্রামটিকে 'সমুদ্রগড়ি' নামে উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্রীনরহরি চক্রবর্তীর কাব্যে বলা হয়েছে—

'সমুদ্রগড়ি'—গ্রামের নিকটে গিয়া কয়।
দেখ শ্রীনিবাস! এ সমুদ্রগড়ি হয়॥
বিজ্ঞগণে 'শ্রীসমুদ্রগতি'—নাম কয়।
এথা গঙ্গা-সমুদ্র-প্রসঙ্গ সুখময়॥
গঙ্গাশ্রয় করিয়া সমুদ্র-গতি এথা।
লোকে যে প্রসিদ্ধ শুন কহিয়ে সে কথা॥ (দ্বাদশ ৪০৩-৫)।[১]

অর্থাৎ বিজ্ঞজন 'সমুদ্রগড়ি'কে 'শ্রীসমুদ্রগতি' বলে থাকেন। কারণ, গঙ্গাকে আশ্রয় করে সমুদ্র-গতি (সামুদ্রিক জোয়ার) এখানে এসে পৌছায়। কিন্তু সেই 'সমুদ্র-গতি' থেকে 'সমুদ্রগড়ি' বা 'সমুদ্রগড়' নামটি এসেছে, তা বলা যায় না।

অনেকেই স্থান নামটিকে সমুদ্রগুপ্তের নামের সঙ্গে, আবার অনেকেই এক স্থানীয় জমিদার সমুদ্রসেনের নামের সঙ্গে জড়াতে চেয়েছেন। কিন্তু এসবের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে বলে মনে হয় না। এক্ষেত্রে 'বর্ধমান পরিচিতি'র লেখকদ্বয়ের মন্তব্যটিকে অধিকতর যুক্তিগ্রাহ্য বলেই মনে হয়। তাঁরা বলেছেন—"গড় নামটি বেশ রহস্যজনক। অনেকে সমুদ্রগড় নামটিকে

সমুদ্র নামক কোন রাজার গড় ছিল বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু জান্নগড় (জহ্নুগড়), সমুদ্রগড়,—এইসব, গড় অর্থাৎ গর্ত এই অর্থে ধরিলেই বোধ হয় ঠিক হয়।"[২] অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রেই যে দুর্গ অর্থে গড় যুক্ত হয়েছে তা নয়, কোন কোন ক্ষেত্রে গর্ত (>গড্ড>গড়) অর্থেও গড় যুক্ত হয়েছে। আর একথা সমুদ্রগড়ের ক্ষেত্রে অধিকতর প্রযোজ্য বলে মনে হয়। এখানে সমুদ্র অর্থাৎ বিশাল গড় অর্থাৎ গর্ত ছিল বলেই হয়তো স্থানটির নাম সমুদ্রগড় হয়েছিল। এই সমুদ্রগড বুনো রামনাথের বাসস্থান ও তাঁর চতুষ্পাঠীর জন্য প্রসিদ্ধ। তাছাড়া, 'সাধারণী' পত্রিকার ২৬শে মাঘ ১২৯২ সংখ্যায় সমুদ্রগড়ের যে পণ্ডিতদের উল্লেখ করেছেন, তাঁরা হলেন ন্যায়স্মৃতিশাস্ত্রের পণ্ডিত রঘুমণি বিদ্যাভূষণ, অন্নদাভূষণ তর্করত্ন, কৃষ্ণনাথ তর্করত্ন, দেবেন্দ্রনাথ স্মৃতিরত্ন, তারাপদ সাংখ্যবেদান্ত পুরাণতীর্থ, প্রাণনাথ তর্কভূষণ ও ভগীরথ তর্করত্ন প্রমুখ।[৩] এছাড়াও 'শব্দরত্নাবলী'র প্রণেতা সত্যকিঙ্কর বিশ্বাস ছিলেন স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। এঁরা সমুদ্রগড়ে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারাকে অব্যাহত রেখেছিলেন।

মুসলমান যুগে সাতসইকা পরগণার হিন্দু জমিদার ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন, এবং মুর্শিদকুলী খাঁর (১৭১৭—২৭ খ্রীঃ) আমলে এই বংশের একরাম চৌধুরীর সঙ্গে তিন পরগণায় ৫১,১৬৭ টাকা জমা ধার্য হয়। পরবর্তীকালে জমিদারী হস্তচ্যুত হলেও এঁরা সমুদ্রগড়ের রাজা বলে পরিচিত ছিলেন।[৪] এই বংশের জমিদার রঞ্জিত ভট্ট ঠাকুর নদীয়ার রাজা রামকৃষ্ণকে অর্থ সাহায্য করে বাকি খাজনার দায় থেকে তাঁকে উদ্ধার করেন। কিন্তু নবাবের রোষে তাঁকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু ধর্মান্তরিত হলেও এই বংশ হিন্দু সংস্কৃতিকে ত্যাগ করতে পারে নি। হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির দুই ধারাকে এঁরা লালন করে চলেছেন।

মড়িগঙ্গা ব্রীজের সন্নিকটে ছিল এঁদের রাজপ্রাসাদ, যা বর্তমানে ধূলিস্যাৎ। এই রাজপ্রাসাদের বহির্ভাগের দালান মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন লক্ষ্মীনারায়ণ, বুড়োশিব ও সিদ্ধেশ্বরীর মূর্তি। এখানে বুড়োমা (লোচনমাতা) নামে দশভুজা মূর্তি রাজবাড়ির বাইরে দুর্গাদালানে পূজিতা হন।

সিদ্ধেশ্বরী দেবীর প্রসঙ্গে মোহিত রায় বলেছেন যে বৈশাখী পূর্ণিমায় সমুদ্রগড়ের লোকায়ত দেবী (মূর্তিহীন) সিদ্ধেশ্বরীর বটগাছের থানে বিশেষ পূজা হয়। আজও সবার আগে সমুদ্রগড়ের বর্তমান মুসলমান রাজ-বংশধরদের

পূজা ও বলি হয়, পরে অন্যান্যেরা পূজা ও বলি দেন। এই ধারা চলে আসছে বহুকাল ধরে। ব্রাহ্মণ পুরোহিত পূজা করেন।[৫] এরই সন্নিহিত বনপুকুরে শা ফরিদের মাজার রয়েছে। ফাল্গুন মাসে এখানে মেলা বসে। মহরমও সমুদ্রগড়ের একটি বিশেষ উৎসব।

প্রত্নতত্ত্বের মধ্যে সমুদ্রগড়ে ভট্টাচার্য পাড়ায় রয়েছে টেরাকোটায় অলঙ্কৃত বাংলারীতির আটচালা মন্দির। এখানে বুড়োশিব অধিষ্ঠিত। আর পুরাকীর্তির মধ্যে বিবির হাটে রয়েছে ইছামৎ খাঁর জননী কর্তৃক নির্মিত তিন গম্বুজবিশিষ্ট একটি মসজিদ, সিদ্ধেশ্বরীর সম্মুখে একটি নীলকুঠির ধ্বংসাবশেষ, রাজবাড়ির ধ্বংসাবশেষ, এবং রাজবংশধরদের কাছে সংরক্ষিত সিলমোহর, দুটি মুদ্রা ও একটি জাহাজের নোঙ্গর।

তথ্যপঞ্জী

১। শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর, শ্রীল নরহরি চক্রবর্তী, সম্পাঃ—শ্রীমদ্ ভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত মহারাজ, গৌড়ীয় মিশন ১৯৮৭, পৃঃ—৬০

২। বর্ধমান পরিচিতি, শ্রীঅনুকূলচন্দ্র সেন ও শ্রীনারায়ণ চৌধুরী, বুক সিণ্ডিকেট, ১ম প্রকাশ ১৩৭৩, পৃঃ—৩২৫

৩। রূপে রূপে দুর্গা, মোহিত রায়, অমর ভারতী, ১ম প্রকাশ ১৯৮৫, পৃঃ—২৪

৪। বঙ্গ সংস্কৃতির এক পর্ব (১ম খণ্ড), নৃসিংহপ্রসাদ ভট্টাচার্য, ১ম সং ১৯৯৫, কালনা, পৃঃ—১৯৪

৫। রূপে রূপে দুর্গা, মোহিত রায়, অমর ভারতী, ১ম প্রকাশ ১৯৮৫, পৃঃ—২৪

রাইগ্রাম

রাইগ্রাম একটি প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু গ্রাম। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী গুজরাটপুরীতে 'ব্রাহ্মণগণের আগমন' নামক অংশে যে 'রাইগাঁই' এর উল্লেখ করেছেন,[১] তা বোধ হয় এই রাইগ্রাম। এই গ্রামটিকে এক প্রত্নস্থলী বললে অত্যুক্তি হয় না।

এই গ্রামেই রয়েছে গোরাচাঁদের থান। এর পশ্চিম গায়েই রয়েছে একটি বৃহৎ ধ্বংসস্তুপ। এই ধ্বংসাবশেষ থেকে পাওয়া গেছে বেলে পাথরের ১´ চওড়া

পাটার উপর 'বা-রিলিফ' পদ্ধতিতে ক্ষোদিত ৩½´ উচ্চতাবিশিষ্ট বরাহ মূর্তি। ইনি দ্বিভুজা, এঁর পদতলে হিরণাক্ষ। এটি নিম্নমানের অমার্জিত পাথরে নির্মিত। এই বরাহের মূর্তিটি থেকে অনেকেই এটিকে আদিবরাহের তথা বিষ্ণুমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বলে সনাক্ত করেছেন। তাছাড়া, উঁচু ঢিবিটি গ্রামস্থ এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের বাসিন্দাদের দ্বারা 'গোপালডাঙ্গা' নামে আখ্যাত হয়। আর এখান থেকেই প্রাপ্ত আদিবরাহের মূর্তিটি শিবতলায় রক্ষিত আছে। তাছাড়া, আর যে সব প্রত্ননিদর্শন রয়েছে, তা হলো :

(ক) ডাঙ্গাটিতে রয়েছে অসংখ্য মৃৎপাত্রের খোলাম, এ থেকে মনে হয় মৃৎপাত্রগুলি প্রসাদ বিতরণ এবং ভোগ নিবেদনের কাজে ব্যবহৃত হতো।

(খ) গোপালডাঙ্গা থেকে পাওয়া গেছে একটি ২ ইঞ্চির মতো দ্বিভুজ পিতলের মূর্তি, এক হাতে কমলকুঁড়ি, পদ্মের উপর দণ্ডায়মান, ইনি হয়তো লক্ষ্মী, ইনি পুরুনিয়ার শ্রীদুলাল চন্দ্র চন্দের বাড়িতে সংরক্ষিত রয়েছেন।

(গ) রাইগ্রামের শিবতলায় সংরক্ষিত রয়েছে হাঁটুর নীচ বরাবর ভগ্ন একটি চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি, যা এলা (এলু) দীঘি থেকে পঙ্ক উদ্ধারকালে প্রাপ্ত।

(ঘ) রাইগ্রামের শিবতলায় সংরক্ষিত রয়েছে একটি বিশেষ বিরল আকৃতির শিবলিঙ্গ, যা পূর্বোক্ত দীঘি থেকে পঙ্ক উদ্ধারকালে প্রাপ্ত।

(ঙ) রাইগ্রামের শিবতলায় জড়ো করা রয়েছে একটি বিষ্ণুমূর্তির খণ্ড বিখণ্ড নিদর্শন। তাছাড়া রয়েছে পৃথক একটি মুখের অংশ, যা হয়তো গরুড় স্তম্ভে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

(চ) রাইগ্রামের পূর্ব প্রান্তের বাগ্দীপাড়ায় রয়েছে চিত্রপটযুক্ত ২½ ফুটের মতো একটি বিষ্ণুমূর্তি। ফলকের নীচের অংশটা সূচালো, হয়তো প্রথিতের জন্য। এঁর মাথার কিছু অংশ, এবং মুখটা চোট পেয়ে চেঁছে গেছে। এটিও পঙ্ক উদ্ধারকালে প্রাপ্ত।

(ছ) রাইগ্রামের পশ্চিমপাড়ার বড়দীঘির পাড়ের বাগ্দীপাড়ার মনসাতলায় রয়েছে একটি বিষ্ণুমূর্তির খণ্ড বিখণ্ড নিদর্শন। শিবতলায় বৃক্ষমূলে জড়ো করা বিষ্ণুমূর্তির মতো সেখানেও বিষ্ণুর দুই পত্নী লক্ষ্মী ও সরস্বতী পৃথক পৃথক হয়ে গেছেন এবং মনসারূপে পূজিতা হচ্ছেন। এটি বড়দীঘির পঙ্ক উদ্ধারকালে প্রাপ্ত।

(জ) বড়দীঘির ঘাটে রয়েছে ১½´×১½´ সাইজের একটি প্রস্তরখণ্ড, যার উপর মন্দিরের প্রস্তর-নির্মিত থাম বসানো ছিল।

(ঝ) কাইগ্রামের বিষ্ণু বরাহ গোপাল মূর্তিটি নাকি গোপালডাঙ্গা থেকে প্রাপ্ত, এমন দাবি রয়েছে।

(ঞ) গোরাচাঁদের বাইরের চাতালে ওঠার সিঁড়িতে, এবং গোরাচাঁদের দরজাগুলিতে চৌকাঠরূপে ব্যবহার করা হয়েছে বহু প্রস্তরখণ্ড। কৃষ্ণবর্ণের পাথরগুলি বিভিন্ন সাইজের। যেমন—২´×২´, ২´×৬´, ১´৪´´×১০´, ২´×১´ ইত্যাদি।

(ট) গোপালডাঙ্গার ধ্বংসস্তুপের উপর কালো পাথরের ৪, ৫টি পাথরের থাম রয়েছে। থামগুলির মধ্যে ২´×১´১০´´×১´৪´´, এরপর ২½ ফুটের মতো গোলাকৃতি, তারপর ২´×১´১০´´×১´৪´´—এই আয়তনের ২/৩টি থাম। আবার ২´×১´১০´´×১´৪´´, তারপর গোলাকৃতির মধ্যে কতকগুলি কোণ, এই অংশ লম্বায় ৩½´, এমন আয়তনের ২টি। তাছাড়া, বড় জলচৌকি আকারের কিছু প্রস্তরখণ্ড রয়েছে, যার উপর থামগুলি বসানো ছিল।

এখানে এই যে পাথরের ব্যবহার, এ সম্বন্ধে ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের মন্তব্যকে উদ্ধার করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন যে বাংলাদেশ পাথরের দেশ নয়; কাজেই বহুল পরিমাণে পাথর ব্যবহারের সুযোগই ছিল না। রাজা-রাজড়া এবং সমাজের সমৃদ্ধ শ্রেণীর লোকেরা যে সব দেবমন্দির বিহার ইত্যাদি নির্মাণ করাতেন সেগুলিতে প্রধানত ইঁট এবং স্বল্প পরিমাণে পাথর—যেমন দরজায়, জানালায়, খিলানে, সিঁড়িতে, কোণে কোণে—ব্যবহৃত হতো।[২] সুতরাং এখানে যে পাথরগুলি দেখা যাচ্ছে, তা মন্দিরের দরজায়, জানালায়, খিলানে, সিঁড়িতে কোণে কোণে, থামরূপে বা থামসজ্জায় ব্যবহার করা হয়েছিল। এক্ষেত্রে প্রশ্ন থাকে, মন্দিরটি কোন সময় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?

এক্ষেত্রে আমরা স্মরণ করতে পারি রাইগ্রামের শিবতলায় রক্ষিত বরাহ মূর্তি, এবং কাইগ্রামের বরাহ মূর্তি।

কাইগ্রামের বরাহ মূর্তিটির সাথে জড়িত স্বপ্নতত্ত্বের ক্ষেত্রে কতটা সত্যতা আছে, জানি না। তবে গোপালডাঙ্গার ধ্বংসাবশেষ থেকে বরাহমূর্তিটির আবিষ্কার, এবং কাইগ্রামের ব্রহ্মচারীদের হাতে যাওয়ার ক্ষেত্রে কোন অসত্যতা আছে বলে মনে হয় না। কারণ, রাইগ্রামের শিবতলায় রক্ষিত বরাহদেব, বা

আবিষ্কৃত বিষ্ণু বিশেষভাবে রাইগ্রামে পূজা পাচ্ছেন না, সেখানে প্রথম আবিষ্কারটি (কাইগ্রামের বরাহদেব) অন্য গ্রামের হলেও একজন সাধক ব্রহ্মচারীর হাতে তুলে দেওয়াই স্বাভাবিক। তাই কাইগ্রামের বরাহ মূর্তিটি রাইগ্রামের গোপালডাঙ্গা থেকে প্রাপ্ত, এমন দাবির সত্যতাকে অস্বীকার করা যায় না। সেক্ষেত্রে রাইগ্রামের শিবতলায় রক্ষিত বরাহ মূর্তিটির গঠন বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে বলা যায়, মূর্তিটি হয়তো সদর দরজার মাথার উপর বসানো ছিল মন্দিরটিকে আদি বরাহদেবের মন্দির জ্ঞাপনার্থে। আর কাইগ্রামের বরাহ মূর্তিটির গঠন বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে বলা যায়, মূর্তিটি গঠিত হয়েছিল গর্ভগৃহে প্রতিষ্ঠা করে নিয়মিত অর্চনার জন্য। সুতরাং এই দুই বরাহমূর্তির প্রমাণে বলা যায়, মন্দিরটি ছিল বরাহদেবের মন্দির। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন যে পাল-চন্দ্র-কম্বোজপর্বের বাংলাদেশে বিষ্ণুর দশটি অবতারের মধ্যে প্রধানত বরাহ, নরসিংহ এবং বামন বা ত্রিবিক্রম এই তিনজনই স্বাধীন ও স্বতন্ত্র পূজা লাভ করতেন।[৩] অন্যদিকে, ডঃ নীহাররঞ্জন রায় আবার বলেছেন যে সেন পর্বের কয়েকটি অবতার-মূর্তিও বাংলাদেশের নানা জায়গায় পাওয়া গেছে; এদের মধ্যে বরাহ ও নরসিংহ অবতারই প্রধান।[৪] আর এই দুই উক্তি থেকে বলা যায়, মন্দিরটি পাল বা সেন যুগে নির্মিত হয়েছিল। সেক্ষেত্রে শ্রীঅনুকূল চন্দ্র সেন এবং শ্রীনারায়ণ চন্দ্র চৌধুরী বলেছেন "মন্তেশ্বর থানার রাইগ্রামে মহারাজা লক্ষ্মণ সেনের মন্ত্রী ও সুহৃৎ মহাসামন্ত চূড়ামণি বটুকদাস আদি-বরাহরূপধারী বিষ্ণুর একটি বিরাট মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন।"[৫] এখন দেখা যেতে পারে, এই মন্তব্য কতদূর যুক্তিগ্রাহ্য?

গোপালডাঙ্গার ঢিবিটি দেখে মনে হয়, মন্দিরটি ছিল একটি উত্তুঙ্গ দেব-মন্দির। উমাপতি ধর লিখে গেছেন যে বিজয় সেন অনেক 'উত্তুঙ্গ দেবমন্দির' এবং 'বিস্তীর্ণ (বিতত) তল্ল' প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।[৬] ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন, "সেন রাজারা রাঢ়ের লোক।"[৭] বিশেষ করে সূচনা পর্বে তাদের শাসনভূমি ছিল দক্ষিণ রাঢ়। আর "সেন-রাজারা বরেন্দ্রীতে ও দক্ষিণ রাঢ়ে পাথরের মন্দির গড়াইয়া দেবতা-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।"[৮] ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন যে লক্ষ্মণ সেনের প্রতিষ্ঠিত আদি বরাহের দেব রাজ্যের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন মহাসামন্ত চূড়ামণি বটু দাস।[৯]

কেউ কেউ মনে করেন যে ত্রিবেণীতে জাফর খাঁ গাজীর নির্মিত সমাধি ও

মসজিদটি যে হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ নিয়ে গঠিত, তা ছিল আদি-বরাহের মন্দির, এবং তার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন শ্রীধর দাসের পিতা বটু দাস। কিন্তু তা অনুমান নির্ভর। সেখানে বরাহের মূর্তি আবিষ্কৃত হয় নি। সেখানে 'কৃষ্ণমূর্তি'[১০] আবিষ্কৃত হয়েছে। অথচ দক্ষিণ রাঢ়ের অন্তর্গত রাইগ্রামের গোপালডাঙ্গা থেকে দুটি বরাহমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। এ থেকে আমরা রাইগ্রামকে আদি বরাহের দেবরাজ্য এবং গোপালডাঙ্গার মন্দিরটিকে আদিরবাহের মন্দির বলে সনাক্ত করতে পারি।

এক্ষেত্রে রাইগ্রামের (<রায়গ্রাম) চতুপার্শ্বস্থ কয়েকটি গ্রামের নাম বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। যেমন, রাউতগ্রাম। এই গ্রামনামটি রাজপুত্রের সাথে সম্পর্কিত। কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত নৈহাটিতে প্রাপ্ত ভূমিদান পট্টে বল্লাল সেন তাঁর সভাকবিকে দিয়ে লিখিয়েছিলেন—

> বংশে তস্যাভূদয়িনি সদাচারচর্যানিরূঢ়ি—
> প্রৌঢ়াং রাঢ়ামকলিতগুণৈ র্ভূষয়ন্তোহনুভাবৈঃ
> শশ্বদ্‌বিশ্বাভয়বিতরণস্থূললক্ষ্যাবলক্ষৈঃ
> কীর্তুল্লোলৈ, স্নপিতবিয়তো জজ্ঞিরে রাজপুত্রাঃ।

অর্থাৎ তাঁর (চন্দ্রের) উন্নতিশীল বংশে রাজপুত্রেরা (রাউতরা) জন্মেছিলেন। সদাচাব চর্যায় দীর্ঘকাল যাবৎ প্রখ্যাত রাঢ়াকে তাঁরা অসম্ভাবিত গুণ ও চরিত্র দ্বারা ভূষিত করেছেন।[১১] সুতরাং এখানে যখন ডঃ সুকুমার সেন রাজপুত্রের অপভ্রংশে 'রাউত' শব্দটিকে গ্রহণ করেছেন, তখন রাউতগ্রামের বিশেষ তাৎপর্যকে অস্বীকার করা যায় না 'রাউত' শব্দের অর্থ 'রাজপুত সৈন্য' থাকা সত্ত্বেও। আবার কায়স্থদের (করণিকদের) গ্রাম অর্থে অপভ্রংশে 'কাইগ্রামে'র নামটিও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তাছাড়া, পার্শ্ববর্তী সেনহাটি নামটিও তাৎপর্যপূর্ণ। সুতরাং সামগ্রিক বিচারে শ্রীঅনুকূলচন্দ্র সেন ও শ্রীনারায়ণ চন্দ্র চৌধুরীর মতটিকে সমর্থন করা যায়। অর্থাৎ আদি বরাহের মন্দির তথা গোপাল মন্দিরটি সেন যুগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলা যায়।

মানব ব্রহ্মচারী তাঁর পিতামহ শ্রীরাধিকানাথ ব্রহ্মচারীর লেখা থেকে জানতে পারেন যে রাইগ্রামের গোপাল মন্দিরের মাথায় সূর্যমণি পাথর ছিল। সূর্যের কিরণ পড়লে মনে হত যেন আর একটা সূর্য জ্বলছে। হাবশীরা সেই পাথর

ধনরত্নসহ লুণ্ঠন করে নিয়ে যায়।—এখানে এই যে তথ্য, এই তথ্য শ্রীরাধিকানাথ ব্রহ্মচারী অবশ্যই জনশ্রুতি থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। এখন দেখতে হবে, এই জনশ্রুতির মধ্যে কতটা সত্য আছে।

এক্ষেত্রে আমরা যদি সিয়ান গ্রামের নয় পালের শিলালেখ পাঠ করি, তবে দেখব, মন্দির সমূহে স্বর্ণকলস স্থাপন একটি রীতি ছিল। যেমন, ঐ শিলালেখের তৃতীয় নং শ্লোকে জগন্মাতার জন্য স্বর্ণকলস শোভিত শিলাবলভী, ৬নং শ্লোকে ক্ষেমেশ্বর শিবের স্বর্ণকলসশোভিত শিলামন্দির, ১৩ নং শ্লোকে সোমতীর্থের কোন মন্দিরে স্বর্ণকলসশোভিত শিলামন্দির নির্মাণ করার উল্লেখ আছে। তাছাড়া, ১৮ নং শ্লোকে বৈদ্যনাথ মন্দির শিখরে স্বর্ণকলস স্থাপনের, ১৯নং শ্লোকে অট্টহাসে জগন্মাতার মন্দিরে স্বর্ণকলস স্থাপনের উল্লেখ আছে।[১২] আর এই স্বর্ণকলস স্থাপনের রীতি যে সেনযুগ পর্যন্ত প্রসারিত না ছিল, তা বলা যায় না। আর সেই সূত্রেই বলা যায়, রাইগ্রামের গোপাল মন্দিরের মাথায় 'সূর্যমণি পাথর' নয়, হয়তো স্বর্ণকলসই স্থাপিত ছিল।

সিয়ান গ্রামের শিলালেখের ১২নং শ্লোকেই স্বর্ণকলসের ঔজ্জ্বল্যের উল্লেখ রয়েছে।[১৩] সুতরাং স্বর্ণকলসের উপর সূর্যের কিরণ পড়ে তা যে দ্বিতীয় সূর্য হয়ে উঠবে, সেটাই স্বাভাবিক।

এক্ষেত্রে প্রশ্ন থাকতে পারে, আদি বরাহের মন্দিরটি কেন গোপাল মন্দির নামে কথিত হয়েছিল ?

৺নৃসিংহ প্রসাদ ভট্টাচার্য বলেছেন যে খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দী থেকে খ্রীষ্টীয় ১৩শ শতাব্দী মধ্যে ভাগবত ধর্মে বিষ্ণুর স্থান ক্রমশঃ বাসুদেব কৃষ্ণ এবং তারপর গোপালকৃষ্ণ (বৃন্দাবনলীলায় শ্রীকৃষ্ণ) অধিকার করেন।[১৪] সেক্ষেত্রে বিষ্ণু তথা গোপালের অবতার তথা স্বরূপ শক্তি (অবতার) যখন বরাহ, তখন মন্দিরটি গোপাল মন্দির নামেই অভিহিত হয়েছিল।

গোপাল ডাঙ্গার বিষ্ণুমন্দিরের পাশেই রয়েছে গোরাচাঁদের মাজার। এই গোরাচাঁদকে নাট্যকার শ্রীভৈরব গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'অশ্রু দিয়ে লেখা' নামক যাত্রাপালায় এক পরিচয়হীন যুবক নামে চিহ্নিত করেছেন, যিনি ছিলেন পরোপকারী, এবং যিনি সাতসৈকার রাজার পক্ষে যুদ্ধ করতে গিয়ে নিহত হন। সেই যুদ্ধে এক মুসলমান মেয়েকে রক্ষা করতে এলোকেশী নাম্নী এক মহিলা প্রাণ দেন। তা'তে সাতসৈকার রানী বলেছিলেন যে সতী শিরোমণি আদর্শ

রমণী এলোকেশীর নামে একটা দীঘি খনন করাবেন। আর সেই দীঘিই এলো-দীঘি নামে খ্যাত হয়।

যুদ্ধটি নাকি হয়েছিল সাতসৈকার রাজার সাথে সাইফুদ্দিন মজঃফর শাহ তথা সিদি বদরের। সেক্ষেত্রে সুলতানী লাভের ক্ষেত্রে হোসেন শাহকে নাকি গোরাচাঁদ সহায়তা করেছিলেন। তাই যাত্রাপালায় তাঁর সাথে হুসেন শাহের একটি ঘনিষ্ট সম্পর্ককে চিহ্নিত করা হয়েছে।

এখানে কিন্তু সিদি বদরের নামের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি রয়েছে। সিদি বদরের নাম সাইফুদ্দিন মজঃফর শাহ নয়। তিনি শামসুদ্দীন মুজাফফর শাহ নাম ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। এঁর সম্বন্ধে 'তবকাৎ-ই-আকবরী', 'মাসির-ই-রহিমী', 'তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা' ও 'রিয়াজ-উস্‌-সলাতীন'—এই চারটি বইয়ে লেখা আছে যে রাজা হয়ে তিনি বহু শিক্ষিত, ধার্মিক ও সম্ভ্রান্ত লোককে হত্যা করেন এবং হিন্দু রাজাদের যমালয়ে প্রেরণ করেন। পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ তাঁর অধিকারভুক্ত ছিল না।[১৫] আর তা যদি হয়, তবে বলা যেতে পারে, তিনি রাজ্যজয়ের আশায় সাতসৈকায় অভিযান প্রেরণ করতে পারেন। কিন্তু কেবল সাতসৈকায় কেন, তিনি যে কোথাও রাজ্যজয়ের জন্য অভিযান করেছিলেন, তার ইঙ্গিত কোন গ্রন্থেই নেই।

সিদি বদর তথা শামসুদ্দীন মুজাফফর শাহ সর্বসাকুল্যে দেড় বছরের মতো রাজত্ব করেছিলেন। শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় বলেছেন, "অনেকেই লিখেছেন যে হাব্‌শীদের দৌরাত্ম্যের ফলে ১৪৮৭ থেকে ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাংলাদেশে পর পর অনেকগুলি রাজা নিতান্ত অল্প সময় রাজত্ব করার পরে নিহত হন। কিন্তু আসলে এই ব্যাপারের জন্যে হাব্‌শীদের চেয়ে পাইকরাই বেশী দায়ী। বিভিন্ন রাজার আততায়ীরা (তারা সকলেই হাব্‌শী নয়) এই পাইকদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেই রাজাদের হত্যা করেছে।"[১৬] এখানে বাংলাদেশের রাজারা অর্থে গৌড়ের সুলতানগণ।

যেখানে ১৪৮৭ থেকে ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দ—এই ৬ বৎসরে গৌড়ের সিংহাসনে বসেন ৪ জন সুলতান, এবং প্রত্যেকেই পাইকদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেই সুলতান হন, এবং প্রত্যেকেই ষড়যন্ত্রেই নিহত হন, সেখানে মাত্র দেড় বছরের রাজত্বকালে (১৪৯১—১৪৯৩ খ্রীঃ) সিদিবদর বিজয়-অভিযানকে দূরে রেখে আত্মরক্ষার্থে নিজের ঘর সামলাতেই যে ব্যস্ত থাকবেন, সেটাই স্বাভাবিক। সেক্ষেত্রে তিনি

অন্যদিকে মন দিতে পারেন নি বলেই "তিনি বাংলাদেশের একটা বড় অঞ্চলে নিজের অধিকার হারিয়েছিলেন।"[১৭]

হাজী মুহম্মদ কন্দাহারীর মতে ('তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা' ও 'রিয়াজ-উস্‌-সলাতীনে' উল্লিখিত) মুজাফফর শাহের সঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়েছিল। ১,২০,০০০ লোক এই যুদ্ধে নিহত হবার পরে মুজাফফর শাহ পরাস্ত ও নিহত হন এবং বিরুদ্ধবাদীদের নেতা সৈয়দ হোসেন রাজা হন। মুহম্মদ কন্দাহারীর মতে দীর্ঘ চার মাস ধরে দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ চলেছিল। অন্যদিকে, 'তবকৎ-ই-আকবরী' ও 'মাসির-ই-রহিমী'তে বলা হয়েছে যে হোসেন পাইকদের সর্দারকে ঘুস দিয়ে হাত করে কয়েকজন অনুচর সঙ্গে নিয়ে মুজাফফর শাহের অন্তঃপুরে ঢুকে তাকে হত্যা করে।[১৮] কিন্তু এখানেও রয়েছে মতদ্বৈততা।

এখন যদি মুজাফফর শাহ গুপ্ত হত্যার দ্বারা নিহত হন, তবে দীর্ঘ চার মাস যুদ্ধ—এই ঘটনাকে অতিরঞ্জিত বলে মনে হয়। এক্ষেত্রে শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়ও বলেছেন যে মুজাফফর শাহ সম্বন্ধে পূর্বোল্লিখিত ইতিহাস গ্রন্থগুলির বিবরণে খানিকটা অতিরঞ্জন আছে।[১৭] আর যদি যুদ্ধ হয়েই থাকে, তবে তা রাজধানী, এবং তার চতুপার্শ্বস্থ অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল, তা সাতসৈকা পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল বলে মনে করা যায় না। আর সেই সূত্রে বলা যায়, ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়ের 'গোরাচাঁদ এবং এলাদীঘি' সংক্রান্ত কাহিনী অনৈতিহাসিক।

অন্যদিকে, আমরা সুলতান হুসেন শাহের শাসনবৃত্তে দুজন 'গোরাই'কে পাচ্ছি। একজন গৌরাই মল্লিক, যিনি ত্রিপুরা অভিযানে হুসেন শাহী বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। অন্যজন গোরাই (কাজী), যিনি স্বয়ং শান্তিপুর অঞ্চলের কাজী বা শান্তিপুর অঞ্চলের কাজী মুলুকের অমাত্য ছিলেন।

শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় বলেছেন যে তিনি (হুসেন শাহ) রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় শাসনকার্য নির্বাহের জন্য উপযুক্ত রাজকর্মচারী পাঠাতেন।[২০] আর তা যদি হয়, যদি তিনি মুলুক কাজীর অমাত্য না হয়ে নিজেই স্বয়ং কাজী হন, তবে দুই গোরাই এক্ষেত্রে একজনও হতে পারেন। কারণ, হুসেন শাহ তাঁর সেনাপতি গৌরাই মল্লিককে শান্তিপুর অঞ্চলের কাজীরূপে প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। কিন্তু আমরা গৌরাই মল্লিককে রাইগ্রামের গোরাচাঁদ রূপে কল্পনা করতে পারি না। কারণ, যাত্রা পালাকার শ্রীভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়ের বিবরণ অনুযায়ী হোসেন শাহের সিংহাসন প্রাপ্তির সূচনালগ্নেই (১৪৯৩ খ্রীঃ)

গোরাচাঁদের মৃত্যু হয়, আর ১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দে হুসেন শাহের সেনাপতিরূপে গৌরাই মল্লিক ত্রিপুরার একাংশ জয় করেন। সুতরাং গোরাচাঁদের ঐতিহাসিকতা এদিক থেকেও খুঁজে পাওয়া যায় না।

আমরা সিয়ান গ্রামের শিলালেখ থেকে জানতে পারি যে পালযুগে অনেক মন্দিরেরই অঙ্গ ছিল সরোবর, অর্থাৎ মন্দির প্রতিষ্ঠার সাথে দীঘি খনন ছিল একটি রীতি।[২১] আর এই রীতি সেনযুগেও অব্যাহত ছিল। ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন, "সেন-বংশের প্রতিষ্ঠাতা বিজয় সেন বরেন্দ্রভূমিতে ভট্ট ভবদেবের মত দেবমন্দির সরোবর ও উদ্যান নির্মাণ করাইয়া প্রদ্যুম্নেশ্বর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।"[২২] আর তা যদি হয়, তবে উদ্যান (ফুলবাড়ি) সহ এলোদীঘিকে গোপাল মন্দিরের অঙ্গ বলা যেতে পারে। এক্ষেত্রে এলোদীঘির অর্থ বিস্তৃত দীঘি।

এখন প্রশ্ন, মন্দিরটি ধ্বংস হয় কখন? এক্ষেত্রে শ্রীঅনুকূলচন্দ্র সেন বলেছেন যে মুসলমান অধিকারের প্রথম দিকে এই মন্দিরটি বিধ্বস্ত হয়।[২৩]

আমরা মঙ্গলকোটে প্রাচীনতম যে ভগ্ন মসজিদটি পাচ্ছি, তা হুসেন শাহের আমলের, হিজরা ৯১৬, ইং ১৫০৫ খ্রীষ্টাব্দের। ইং চতুর্দশ শতাব্দীতে সৈয়দ শাহ সইফুদ্দীন খান বোখারী কাঁকসা জয় করেন। সুলতান শামসুদ্দীন য়ুসুফ শাহের রাজত্বকালে (৮৮২ হিজিরা, ইং ১৪৭৭ খ্রীঃ) হুগলী পাণ্ডুয়ায় 'বাইশ দরওয়াজা' মসজিদ নির্মিত হচ্ছে। অম্বিকা-কালনার অন্তর্গত শাসপুরের প্রাচীনতম ভগ্ন মসজিদটির নির্মাণকাল ১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দ। আর এসব প্রমাণ থেকে অনুমান করা যায়, ঐ অঞ্চলসমূহে মুসলমান অধিকারের উর্ধ্বতম কালসীমা চতুর্দশ শতক।

শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় History of Bengal (D. U., vol. II, pp. 78-80) গ্রন্থটির অনুসরণে বলেছেন যে চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম পাদে ফিরোজ শাহের রাজত্বকালে মুসলমানরা শ্রীহট্ট জয় করেন।[২৪] এরপর শাহ জালালের নির্দেশে বাইশজন আউলিয়া দক্ষিণবঙ্গে ইসলাম ধর্মপ্রচারে এসেছিলেন। আর এই তথ্য যদি সত্য হয়, তবে চতুর্দশ শতকের প্রথম পাদে ঐ অঞ্চলসমূহেও মুসলমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কারণ, ঐ সময় থেকে মুসলমান শাসকের পৃষ্ঠপোষকতা গ্রহণ করে বিশেষ বিশেষ অঞ্চল অধিকার করেন, এবং ইসলাম ধর্মের প্রসারে সচেষ্ট হন।

আলোচক বিনয় ঘোষ মঙ্গলকোটের ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে বখতিয়ার খিলজীর সময় মঙ্গলকোটে মুসলমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় নি। উড়িষ্যার গঙ্গ সেনাদের হাত থেকে সুলতান গিয়াসউদ্দিন খিলজী ১২১৪-১৫ খ্রীষ্টাব্দে রাঢ়কে উদ্ধার করে যখন দক্ষিণ উড়িষ্যা পর্যন্ত অভিযান করেন, তখন হয়তো মঙ্গলকোট সুলতানের পদানত হয়।[২৫] আর তা যদি হয়, তবে ধরে নিতে হয়, মুসলমান অধিকারের প্রথম পর্বেই মঙ্গলকোটে মুসলমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু মঙ্গলকোট আঠারো আউলিয়ার স্থান বলে পরিচিত।[২৬]—এই জনশ্রুতিকে উপেক্ষা করা যায় না, যেহেতু তাঁদেরই কয়েকজনের সমাধি রয়েছে। তাই বলা যায়, চতুর্দশ শতকের প্রথম পাদে যখন শাহ জালালের নেতৃত্বে আউলিয়াগণ ইসলাম ধর্ম প্রচার করতে এসেছিলেন, সেই সময়েই বা তারই অব্যবহিত পরেই আঠারো আউলিয়া কর্তৃক মুসলমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। আর যেহেতু জনশ্রুতি—আঠারো আউলিয়ার গ্রাম রাইগ্রাম, সেহেতু বলা যায়, ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উভয় স্থানের মধ্যে একটি যোগসূত্র ছিল। আর তা থেকে বলা যায়, মঙ্গলকোট ও কাঁকসায় ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠার কালেই রাইগ্রামেও ইসলামধর্মের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। সেক্ষেত্রে মন্দির ও দেবপ্রতিমাগুলিকে ভগ্ন করা হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন যে স্বাধীন সুলতানদের আমল পর্যন্ত মুসলমান ফকিরেরা এদেশে অভিযানে ও শাসনকার্যে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করতেন। তবে প্রথমদিকে এ অত্যাচার সাধারণত ধন-সম্পত্তি লুটের কারণেই। সেকালে সবচেয়ে সমৃদ্ধিপূর্ণ ছিল বিহার-দেবকুলগুলি। সেইজন্য দেউল-দেহারা ভাঙ্গার দিকে ঝোঁক ছিল বেশি।[২৭] এক্ষেত্রেও সেই একই কারণে গোপাল মন্দিরকে ধ্বংস করা হয়েছিল। অবশ্য অভিযানকারীরা মন্দিরের কিছু ক্ষতিসাধন করলেও এক একটি ইঁট খসিয়ে মন্দির ধ্বংস করে নি। মন্দির পরিত্যক্ত হওয়ার ফলে বাঙলার জলবায়ুর প্রভাবে, এবং গাছেদের শিকড়সমূহের আক্রমণে জীর্ণতা প্রাপ্ত হয়ে ধ্বংস হয়।

বর্ধমানের কাঁকসা থানার কাঁকসা প্রসঙ্গে শ্রীযজ্ঞেশ্বর চৌধুরী বলেন, "কিংবদন্তী আছে যে, সদগোপ রাজা কনক সেনকে পরাজিত করে সৈয়দ শাহ সইফুদ্দীন খান বোখারী এতদঞ্চল অধিকারপূর্বক বসবাস করেন।"[২৮] আবার এই প্রসঙ্গেই বিনয় ঘোষ বলেছেন যে সৈয়দ বোখারী কাঁকসার গড় ও দুর্গ

দখল করে রাজাকে হত্যা করেন এবং জমিদারি মুসলমানদের 'আয়মা' দেন। কাঁকসা অঞ্চলের আয়মাদার মুসলমানরা তাঁদেরই বংশধর।[২৯] অন্যদিকে, গোরাচাঁদের এক খাদেম মোল্লা আবুল হাসেম ১৮. ১০. ৯৪ তারিখের এক সাক্ষাৎকারে বলেন যে গোরাচাঁদের আসল নাম খাজা মনিরুদ্দিন বোখারী। বোখার থেকে এসেছিলেন। গায়ের রং ফরসা ছিল বলে হিন্দুরা বলতেন, গোরাচাঁদ। এখানেও যেন একটা যোগসূত্র আছে বলে মনে হয়। কারণ, উভয়ক্ষেত্রেই অভিযানকারীদের উপাধি 'বোখারী'। তাছাড়া, রাইগ্রামের সন্নিহিত অঞ্চলে আয়মাদারগণ বাস করেন। এ থেকে আমরা জনশ্রুতির সূত্রে অনুমান করতে পারি, খাজা মনিরুদ্দিন বোখারী অভিযান সাঙ্গ করে জমিদারি মুসলমানদের 'আয়মা' দেন। তবে ইহা অনুমান মাত্র। ইনি আবার পরবর্তী সময়ের মানুষ হতে পারেন, এবং এঁর ভূমিকা হয়তো অন্য ছিল। জনশ্রুতি যা-ই হোক না কেন, গোরাচাঁদের মাজার মূলতঃ গোরাই গাজীর নজরগাহ অর্থাৎ গোরাচাঁদের প্রতীক সমাধি। এক্ষেত্রে গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু বলেছেন যে কয়টি পীর গাজী বিবি বাংলাদেশের পল্লী সমাজের হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের পূজ্য হয়েছেন, বা লৌকিক দেবকুলে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন, তাঁদের মধ্যে পীর গোরাচাঁদের প্রতি জনভক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক ও ব্যাপক। চব্বিশ পরগণা, বর্ধমান, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলায় বিভিন্ন পল্লীতে এঁর প্রকৃত সমাধি থাকলেও সমাধির প্রতীক স্তূপ বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় দেখা যায়, হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের বহু ব্যক্তি এরূপ সমাধিতে গোরাচাঁদের উদ্দেশ্যে পূজা-হাজোত দেন।[৩০]

ডঃ আবদুল গফুর সাহেব বলেছেন যে গোরাচাঁদের প্রকৃত নাম—সৈয়দ আব্বাস আলি। তিনি খ্রীঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষের দিকে প্রসিদ্ধ ধর্মপ্রচারক শাহ জালালের দলভুক্ত হয়ে মক্কা থেকে ভারতে আসেন, এবং ইসলামধর্ম প্রচারের জন্য নানাস্থানে ভ্রমণ করার পর চব্বিশ পরগণা জেলার বালাণ্ডা অঞ্চলে আসেন। আব্বাস আলি বহু অলৌকিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। প্রথমে তিনি বালাণ্ডার রাজা চন্দ্রকেতুকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করতে চেষ্টা করেন, পরে হাতিয়াগড়ে প্রচার করতে গেলে সে স্থানের রাজার সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ হয়, তার ফলে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁকে হাড়োয়া নামক স্থানে কবরস্থ করা হয়।[৩১] তিনি নাকি নানারূপ বুজরুগী বা অলৌকিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি

রাজা চন্দ্রকেতুকে লোহার কলা পাকিয়ে, এবং বেড়াতে চাঁপার ফুল ফুটিয়ে দেখান।[৩২] আর এই সব কাহিনী আউলিয়া, পীর, ফকিরদের দ্বারা মুখে মুখে প্রচারিত হতে থাকায় তাঁর প্রতি জনভক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক ও ব্যাপক হতে থাকে।

ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন যে মুসলমান পীরের আস্তানায় জাতিভেদের গণ্ডী ও ছুঁই-ছুঁইয়ের বেড়া না থাকায় সাধারণ লোকে সেখানে গেলেই এমন খানিকটা আশ্বাস ও নির্ভর পেত, যা তারা এর আগে অন্য কোন দেবস্থানে সহসা পায় নি। সে সময়ের পীররা প্রায়ই পুরানো হিন্দু দেবস্থানের সন্নিকটে আস্তানা গাড়তেন। সেই যোগাযোগে প্রাচীন দেবতার উত্তরাধিকারও খানিকটা যেন তাঁরা পেয়েছিলেন লোক চক্ষে।[৩৩] আর এ কথা রাইগ্রামের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য বলেই মনে হয়। এক্ষেত্রে হয়তো কোন আউলিয়া (ইনি খাজা মনিরুদ্দিন বোখারীও হতে পারেন) ধ্বংসপ্রাপ্ত বিষ্ণুমন্দিরের পাশেই আস্তানা গেড়ে পীর গোরাগাঁদের প্রতীক সমাধি স্থাপন করে গোরাচাঁদের পূজার প্রবর্তন করেন।

এই গোরাচাঁদের সাথে হাড়োয়ার গোরাচাঁদের যে বিশেষ যোগ আছে, তার দু একটি সূত্র পাওয়া যায়। যেমন, পীর গোরাচাঁদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে প্রতি বছর দু একদিনের ব্যবধানে মেলা বসে। হাড়োয়ার মেলাটি শুরু হয় ১১ই ফাল্গুন। উত্তর ২৪-পরগণার জাফরপুর মৌজার ঘোড়ারাস গ্রামের বৌমেলা, অর্থাৎ গোরাচাঁদের মেলা বসে ১২ই ফাল্গুন। আর রাইগ্রামে মেলা বসে ১৩ই ফাল্গুন।

শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু বলেছেন যে ব্যাঘ্রবাহন গোরাচাঁদ বর্তমানে অতি বিরল।[৩৪] এখানে এই উক্তি থেকে বলা যায়, গোরাচাঁদ ব্যাঘ্রবাহন। অন্যদিকে, রাইগ্রামের গোরাচাঁদের সাথেও ব্যাঘ্রের সম্পর্ক আছে। তাই শীতকালে ফেউ ডাকলে শৈশবকালে আগুরী অঞ্চলের লোককে বলতে শুনেছি, বাঘ গোরাই নমস্কার করতে যাচ্ছে। তাছাড়া, সমুদ্রগড়ের রাজপরিবারের আসাতুল সাহেব বর্তমান লেখকের সাথে ৪. ১০. ১৯৮৭ সালে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যে তিনি তাঁর ঠাকুরদার (ফজলে করিম খান) মুখে শুনেছিলেন—গোরাচাঁদ বাঘের পিঠে চড়ে সমুদ্রগড়ে এসেছিলেন তাঁদেরই বংশের মধু ঠাকুরের (মোজাহার খান) কাছে।—এখানে এই বক্তব্য কালানৌচিত্য দোষে দুষ্ট হলেও এর মধ্যে

এই ইঙ্গিতই রয়েছে যে রাইগ্রামের ক্ষেত্রেও গোরাচাঁদ ব্যাঘ্রবাহন। সুতরাং এই দুই সূত্র থেকে উভয়ের যোগসূত্রটি আবিষ্কার করা যায়, এবং রাইগ্রামের মাজারটি যে গোরাচাঁদের প্রতীক সমাধি, তা সনাক্ত করা যায়।

গোরাচাঁদের মাজারটি এক গম্বুজবিশিষ্ট স্থাপত্য। ১২ ফুটের পরে ধনুকাকৃতি কার্নিস। ১৫´×১৫´ আয়তনের একক কক্ষবিশিষ্ট। এর উচ্চতা প্রায় ২৫´। এর দক্ষিণ ও পূর্বদিকে রয়েছে দুই দরজা। মাথা নত করে গর্ভগৃহে প্রবেশ করতে হয়। গর্ভগৃহের মধ্যে রয়েছে পীর গোরাচাঁদের প্রতীক মাজার।

এই মাজারের সাথে সমুদ্রগড়ের ধর্মান্তরিত রাজাদের একটি বিশেষ যোগ ছিল। কারণ, গোরাচাঁদের মাজার প্রাঙ্গনেই রয়েছে তাঁদের পারিবারিক সমাধি, এবং তাঁরাই গোরাচাঁদের সেবার জন্য ২৫০ বিঘা সম্পত্তি নাকি দান করেছিলেন। এখন দেখা যেতে পারে, সমুদ্রগড়ের রাজারা কোন সময় থেকে মাজার প্রাঙ্গনটিকে পারিবারিক সমাধিরূপে ব্যবহার করেছিলেন?

ডঃ অলোককুমার চক্রবর্তী বলেছেন যে, কৃষ্ণরামের পুত্র জগৎরাম কোন রকমভাবে আত্মরক্ষা করে প্রথমে কৃষ্ণনগরাধিপ রামকৃষ্ণের আশ্রয়ে আসেন।[৩৫] এই আসার সময়টা ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দ। এই সময়ে রামকৃষ্ণ কৃষ্ণনগরাধিপ। আর ১৭০৫ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদকুলী খাঁ বাংলার সুবাদার।[৩৬] এরই অব্যবহিত পরেই খাজনাসংক্রান্ত ব্যাপারে তিনি রাজা রামকৃষ্ণকে বন্দী করে রাখেন। সেই একই ব্যাপারে বন্দী হন সমুদ্রগড়ের রাজা। সমুদ্রগড় থেকে খাজনার টাকা এলে বন্ধুকৃত্যের জন্য সেই টাকা কৃষ্ণনগরের রাজা রামকৃষ্ণের হাতে তুলে দেন। কিন্তু নিজের খাজনা পরিশোধ করতে না পারার জন্য সমুদ্রগড়ের রাজাকে জাতিচ্যুত হতে হয়।[৩৭] এই প্রসঙ্গে মোহিত রায় বলেছেন যে সমুদ্রগড়ের এই রাজার নাম রণজিৎ ভট্ট ঠাকুর। ধর্মান্তরিত হওয়ার পর তাঁর নাম হয় আতাহার খান।[৩৮] কিন্তু শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ সিংহরায় 'সমুদ্রগড়ের পুজো' নামক প্রবন্ধে বদরুল আলম খান (মুকুল ঠাকুর)-এর নিকট শ্রুত হয়ে যে বংশলতিকা উদ্ধার করেন[৩৯], তা ৪. ১০. ১৯৮৭-র সাক্ষাৎকারে বদরুল আলম খান (মুকুল ঠাকুর), এবং আসাদুল খান কিছুটা সংশোধন করে দেন বর্তমান লেখককে। সেই সংশোধিত বংশলতিকা হচ্ছে—আতাহার খান (জনার্দন ঠাকুর)>আজাহার খান (যদু ঠাকুর)>মোজাহার খান (মধু ঠাকুর)>মহঃ এছামৎ খান

(মাখনলাল ঠাকুর) > জিল্লা রহিম খান > বদরুল আলম খান (মুকুল) > রফিকুল খান।

সুতরাং মোহিত রায় যে রণজিৎ ভট্ট ঠাকুরকে আতাহার খান বলেছেন, তা কিন্তু যথার্থ নয়। তাছাড়া, রামকৃষ্ণের সময় থেকে বর্তমান সময়ের ব্যবধান প্রায় ৩০০ বৎসর। এক্ষেত্রে ৩০ বৎসরে ১ পুরুষ ধরলে ১০ পুরুষ হয়।

জগৎরাম রায়ের সময় থেকে বর্ধমান রাজবংশের বংশলতিকা হচ্ছে :
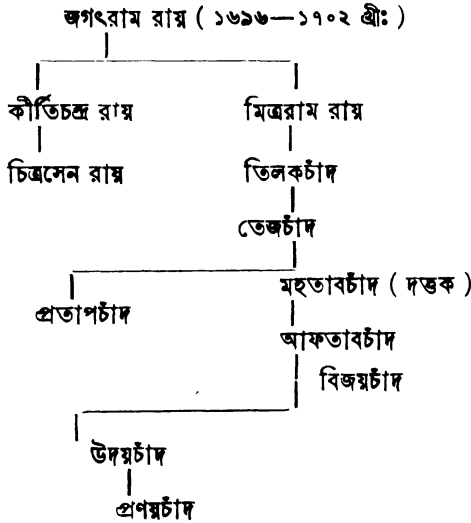
এখানে চিত্রসেন রায় এবং তিলকচাঁদ খুঠতুতো-জেড়তুতো ভাই বলে এক পুরুষ, মহতাবচাঁদ প্রতাপচাঁদের দত্তক ভ্রাতা বলে এক পুরুষ, এবং প্রণয়চাঁদের পর এক পুরুষ ধরলে এখানেও ১০ পুরুষ হয়।

আবার রামকৃষ্ণ রায়ের সময় থেকে কৃষ্ণনগর রাজবংশের বংশলতিকা হচ্ছে :
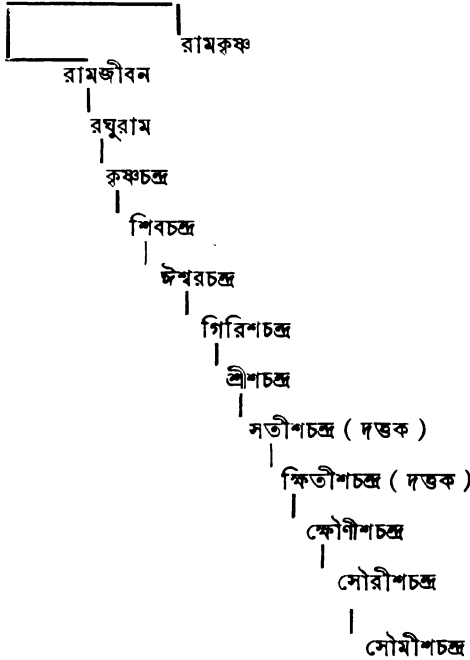
এখানে রামকৃষ্ণ—রামজীবন বৈমাত্রেয় ভাই বলে এক পুরুষ, এবং দুজন পর পর দত্তককে একপুরুষ ধরলে এখানে ১১ পুরুষ হয়।

সুতরাং বর্ধমান ও কৃষ্ণনগর রাজবংশের বংশলতিকার অনুসরণে বলা যায়, রণজিৎ ভট্ট ঠাকুরের সময় থেকে সমুদ্রগড়ের রাজবংশের ১০ বা ১১ পুরুষ হবে।

শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বাঙ্গালার ইতিহাস (অষ্টাদশ শতাব্দী, নবাবী আমল, ১৩১৫, পৃঃ—৪৯৮) নামক গ্রন্থে বলেছেন যে মুসলমান যুগে সাতসৈকা পরগণার হিন্দু জমিদার মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন এবং মুর্শিদকুলী খাঁর (খ্রীঃ ১৭১৭-২৭) আমলে এই বংশের এক্রাম চৌধুরীর সঙ্গে তিন পরগণায় ৫১,১৬৭ টাকা জমা ধার্য হয়। পরবর্তীকালে জমিদারী হস্তচ্যুত হলেও এঁরা সমুদ্রগড়ের রাজা বলে পরিচিত ছিলেন।[৪০] এখানে এই যে বক্তব্য, এর

অনুসরণে বলা যায়, যে হিন্দু জমিদার মুসলমান ধর্মগ্রহণ করেন, তিনি অবশ্যই রণজিৎ ভট্টঠাকুর। এর পর এক্রাম চৌধুরী।

এই এক্রাম চৌধুরীর প্রসঙ্গ তুলতেই বদরুল আলম খানের বড় ভাই সামসুল আলম খান ১২. ১১. ১৯৯৬ তারিখের এক সাক্ষাৎকারে বর্তমান লেখককে যে বংশলতিকা শোনান, তা হলো—
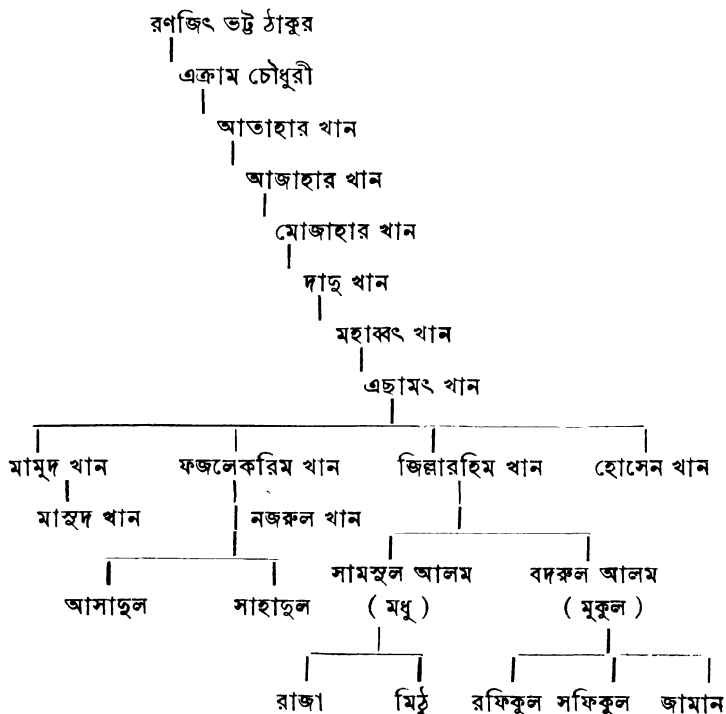
সুতরাং এই বংশলতিকা অনুসারে সমুদ্রগড় রাজবংশের ১১ পুরুষ পাচ্ছি। শ্রীবিনয় ঘোষ বলেছেন যে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় সাতসৈকা পরগণা নদীয়ারাজভুক্ত হয়। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমানের সাথে যুক্ত হয়।[৪১] আর তা যদি হয়, তবে দেখতে হবে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দটি কার সময়কাল পর্যন্ত প্রসারিত ?

আমরা ১৬৯৬ থেকে ১৭৯৩ পর্যন্ত ৬ জনকে কৃষ্ণনগরের, এবং ৫ জনকে বর্ধমানের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখি। সেক্ষেত্রে সমুদ্রগড়ের রাজপরিবারের বংশলতিকায় পঞ্চম ব্যক্তি হচ্ছেন মোজাহার খান, এবং ষষ্ঠ পুরুষ দাতু খান। এখন প্রশ্ন, ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দটি কার সময়কালের মধ্যে পড়ে?

এখন মুর্শিদকুলী খাঁ ১৭১৭ থেকে ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দের (অবশ্য মৃত্যুকাল ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দ[৪২]) বা ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এক্রাম চৌধুরীর সঙ্গে জমিদারীত্বে চুক্তিবদ্ধ হন, এবং কিছুকাল জমিদারিত্ব ভোগ করেন, তবে তাঁর জমিদারিত্বের কাল প্রায় ১৭৩৫ থেকে ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পৌঁচাচ্ছে। বাদ থাকে ৫০/৫৫ বৎসর। এর মধ্যে গড়ে ১৬/১৮ বৎসর করে রাজত্ব করলে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দটি মোজাহার খানের সময়ের মধ্যে পড়ে।

মোজাহার খানের পরে রয়েছে ৬ পুরুষ। এখন জমিদারি হারানোর পরেও তাঁর সময়কাল যদি ১৮১০ থেকে ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়, এবং প্রতি পুরুষে ৩০ বৎসর ধরলে বর্তমান সময়কাল মিলে যায়। সুতরাং এ থেকে এটাই স্পষ্ট হয় যে মোজাহার খানই ছিলেন সমুদ্রগড়ের রাজা উপাধিযুক্ত শেষ পুরুষ।

খাদিম মোল্লা আবুল হাসেম সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যে মাজারের চাতালে রয়েছে সমুদ্রগড় রাজপরিবারের তিন পুরুষের সমাধি। রাজাদের সমাধি। যদু, মধু ঠাকুর, আর একজনের নাম জানেন না। চাতালের সিঁড়ির পশ্চিম গায়ে রয়েছে সমুদ্রগড় রাজপরিবারেরই তিনজন পুরুষ, এবং একজন মহিলা (কবরের বক্ষ খোলা) সমাধি। আর মাজার গৃহের সম্মুখে চারটি চিহ্নিত স্থানে রয়েছে চার বন্ধু বা সঙ্গীর সমাধি।

এখানে দেখা যাচ্ছে যে এক্রাম খান পর্যন্ত সমুদ্রগড়ের রাজবংশের সাথে রাজা উপাধি যুক্ত হয় নি। কৃষ্ণরাম রায়, জগৎরাম রায় এবং কীর্তিচন্দ্র রায়কে যে অর্থে রাজা বলা হতো, সেই অর্থেই রণজিৎ ভট্ট ঠাকুর বা এক্রাম চৌধুরীকে রাজা বলা হতো। যতদূর সম্ভব আতাহার খানই প্রথম রাজা উপাধিপ্রাপ্ত হন। এই রাজারই সমাধি রয়েছে চাতালে, যেটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য সূচক। এর গায়ে যে সমাধিলিপি রয়েছে, তা যদি ঘসে না যেত, তবে আমাদের অনুমানকে মিলিয়ে নিতে পারতাম। তবু জনশ্রুতিকে উপেক্ষা না করে বলতে পারি, চাতালে রয়েছে রাজা উপাধিযুক্ত তিনজনের—আতাহার খান (জনার্দন ঠাকুর), আজাহার খান (যদু ঠাকুর) ও মোজাহার (মধু ঠাকুর) খানের সমাধি।

আসাদুল খান সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যে তিনি তাঁর ঠাকুরদা ফজলে করিম খানের কাছে শুনেছিলেন যে তাঁর পূর্বপুরুষদের এছামৎ খাঁ পর্যন্ত সকলের সমাধি রাইগ্রামে রয়েছে। সুতরাং চাতালে ওঠার সিঁড়ির পশ্চিমগায়ে রয়েছে দাহুখান, মহাব্বৎ খান, এছামৎ খান, এবং ঐ বংশেরই কোন ধর্মপ্রাণা মহিলার। আর মাজারগৃহের সম্মুখভাবে যে চারজনের সমাধি রয়েছে তাঁরা হতে পারেন ৪ জন পীর গোরাচাঁদের খাদেম, যার মধ্যে সমাধি স্তূপের প্রতিষ্ঠাতাও রয়েছেন সম্ভবত।

এক্ষেত্রে প্রশ্ন থাকে, যদি রাইগ্রামে এছামৎখান পর্যন্ত সকলেরই সমাধি থাকে, তবে রণজিৎ ভট্ট ঠাকুর, এবং এক্রাম খানের সমাধি থাকল না কেন ?

ডঃ অতুল চন্দ্র রায় বলেছেন যে ঔরঙ্গজেব সিয়া মুসলমানদের প্রধান ধর্মোৎসব 'মহরম'ও বন্ধ করে দেন। এমন কি পয়গম্বর হজরত মহম্মদের জন্মদিনেও তিনি ধর্মীয় অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করেন।[৪৩] তাছাড়া, যেখানে "মুসলমানদের শরিয়তে আল্লাহ ব্যতীত অপর কারুর উপাসনা করা নিষিদ্ধ, কোরাণে পীরবাদও নেই, মুসলমানদের উপাস্যের মূর্তি বা প্রতীক পূজা গর্হিত কর্ম[৪৪], যেখানে রণজিৎ ভট্ট ঠাকুর এবং এক্রাম চৌধুরী সেই সময়বৃত্তেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন, সেখানে তাঁদের পক্ষে গোরাচাঁদের সংস্পর্শে আসা সম্ভব ছিল না। সেক্ষেত্রে সেই সময়ে গোরাচাঁদ কিছুটা উপেক্ষিত ছিলেন। তারপর সময়বৃত্ত দূরে সরে যাওয়ায়, এবং পরবর্তী সময়বৃত্ত থেকে ঔরঙ্গজেবের ছায়া দূর হওয়ায় আতাহার খান রাজা উপাধি প্রাপ্ত হয়ে গোরাচাঁদের সংস্পর্শে আসেন। এবং তিনিই প্রথম ইষ্টক নির্মিত গোরাচাঁদের প্রতীক মাজার নির্মাণ করে দেন। সেক্ষেত্রে মাজারের নির্মাণকার্যে ভগ্ন গোপাল মন্দিরের উপাদান ব্যবহার করা হয়।

আসাদুল খান ৪. ১০. ১৯৮৭-র সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যে তিনি তাঁর পিতামহের কাছে শুনেছিলেন যে মোজাহার খান ছিলেন ফকির গোছের আলখাল্লা মানুষ। মাঝে মাঝে গায়ে লোহার শিকল জড়িয়ে থাকতেন। তিনি রাইগ্রামে গোরাচাঁদের মাজার করে দেন এবং একটা দীঘি করে দেন।

পূর্বেই বলেছি, গোরাচাঁদের সাথে তাঁর বন্ধুত্বের যে গল্পকথা, তা কালানৌচিত্য দোষে দুষ্ট। তাছাড়া, তিনি যদি মাজার করে দিতেন, তবে পূর্ববর্তী সমাধিগুলি থাকত না। পূর্বেই বলেছি, প্রথম দুজনের পক্ষে মাজার নির্মাণ করা সম্ভব ছিল না। এর পরেই আতাহার খান গোরাচাঁদের মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হয়ে ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে বর্গীর হাঙ্গামা আরম্ভ হবার পূর্বেই ইষ্টক নির্মিত মাজার

গঠন করেন।। তবে গর্ভগৃহটির মধ্যে মাজারটিকে (প্রতীক স্তূপ) যে উচ্চতায় রাখা হয়েছিল, সেই উচ্চতায় প্রাঙ্গণটিকে এবং বাইরের চাতালটিকে ভরাট করে সম উচ্চতায় সমাধিবেদী স্থাপন করেছিলেন। সেক্ষেত্রে মোজাহার খান পূর্ব থেকেই নিজের সমাধিস্থান নির্বাচন করে রেখেছিলেন। সুতরাং গোরাচাঁদের মাজারটিকে পরিবর্দ্ধিত এবং নবরূপায়িত করেন মোজাহার খান। মোজাহার খান ছিলেন ফকির গোছের মানুষ। তিনি মাঝে মাঝে গায়ে লোহার শিকল জড়িয়ে থাকতেন। আর তা যদি হয় তবে তিনি হয়তো ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের পরে কোন মাদারি গোষ্ঠীভুক্ত ফকিরের সংস্পর্শে আসেন। কারণ, নিখিল সুর বলেছেন যে মাদারি ফকিরেরা হিন্দু সন্ন্যাসীদের মতো গায়ে ছাই মাখতো, মাথায় ও গলায় পরতো লোহার শিকল।[৪৫]

শাসকবর্গ ফকিরদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। অনেক সময় তাঁরা ফকিরদের দাবি স্বীকার করে নিতেন সনদ দান করে। সেক্ষেত্রে সমস্ত মুসলমান ফকিরদের নেতারা শাহ অথবা রাজা উপাধি ধারণ করতেন।[৪৬] তাঁরা প্রধানত সুফী মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। অস্ত্রধারী এই সন্ন্যাসী ফকিরের দল অনেক ক্ষেত্রে মন্দির, মসজিদ ও পীরের দরগা স্থাপন করেছিলেন।[৪৭] আর তা যদি হয়, এবং যেখানে মোজাহার খান গলায় শিকল পরছেন, যেখানে তাঁরা জমিদারির সনদ পাচ্ছেন, রাজা উপাধি ধারণ করছেন, যেখানে মসজিদ ও পীরের দরগা নির্মাণ করছেন, যেখানে সন্ন্যাসী-ফকিরদের নেতাদের মতো মহাজনি কারবারের পত্তন, ব্যবসা-বাণিজ্যের সূচনা ও হাট স্থাপন করছেন, সেখানে মোজাহার খানকে হয়তো ফকির-গোষ্ঠীর নেতা হিসাবে ভাবা যেত। কিন্তু ভাবা যাচ্ছে না এই কারণেই যে ফকির বিদ্রোহের ইতিহাসের সূচনা ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে, কিন্তু এই রাজবংশের ইতিহাস ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দের পরে নয়। সুতরাং মোজাহার খান কোন মাদারি ফকিরের প্রভাবে পড়ে ফকিরের ন্যায় শেষ জীবন অতিবাহিত করতে পারেন, তবে ফকিরদের নেতা হয়ে রাজা উপাধি গ্রহণ করছেন, এমন মত কালানৈচিত্য দোষে দুষ্ট।

এবার দীঘির প্রসঙ্গ। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, যদি দীঘিটি সমুদ্রগড়ের রাজারা কাটিয়ে থাকেন, তবে ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই কাটানো হয়েছিল বলে ধরা যেতে পারে। কারণ, এর পরে এমন কোন অভিযান ঘটে নি, যার সাথে দেববিগ্রহ ভাঙ্গার ইতিহাস জড়িত আছে। সুতরাং দীঘি কাটানোর ক্ষেত্রে

মোজাহার খানের নামটি যুক্ত করা যায় না। গঙ্গারাম দত্তের মহারাষ্ট্র পুরাণ থেকে জানতে পারছি যে বর্গীরা সাতসৈকা পরগণা, সমুদ্রগড়, জাননগর পোড়াচ্ছে, সেই সাথে বিষ্ণু মণ্ডপও পোড়াচ্ছে। আর তা যদি হয় তবে আমরা এই অনুমান করতে পারি যে বর্গীরা বিষ্ণু মূর্তিগুলি ভগ্ন করে দীঘিতে ফেলে দিতে পারে। কিন্তু যেখানে দাঁইহাটে মারাঠা সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতের দুর্গাপূজা মণ্ডপের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে[৪৮], সেখানে বিষ্ণুমূর্তি ভাঙ্গার প্রশ্ন থাকতে পারে না। অবশ্য দেব বিগ্রহের অপবিত্রতার ভয়ে হয়তো বিগ্রহকে দীঘিতে ফেলে দেওয়া হতে পারে। কিন্তু সেখানে তো ভগ্ন বিগ্রহের প্রশ্ন থাকতে পারে না। এখানে কিন্তু দীঘি থেকে ভগ্ন মূর্তি উদ্ধার করা গেছে। তাছাড়া, রণজিৎ ভট্ট ঠাকুর এবং একরাম খানের ক্ষেত্রে দীঘি খননের প্রশ্ন ওঠে না। আবার ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে এমন কোন অভিযান ঘটে নি, যেখানে দেব বিগ্রহ ভেঙ্গে দীঘিতে ফেলা হয়েছে। তাই দীঘিটিকে সমুদ্রগড়ের রাজাদের দ্বারা খনিত না বলে গোপাল মন্দিরের অঙ্গ বলেছি।

ক্ষেত্র সমীক্ষার কালে সঙ্গী শ্রীস্বপনকুমার চন্দ আমার কাছে দুটি প্রশ্ন রেখেছিলেন। এক, যদি গোরাচাঁদের গৃহটি মুসলমানদের হতো, তবে দক্ষিণ দিকে দরজা থাকছে কেন? দুই, গোরাচাঁদের মাজারের চারদিকে হিন্দু রমণীরা ধান হলুদ কলাই ছড়াতে ছড়াতে উলু দিতে দিতে সাতবার প্রদক্ষিণ করে, এর কি অন্য তাৎপর্য রয়েছে?

প্রথম প্রশ্নের ক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে, ওটি প্রার্থনাগৃহ (মসজিদ) নয়। ওটি কৃত্রিম সমাধি গৃহ, অর্থাৎ নজরগাহ। এক্ষেত্রে মুসলমান রীতিতে সমাধি দেওয়া হয় উত্তর দক্ষিণে শবকে শায়িত করে। সুতরাং মাজার-গৃহের ক্ষেত্রে পূর্ব এবং দক্ষিণমুখী দরজা স্থাপনের ক্ষেত্রে কোন অস্বাভাবিকত্ব নেই। আর পীরের ক্ষেত্রে তাঁর ভক্তদের মাথা নত করে প্রার্থনা জানাতে হয়, হয়তো এই সংস্কারবশেই নিচু দরজা। তবে নিচু দরজাযুক্ত স্থাপত্যের নিদর্শনও রয়েছে।[৪৮] দ্বিতীয় প্রশ্নের ক্ষেত্রে ডঃ গোপীকান্ত কোঙার বলেছেন যে রাইগ্রামে পীর গোরাচাঁদের উৎসব-অনুষ্ঠান, হিন্দু মেয়েদের দ্বারা গোরচাঁদের সমাধিস্থল পরিক্রমা করা, পাশেই গোপাল মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ইত্যাদি অতীতের ঘটনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।[৫০] কিন্তু এই ব্যাখ্যাই শেষ কথা নয়। শ্রীগোপেন্দ্র কৃষ্ণ বসু বলেছেন যে গোরাচাঁদ ব্যতীত অপর কয়েকটি পীর

গাজী বিবিও বাংলা দেশের পল্লী অঞ্চলের লৌকিক দেবকুলভুক্ত আছেন, কিন্তু গোরাচাঁদ তাঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়। তার কারন সম্বন্ধে অনুমান করা যায়—তিনি বিশেষ কোন সাধনা দ্বারা সিদ্ধাই বা বুজরুকির অধিকারী হয়েছিলেন। তাঁর আবির্ভাবের কিছু কাল আগেও বৌদ্ধ তান্ত্রিক এবং শৈব তান্ত্রিক সিদ্ধাচার্যদের প্রভাবে সিদ্ধাই বা অলৌকিক শক্তির প্রতি সাধারণ লোকের একটা মোহ ছিল, ঐ শক্তির অধিকারী অনেক পীর গাজী সে কারণে পল্লীর ভক্তি শ্রদ্ধা পেতেন। গোরাচাঁদও সে সব পেয়েছিলেন এবং কালক্রমে লৌকিক দেবতার মর্যাদা লাভ করেন।[৫১] এবং যেক্ষেত্রে তিনি লৌকিক দেবতায় পরিণত হচ্ছেন, সেক্ষেত্রে তিনি আর সাম্প্রদায়িক থাকছেন না। তাই দেখা যায়, উত্তর ২৪-পরগণার ঘোরারাস গ্রামে পীর গোরাচাঁদের দরগাটি নির্মাণ করে দেন স্থানীয় নিতাই চন্দ্র ঘোষ। অন্যদিকে, ঐ এলাকার বৌ এবং মেয়েরাই পীর গোরাচাঁদের দরগায় দুধ ঢালে এবং বৌয়েদেরই শুধুমাত্র অংশগ্রহণ বলে মেলাটিকে 'বৌ মেলা' বলা হয়ে থাকে।[৫২] এক্ষেত্রেও কিন্তু তারই অনুসরণ দেখা যায়। তাছাড়া, যেক্ষেত্রে তিনি লৌকিক দেবতায় পরিণত হচ্ছেন, সেক্ষেত্রে উভয় সম্প্রদায়ের মানুষেরা স্ব স্ব লৌকিক আচার ও সংস্কার নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হচ্ছেন। আর লৌকিক ব্যাপারটিই তো নারী কেন্দ্রিক। এক্ষেত্রে একটা প্রশ্ন থাকতে পারে, গোরাচাঁদের মাজারে হিন্দু নারীদের এত প্রাধান্য কেন? এক্ষেত্রে বলা যায় "মুসলমানদের শরিয়তে আল্লাহ ব্যতীত অপর কারুর উপাসনা করা নিষিদ্ধ, কোরাণে পীরবাদও নেই, মুসলমানদের উপাস্যের মূর্তি বা প্রতীক পূজা গর্হিত কর্ম।" আর এই অনুশাসন ঔরঙ্গজেবের শাসনকালে মুসলমান সমাজে চেপে বসেছিল। আর সেই অনুশাসনের প্রাচীর মাঝে মাঝে উঁচু হওয়ার জন্যই হয়তো মুসলমান নারীদের উপস্থিতি কম। অথচ লৌকিক দেবতা হওয়ার জন্য হিন্দু রমণীরা লৌকিক আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গোরাচাঁদকে পূজা করে, দুধ নিবেদন করে পালনি করে। জিয়াপত গাছে বাচা বাঁধে। এই পালনি, মনস্কামনা পূরণার্থে বাচা বাঁধা—এসব লৌকিক দেবদেবীর ক্ষেত্রে বিচিত্র লৌকিক আচার অনুষ্ঠান।

এখানেও অন্যান্য পীরের মতো গোরাচাঁদের খাদেমগণ গৃহপালিত পশুর রোগ নিরাময়ের জন্য বহুপ্রকার টোটকা দাওয়াই—জলপড়া, তেলপড়া ইত্যাদি দিয়ে থাকেন।

গোরাচাঁদের মাজারে শিরনি নিবেদন করা হয়।

এবার 'চালের শিষ' এবং 'ব্যাঙ্গমার ডিমে'র প্রসঙ্গ। দুটি বস্তুই অবাস্তব। অথচ এ দুটিই রাইগ্রামের গোরাচাঁদের ক্ষেত্রে জনশ্রুতি হয়ে রয়েছে। বর্তমান লেখক কৈশোরে শুনেছিলেন যে গোরাচাঁদের থানে একটি 'চালের শিষ' এবং একটি 'ব্যাঙ্গমার ডিম' ছিল। ১৫. ১২. ১৯৯৬ তারিখে ক্ষেত্র সমীক্ষাকালে গোরাচাঁদের মাজারের সম্মুখে দাঁড়িয়ে একটি নয় দশ বৎসরের বালিকা এসে বর্তমান লেখককে ঐ একই জনশ্রুতির কথা বলেছিল। এক্ষেত্রে 'ব্যাঙ্গমার ডিমে'র ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে না। তবে হয়তো 'চালের শিষে'র ব্যাখ্যা দেওয়া যায়।

এই 'চালের শিষ' রয়েছে বীরভূমের পূর্ব সীমান্তে প্রায় মুর্শিদাবাদের কোল-ঘেঁষা ঘোষগ্রামের মা-লক্ষ্মীর মন্দিরে। আর তা হলো "কাঠের ওপর হাতুড়ি-বাটালিতে খোদাই করা। দেখলে অবশ্য মনে হবে সত্যি সত্যি চালের শিষ।"[৫৩] এ থেকে মনে হতে পারে যে এখানে হয়তো এমনই কোন বস্তু ছিল, যা বর্তমানে আর নেই। এই বস্তু থাকুক আর নাই থাকুক, এ সবের মধ্যে রয়েছে গোরাচাঁদের মহিমা প্রচারের উদ্দেশ্য। তিনি যেমন তাঁর নানারূপ বুজরুকি বা অলৌকিক শক্তির দ্বারা লোহার কলা পাকিয়ে দেন, বা বেড়াতে চাঁপার ফুল ফোটান।—এখানে এই যে জনশ্রুতি তা তিনি যে নানারূপ বুজরুকি বা অলৌকিক শক্তির অধিকারী ছিলেন, সেই মাহাত্ম্য প্রচার করার জন্য। আর সেই মাহাত্ম্য প্রচারের জন্যই হয়তো জনশ্রুতিতে যুক্ত হয়েছিল 'চালের শিষ' এবং 'ব্যাঙ্গমার ডিমে'র প্রসঙ্গ।

এখানে ইসলাম সংস্কৃতির অঙ্গরূপে রয়েছে তিনটি মসজিদ। একটি গোরাচাঁদের মাজারের গায়েই। আর একটি তিন গম্বুজবিশিষ্ট মন্দির। এর আশেপাশে কিছু ভগ্নাবশেষ রয়েছে। এটি ১২০১ হিজিরায়, অর্থাৎ ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল। অন্যটি শাহী মসজিদ। এটি একটি উৎকৃষ্ট স্থাপত্যের নিদর্শন। এর দৈর্ঘ্য ৬০ ফুট, প্রস্থ ২৫ ফুট, এবং সম্মুখে প্রশস্ত বারান্দার আয়তন ১৮০০ বর্গফুট। রাইগ্রাম মওলানা সাহেব মসজিদ সংরক্ষণ সমিতির আবেদনপত্রে বলা হয়েছে, "যতদূর জানা যায়, মুঘল বাদশাহীর শেষ ধাপে বাদশাহ ফররুখ শিয়রের প্রতিনিধি কর্তৃক বাদশাহের অর্থানুকুল্যে মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল।" এখন যদি মসজিদটি ফররুখ শিয়রের রাজত্বকালে (১৭১৩-

১৯ খ্রীঃ) নির্মিত হয়, তবে আবেদনপত্রে উল্লিখিত পাঁচ শতাধিক বৎসরের দাবি ধোপে টেকে না।

এই মসজিদটিও তিন গম্বুজবিশিষ্ট। এঁর পাশেই রয়েছে মৌলবী আবদুল কাদের নামক এক সাধকের সমাধিগৃহ। যতদূর সম্ভব এঁরই মাহাত্ম্যগুণের জন্যই বাদশাহের অর্থানুকূল্যেই মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল।

সুতরাং সর্বোপরি বলা যায়, হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির মিলিত স্রোতের দ্বারা সৃষ্ট মানবিক পালল মৃত্তিকার উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে রাইগ্রামের অস্তিত্ব।

তথ্যপঞ্জী

১। কবিকঙ্কণ চণ্ডী, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, বসুমতী, ১৩৭০, পৃঃ—৬৯

২। বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), নীহাররঞ্জন রায়, সংক্ষেপ: জ্যোৎস্না সিংহরায়, লোক-সমবায়-সমিতি, সংক্ষেপিত সং ১৩৭৩, পৃঃ—৩৯৮

৩। তদেব, পৃঃ—৩২১

৪। তদেব, পৃঃ—৩৪৪

৫। বর্ধমান পরিচিতি, শ্রীঅনুকূলচন্দ্র সেন ও শ্রীনারায়ণ চৌধুরী, বুক সিণ্ডিকেট, ১ম প্রকাশ ১৩৭৩, পৃঃ ৩০১

৬। গৌড়রাজমালা, রমাপ্রসাদ চন্দ, সম্পা—ডঃ দীনেশ চন্দ্র সরকার, নবভারত পাবলিশার্স, ১ম নবভারত সং ১৯৭৫, পৃঃ—৭৯

৭। বর্ধমান চর্চা, সম্পাঃ—শ্যামাপ্রসাদ কুণ্ডু, বর্ধমান, ১৯৮৯, পৃঃ—৪

৮। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড। পূর্বার্ধ), শ্রীসুকুমার সেন, ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, ৪র্থ সং ১৯৬৩, পৃঃ—২১

৯। বর্ধমান চর্চা, সম্পাঃ—সমীরণ চৌধুরী, বর্ধমান ১৯৮৯, পৃঃ—৬

১০। শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধান (২-৪ খণ্ড), সঙ্কঃ—শ্রীহরিদাস দাস, নবদ্বীপ, ১৩৬৫, পৃঃ—১৮৮৩

১১। বর্ধমান চর্চা, সম্পাঃ—শ্যামাপ্রসাদ কুণ্ডু, বর্ধমান, ১৯৮৯, পৃঃ—৪

১২। শিলালেখ—তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ, ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার, সাহিত্যলোক, ১ম প্রকাশ ১৯৮২, পৃঃ—১২১

১৩। তদেব, পৃঃ—১১৫

১৪। বঙ্গ সংস্কৃতির এক পর্ব (১ম খণ্ড), নৃসিংহপ্রসাদ ভট্টাচার্য, কালনা, ১ম সং ১৯৯৫, পৃঃ—২৫

১৫। বাংলা ইতিহাসের দুশো বছর : স্বাধীন সুলতানদের আমল, শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়, ভারতী বুক, ২য় সং ১৯৬৬, পৃঃ ২৬৩-৬৪

১৬। তদেব, পৃঃ—২৬৬

১৭। তদেব, পৃঃ—২৬৪

১৮। তদেব, পৃঃ ২৬৫, ২৭৯-৮০

১৯। তদেব, পৃঃ—২৬৪

২০। তদেব, পৃঃ—৩১০

২১। শিলালেখ—তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ, ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার, সাহিত্যলোক, প্রথম প্রকাশ ১৯৮২, পৃঃ—১২১

২২। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড। পূর্বার্ধ), শ্রীসুকুমার সেন, ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, ৪র্থ সং ১৯৬৩, পৃঃ—২৯

২৩। বর্ধমান পরিচিতি, শ্রীঅনুকুলচন্দ্র সেন ও শ্রীনারায়ণ চৌধুরী, বুক সিণ্ডিকেট, ১ম প্রকাশ ১৩৭৩, পৃঃ—৩০১

২৪। বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর : স্বাধীন সুলতানদের আমল, শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়, ভারতী বুক, ২য় সং ১৯৬৬, পৃঃ ২১৫-১৬

২৫। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (১ম খণ্ড), বিনয় ঘোষ, প্রকাশ ভবন, ৩য় মুদ্রণ ১৩৯৫, পৃঃ ২০৭-৮

২৬। তদেব, পৃঃ—২০৮

২৭। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড। অপরার্ধ), শ্রীসুকুমার সেন, ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, ২য় সং ১৯৬৫, পৃঃ—৪৪৯

২৮। বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি (৩য় খণ্ড), যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, পুস্তক বিপণি, ১ম প্রকাশ ১৯৯৪, পৃঃ—২১৮

২৯। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (১ম খণ্ড), বিনয় ঘোষ, প্রকাশ ভবন, ৩য় মুদ্রণ, ১৩৯৫, পৃঃ—১১৩

৩০। বাংলার লৌকিক দেবতা, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, দেজ পাবলিশিং, ১ম দেজ সং ১৩৮৫, পৃঃ—১০১

৩১। তদেব, পৃঃ ১০৩-৪

৩২। তদেব, পৃঃ—১০২

৩৩। দেশ, সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭২, পৃঃ ৫৩-৫৪

৩৪। বাংলার লৌকিক দেবতা, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, দেজ পাবলিশিং, দেজ সং ১৩৮৫, পৃঃ—১০১

৩৫। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, ডঃ অলোক কুমার চক্রবর্তী, প্রগ্রেসিভ বুক ফোরাম, ১ম প্রকাশ ১৯৮৯, পৃঃ—৫

৩৬। তদেব, পৃঃ—২৩৮

৩৭। নদীয়া-কাহিনী, কুমুদনাথ মল্লিক, সম্পাঃ—মোহিত রায়, পুস্তক বিপণি, ৩য় সং ১৯৮৬, পৃঃ—২১

৩৮। রূপে রূপে দুর্গা, মোহিত রায়, অমর ভারতী, ১ম প্রকাশ ১৯৮৫, পৃঃ-২১

৩৯। আঃ বাঃ পত্রিকা, ২৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৮৭, পৃঃ—১৬

৪০। বঙ্গ সংস্কৃতির এক পর্ব (১ম খণ্ড), বিনয় ঘোষ, প্রকাশ ভবন, ৩য় মুদ্রণ ১৯৯৫, পৃঃ—১৯৪

৪১। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (১ম খণ্ড), বিনয় ঘোষ, প্রকাশ ভবন, ৩য় মুদ্রণ ১৩৯৫, পৃঃ—৮৭, ৯৩

৪২। নদীয়া-কাহিনী, কুমুদনাথ মল্লিক, সম্পাঃ—মোহিত রায়, পুস্তক বিপণি, ৩য় সং ১৯৮৬, পৃঃ—২৪

৪৩। ভারতের ইতিহাস (নবম-দশম শ্রেণী), ডঃ অতুল চন্দ্র রায়, পুনর্মুদ্রণ ১৯৯৪, প্রান্তিক, পৃঃ—১৮৯

৪৪। বাংলার লৌকিক দেবতা, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, দেজ পাবলিশিং, ১ম দেজ সং ১৩৮৫, পৃঃ—২১৪

৪৫। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ও সন্ন্যাসী ফকির বিদ্রোহ, নিখিল সুর, সুবর্ণরেখা, ১ম প্রকাশ ১৯৮২, পৃঃ—৫০

৪৬। তদেব, পৃঃ—৫৪, ৯৪-৯৫

৪৭। আঠারো শতকের বাংলা পুঁথিতে ইতিহাস প্রসঙ্গ, অণিমা মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যলোক, ১ম প্রকাশ ১৯৮৭, পৃঃ—৯৮

৪৮। দেশ, সাহিত্যসংখ্যা ১৩৭২, পৃঃ—৯৩

৪৯। বাংলা ইতিহাসের দুশো বছর : স্বাধীন সুলতানদের আমল, শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়, ভারতী বুক, ২য় সং ১৯৬৬, পৃঃ ১৪৮-৪৯

৫০। বর্ধমান জেলার মেলা : সমাজতাত্ত্বিক পর্যালোচনা, ডঃ গোপীকান্ত কোঙার, কলেজ স্ট্রীট, পৃঃ—৪২

৫১। বাংলার লৌকিক দেবতা, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, দেজ পাবলিশিং, ১ম দেজ সং ১৩৮৫, পৃঃ—১০৪

৫২। যুগান্তর, ২৩ নভেম্বর ১৯৯৪, পৃঃ—৭

৫৩। কথাসাহিত্য, আশ্বিন ১৩৯৬, পৃঃ—১২১৫

গ্রাম খণ্ড
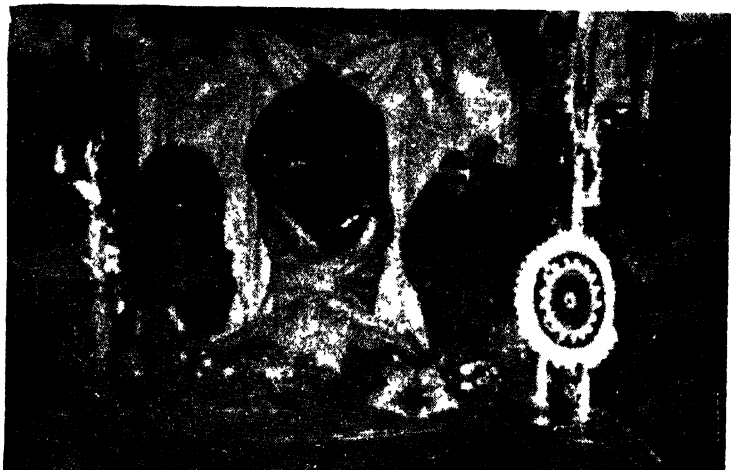
উদযপুবেব বেহুলা, দু'পাশে দেবী মনসা ও নেতা।

বৈদ্যপুরের দেউল।

রাইগ্রামের ধ্বংসস্তূপ থেকে প্রাপ্ত বরাহদেব।

নারিকেলডাঙ্গার মা মনসার আদিপীঠ।
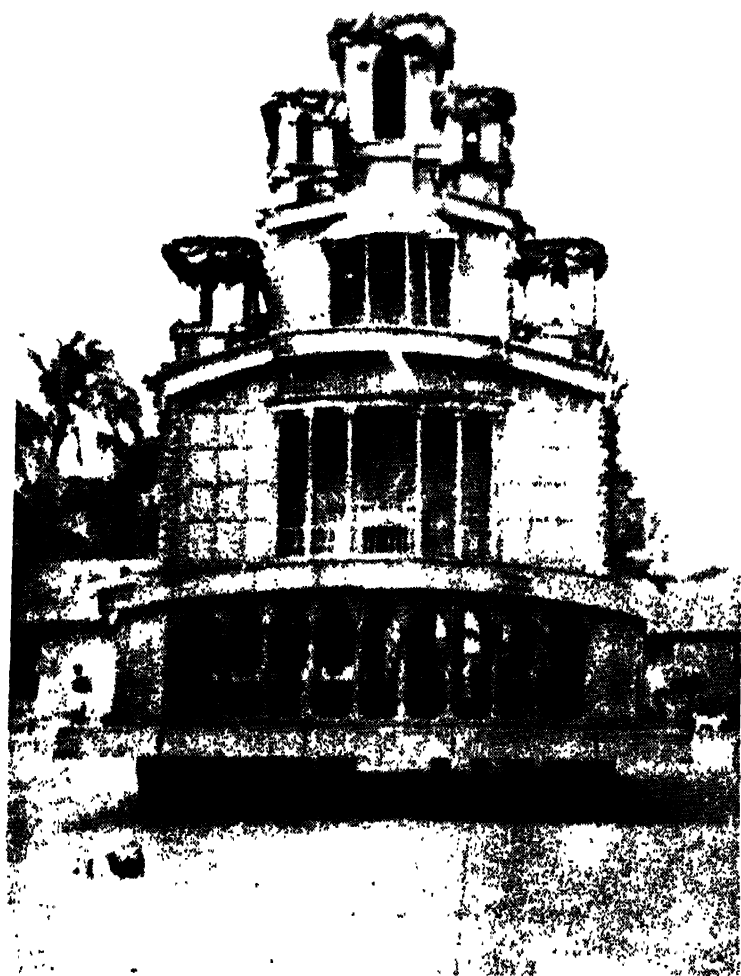
বৈদ্যপুরের রথ।
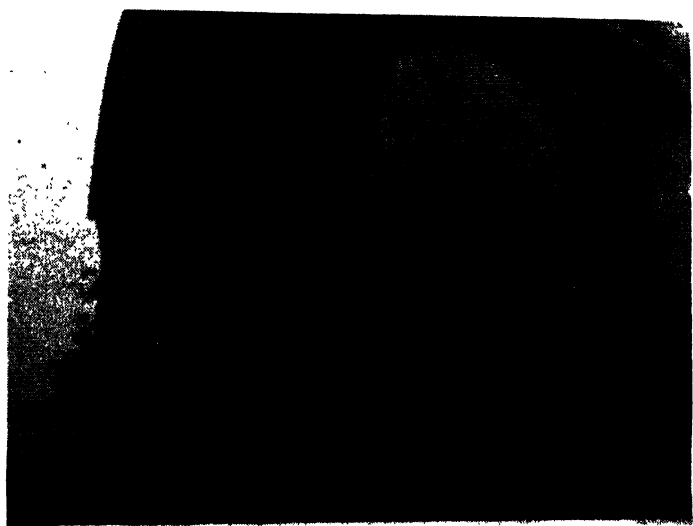
বৈদ্যপুরের রাসমঞ্চ।

মন্তেশ্বরের দেবী চামুণ্ডার মঞ্চমাইচের পশ্চাদ্দেশে মূর্ত্তিত ময়ূর।

মন্তেশ্বরের দেবী চামুণ্ডার মঞ্চমাইচ।
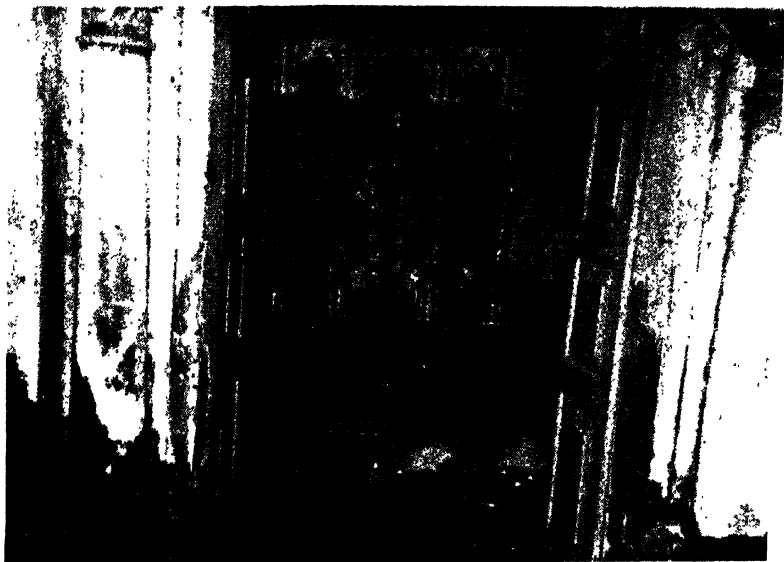
গোপালদাসপুরের রাখালরাজ।

নারিকেলডাঙ্গার মনসা সহচরী নেতা।

সাহায্যকারী গ্রন্থপঞ্জী

বাংলা গ্রন্থ

আ

১। আদক রামদাস—অনাদি-মঙ্গল বা শ্রীধর্ম্মপুরাণ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ সং, কলিকাতা।

ক

১। কবিরাজ কৃষ্ণদাস—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, ৩য় মুদ্রণ ১৯৮৬, কলিকাতা।

২। কোঙার ডঃ গোপীকান্ত—বর্ধমান জেলার মেলা: সমাজতাত্ত্বিক পর্যালোচনা, কলিকাতা।

খ

১। খান আবদুল গণি—বর্ধমানরাজ, ২য় প্রকাশ ১৯৮৮, কলিকাতা।

গ

১। গোস্বামী অজিতকুমার—শ্রীশ্রীগৌর-গৌরীদাস লীলামৃত, ২য় সং ১৩৫২, কালনা।

২। গুপ্ত ডঃ ক্ষেত্র—দীনবন্ধু রচনাবলী, ৪র্থ মুদ্রণ ১৯৯২, কলিকাতা।

৩। গোস্বামী শ্রীসনাতন—শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস, (১ম খণ্ড) ১৩৭৯, কলিকাতা।

৪। গোস্বামী বিজনবিহারী—অথর্ববেদ, ১ম প্রকাশ ১৩৮৫, কলিকাতা।

ঘ

১। ঘোষ বিনয়—পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (১ম), ৩য় মুদ্রণ ১৩৯৫, কলিকাতা।

চ

১। চৌধুরী যজ্ঞেশ্বর—বর্ধমান: ইতিহাস ও সংস্কৃতি (৩য় খণ্ড), ১ম প্রকাশ ১৯৯৪, কলিকাতা।

২। চক্রবর্তী শ্রীনরহরি—শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর, ৩য় সং ১৯৮৭, কলিকাতা।

৩। চক্রবর্তী ডঃ অলোককুমার—মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৯, কলিকাতা।

৪। চক্রবর্তী মুকুন্দরাম—কবিকঙ্কণ চণ্ডী, নূতন সং ১৯৬২, কলিকাতা।

৫। চক্রবর্তী সুধীর—পশ্চিমবঙ্গের মেলা ও মহোৎসব, ১ম প্রকাশ ১৯৯৬, কলিকাতা।

৬। চৌধুরী সমীরণ—বর্ধমান চর্চা, ১৯৮৯, বর্ধমান।

৭। চৌধুরী যজ্ঞেশ্বর—বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি (২য় খণ্ড), ১ম প্রকাশ ১৯৯১, কলিকাতা।

৮। চট্টরাজ কৃষ্ণধন—শ্রীশ্রীমনোহর দাস বৈরাগীর জীবনচরিত্র, ১ম সং, ১৩৫৬, নবদ্বীপ।

জ

১। জব্বার এম.এ.—বালান্দায় প্রাচীন সভ্যতার প্রবাহ ও গোরাই গাজী—প্রথম সং ১৩৯১, বালান্দা।

২। জানা যুধিষ্ঠির—বৃহত্তম তাম্রলিপ্তের ইতিহাস, ১ম প্রকাশ ১৩৭১, কলিকাতা।

দ

১। দাস বৃন্দাবন—শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত, বসুমতী, কলিকাতা।

২। দত্ত ৺অক্ষয়কুমার—ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (১ম ভাগ), ১ম করুণা সং ১৩৯৪, কলিকাতা।

৩। দাস হরিদাস—শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধান, (২-৪ খণ্ড), ২য় সং ৫০১ শ্রীচৈতন্যাব্দ নবদ্বীপ।

৪। দাশ ডঃ তপেন্দ্র নারায়ণ—ইতিহাসের নবভাষ্য, ১ম প্রকাশ ১৯৯৩, রানীবন্দ।

৫। দাশ বিবেকানন্দ—গঙ্গারিডি : দেশ ও জাতি (দেশখণ্ড), ১ম প্রকাশ ১৩৯৮, কালনা।

ন

১। নাগর ঈশান, অদ্বৈত প্রকাশ, সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা।

২। নিগূঢ়ানন্দ—মহাতীর্থ একান্ন পীঠের সন্ধানে, ৩য় সং ১৩৯১, কলিকাতা।

৩। নিগূঢ়ানন্দ—সতীক্ষেত্র ছাব্বিশ উপপীঠের সন্ধানে, ১ম প্রকাশ ১৩৮৬, কলিকাতা।

প

১। পট্টনায়ক মাধব—শ্রীচৈতন্যের দিব্য জীবন ও অজ্ঞাত তিরোধান পর্ব, ১ম প্রকাশ ১৩৯০, কলিকাতা।

ব

১। বন্দ্যোপাধ্যায় ডঃ অসিতকুমার—বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (২য় খণ্ড), তৃতীয় সং ১৯৮৩, কলিকাতা।

২। বন্দ্যোপাধায় ডঃ অসিতকুমার—বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (৩য় খণ্ড / ১ম পর্ব), ২য় সং ১৯৮০, কলিকাতা।

৩। বন্দ্যোপাধ্যায় অমিয়কুমার—বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি, ১ম প্রকাশ ১৯৯১, কলিকাতা।

৪। বন্দ্যোপাধ্যায় সুরেশচন্দ্র—তিন হাজার বছরের লোকায়ত জীবন, ১ম সং ১৩৮৩, কলিকাতা।

৫। বন্দ্যোপাধ্যায় রাখালদাস—বাঙ্গালার ইতিহাস (২য় খণ্ড), পুনর্মুদ্রণ সং ১৯৭৪, কলিকাতা।

৬। বিশ্বাস শৈলেন্দ্র—সংসদ্ বাঙালা অভিধান, পুনর্মুদ্রণ ১৯৭৫, কলিকাতা।

৭। বসু গোপেন্দ্র কৃষ্ণ—বাংলার লৌকিক দেবতা, ১ম প্রকাশ ১৯৬৬, কলিকাতা।

৮। বন্দ্যোপাধ্যায় অনিলকুমার—তীর্থক্ষেত্র কালনা, ১ম প্রকাশ ১৩৯৯, কালনা।

ভ

১। ভট্টাচার্য আশুতোষ—বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ৬ষ্ঠ সং ১৯৭৫, কলিকাতা।

২। ভট্টাচার্য তরুণ—কালনার ইতিহাস, ১ম সং ১৯৯৬, কালনা।

৩। ভট্টাচার্য নৃসিংহ প্রসাদ—বঙ্গ সংস্কৃতির এক পর্ব (১ম খণ্ড), ১ম সং ১৯৯৫, কালনা।

ম

১। মল্লিক কুমুদনাথ—নদীয়া-কাহিনী, ৩য় সং ১৯৮৬, কলিকাতা।

২। মাইতি রবীন্দ্রনাথ—চৈতন্য পরিকর ১৯৬২, কলিকাতা।

৩। মহারাজা সারদানন্দ—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ, কলিকাতা।

৪। মুখোপাধ্যায় সুখময়—বাংলা ইতিহাসের দু'শো বছর: স্বাধীন সুলতানদের আমল, ২য় সং ১৯৬৬, কলিকাতা।

৫। মুখোপাধ্যায় ডঃ অণিমা—আঠারো শতকের পুঁথিতে ইতিহাস প্রসঙ্গ, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৭, কলিকাতা।

৬। মুখোপাধ্যায় উপেন্দ্রনাথ—কৃত্তিবাসী রামায়ণ, পুনর্মুদ্রণ ২০ সং, কলিকাতা।

৭। মুখোপাধ্যায় সুখময়—বাংলায় মুসলিম অধিকারের আদিপর্ব (১২০৪-১৩৩৮ খ্রীষ্টাব্দ) প্রথম প্রকাশ ১৯৮৮, কলিকাতা।

র

১। রায় নীহাররঞ্জন—বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব / ১ম খণ্ড) ১ম সাক্ষরতা সং ১৯৮০, কলিকাতা।

২। রায় ভট্ট অমূল্যধন—শ্রীশ্রীদ্বাদশ গোপাল বা শ্রীপাটের ইতিবৃত্ত, ১৩৩১, পানিহাটি।

৩। রায় কামিনীকুমার—লৌকিক শব্দকোষ (২য় খণ্ড), ১ম প্রকাশ ১৩৭৭, কলিকাতা।

৪। রায় নীহাররঞ্জন—বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব / ২য় খণ্ড), ১ম সাক্ষরতা সং ১৯৮০, কলিকাতা।

৫। রায় নীহাররঞ্জন—বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), সংক্ষেপিত সং ১৩৭৩, কলিকাতা।

৬। রায় ডঃ অতুলচন্দ্র—ভারতের ইতিহাস (নবম ও দশম শ্রেণী), পুনর্মুদ্রণ ১৯৯৪, কলিকাতা।

৭। রায় মোহিত—রূপে রূপে দুর্গা, ১ম প্রকাশ১৯৮৫, কলিকাতা।

স

১। সেন সুকুমার—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড / অপরার্ধ), ২য় সং১৯৬৫, কলিকাতা।

২। সেন সুকুমার—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড / পূর্বার্ধ), ৪র্থ সং ১৯৬৩, কলিকাতা।

৩। সেন অনুকূলচন্দ্র—বর্ধমান পরিচিতি, ১ম প্রকাশ ১৩৭৩, কলিকাতা।

৪। সুর ডঃ অতুল—বাঙলা ও বাঙালী, ১ম মুদ্রণ ১৩৮৭, কলিকাতা।

৫। সিংহ কালীপ্রসন্ন—(সচিত্র) মহাভারত (৩য় খণ্ড), হিতবাদী সং ১৩৩২, কলিকাতা।

৬। সুর ডঃ অতুল—বাঙলার সামাজিক ইতিহাস, ১ম প্রকাশ ১৯৭৬, কলিকাতা।

৭। সিংহ মাণিকলাল—রাঢ়ের জাতি ও কৃষ্টি (১ম খণ্ড), ১ম সং ১৯৮২, বিষ্ণুপুর।

৮। সরকার ডঃ দীনেশচন্দ্র—শিলালেখ—তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ, ১ম প্রকাশ ১৯৮২, কলিকাতা।

৯। সুর নিখিল—ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ও সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহ, ১ম প্রকাশ ১৯৮২, কলিকাতা।

পত্র-পত্রিকা

বাংলা

১। অম্বুকণ্ঠ, আশ্বিন, ১৩৯৬।

২। আনন্দ বাজার পত্রিকা, ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৮৭।

৩। ওভারল্যাণ্ড, রবিবাসর, ১৪ মার্চ ১৯৯৩।

৪। তদেব, ২৫ অক্টোবর, ১৯৯২।

৫। তদেব, ২৯ আগস্ট, ১৯৯৩।

৬। কৌশিকী, জানুঃ, ১৯৯৫।

৭। তদেব, শারদীয়, ১৩৯৫।

৮। তদেব, শারদীয়, ১৩৯৩।

৯। কথা সাহিত্য, আশ্বিন, ১৩৯৬।

১০। কৌশিকী (৩য় পর্যায়), ২য় বার্ষিক সংখ্যা ১৯৯৬।

১১। দেবভাষা, ২১ অক্টোবর, ১৯৯৩।

১২। দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৭২।

১৩। নবকল্লোল, পৌষ, ১৪০১।

১৪। প্রতিদিন, ১৯ নভেম্বর, ১৯৯৬।

১৫। ব্যতিক্রম, শীত সংখ্যা, ১৩৯৫।

১৬। বেতার জগৎ, ২৬—৩১ আগস্ট, ১৯৮০।

১৭। বর্তমান (সাপ্তাহিক), ১২ জুন, ১৯৯৩।

১৮। বর্তমান, ৫ নভেম্বর, ১৯৮৯।

১৯। বর্ধমান সম্মিলনী ১৯৭৪।

২০। যুগান্তর, ২৩ নভেম্বর।

২১। লহপ্রণাম, ১৯৯৫।

২২। শ্রীসুদর্শন, শ্রাবণ ১৪০০।

ইংরেজী গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা

১। Hunter W. W.—Annals of Rural Bengal.

২। Sen Sukumar—Vipradasa's Manasa, Cal. 1953.

৩। Chanda Bholanath—Travels of Hindu (Vol. 1).

৪। Majumdar N. G.—Inscriptions of Bengal Vol. III, 1229.

৫। McCrindle J. W.—Ancient India as Described by Megasthenes & Arrian, Cal-1926.

৬। Calender of Persian Correspondence, New Delhi.

৭। J. A. S. Letters, Vol. XXXIV, No. 2, Cal.

৮। The Antiquities of Kalna : Bengal Past & Present, Vol. 14, Jan-June 1917.

৯। Annual Reports of the Archaeological Surveyor, Bengal Circle, 1903-4.

১০। Epigraphia India, Vol. XXIII.

১১। Journal of Numismatic Society of India, Vol. XXXVI, 73 plate XV, No-1.

১২। Journal of the Mythic Society, XLIII, 1995.

১৩। Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol. XLI, 1872, Pt. 1.